দাফ্‌নে দ্যু মরিয়র

অনুবাদ

শিউলি মজুমদার

সাহিত্যায়ন

২৩ডি কুমারটুলী স্ট্রিট, কলিকাতা ৫

প্রথম প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ ১৩৬১

প্রকাশক

সুনীল কুমার ঘোষ

সাহিত্যায়ন

২৩ডি কুমারটুলী স্ট্রিট

কলিকাতা ৫

প্রচ্ছদসজ্জা

মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রক

সন্তোষ কুমার ধর

ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস

৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলিকাতা ৯

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

বেঙ্গল অটোটাইপ কোঃ

বাঁধাই

ওরিয়েণ্টাল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

তোমাকে
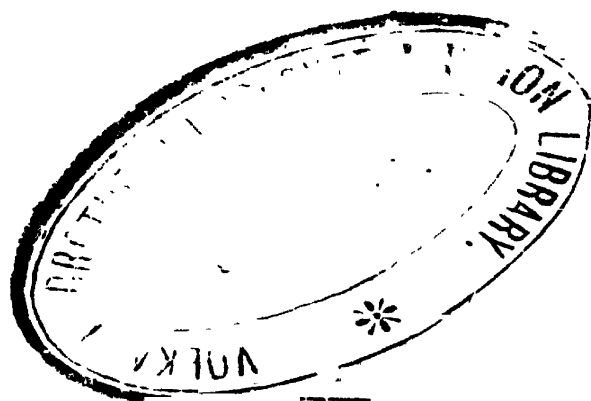
কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি আমি যেন আবার ম্যাণ্ডারলে গিয়েছি। বন্ধ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দারোয়ানকে অনেক ডাকাডাকি করেও উত্তর পেলাম না। ফটকের মরচে ধরা শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম — শূন্য পুরী অন্ধকার। তারপর প্রত্যেক স্বপনচারীর মতই কি এক অলৌকিক শক্তিবলে অশরীরী আত্মার মত বন্ধ ফটকের মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। গাড়ি চলার আঁকাবাঁকা পথটি দিয়ে চলতে চলতে অবাক হয়ে ভাবছি—এই কি আমাদের আগেকার সেই সুন্দর ও বিস্তীর্ণ পথ? এগিয়ে যেতে যেতে গাছের দোলানো একটি শাখায় আচমকা ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারলাম পথটির এই রূপান্তরের রহস্য কোথায়! প্রকৃতি দিনের পর দিন এখানে তার অজস্র ভাণ্ডার খুলে বসেছে। বিজন পথের দু'ধারে গভীর কৃষ্ণ গুচ্ছ বনানী! বীচ্, এলম্, ওক্, চারিধারে কত রকমারি গাছের সারি, নাম-না-জানা কত বন্যলতা, গুল্ম, একে অপরকে জড়িয়ে নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। অরণ্য হতে অরণ্যানী গভীর হতে গভীরতর হয়েছে আজ ম্যাণ্ডারলের সেই শ্যামল বনভূমি! শ্যামল দূর্বাদল আর শৈবালের ঘন আস্তরণে সমস্ত পথ গেছে ছেয়ে, তাই পথটি আজ এত ক্ষীণকায়; মাঝে মাঝে আমি পথ হারিয়ে ফেলছি; কোন মরা গাছের

তলায় বা বৃষ্টির জলে ভরা কোন ডোবার গা ছুঁয়ে আবার সেই ক্ষীণ পথ রেখাটি উঁকি ঝুঁকি মারছে। এ ভাবে চলেছি তো চলেছি, পথ আর ফুরোয় না। বিচিত্র এই বন পথ দিয়ে চলতে চলতে হয়তো বা কোন্ গোলকধাঁধায় গিয়ে পড়বো কে জানে! কিন্তু না, হঠাৎ আমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। বাড়িটা চারিদিক অরণ্যের আবেষ্টনে এতক্ষণ যেন কত সংগোপনে লুকি...। সহসা আমার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলো—কান্নার আবেগে, চোখ দু'টো জালা করতে লাগলো। ম্যাণ্ডারলে······আমাদের সেই নিভৃত শান্তিনিকেতন! কালের কঠিন শাসনেও তার সুষমা ও নিরালা পরিবেশ আজও এতটুকু ম্লান হয়নি। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে অবশেষে এলাম অলিন্দে, অলিন্দ থেকে আঙ্গিনায়। ম্যাণ্ডারলের সবুজ বিস্তৃত এই অঙ্গন চলে গেছে নীল সাগরের অভিসারে। আমিও চলেছি সেদিক পানে। আমার স্বপ্নের চাঁদিমায় নিস্তরঙ্গ সাগরের রূপালী জলরাশিকে মনে হল শান্ত, অচঞ্চল একটি হ্রদ; উত্তাল কোন ঢেউয়ের আঘাতে বা কালো মেঘের পাগলামিতে আমার এই স্বপ্ন-সায়রের প্রশান্তি আর ব্যাহত হবে না। আবার প্রাসাদের দিকে চললাম। মনে হল কালও যেন আমরা এখানে ছিলাম। ফুল বাগানে ঢুকে দেখি সেখানেও আদিম প্রকৃতির সেই চিরাচরিত খেলা! বাগানের মাঝে মাঝে বন ঝোপ, কত কি নাম-না-জানা লতার ভিড়, কত কি বনকুসুম! রক্তিম রডোডেনড্রনগুলো অবাধ গতিতে বেড়ে উঠে একটু যেন নুয়ে পড়েছে। তাদের পায়ে পায়ে পরম নির্ভরে জড়িয়ে আছে অজানা কত বিচিত্র লতা[illegible] শক্ত নিগড়ে লিলাক [illegible]। আইভলতা তার [illegible] আইভিরা [illegible] বাচ্‌কে বন্দী করে রেখেছে। অনাদৃত এই বাগানে [illegible] আসর জমিয়েছে। সবুজ নরম ঘাসের বুকে ড্যাফোডিলরা ফুটতো যেখানে, নাম-না জানা এক জাতের আগাছা সেখানে [illegible]

উঠেছে। কাঁটা গাছের দৌরাত্ম্য তো চারিদিকে। দু'চোখ ভরে আমি সেই অপূর্ব রহস্যময় বনশ্রী দেখছি আর মুগ্ধের মত এগিয়ে চলেছি।

অজস্র চাঁদের আলো প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে ঘিরে কি এক মায়ালোক রচনা করেছে যেন! নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করছিলাম এতো শূন্য পুরী নয়, প্রাণবন্ত; অন্ধকার নয়, আলোয় আলোকময়! লাইব্রেরি ঘরের দরজা ঐ তো আধখোলা রয়েছে। টেবিলের ওপর একগুচ্ছ গোলাপের পাশে পড়ে রয়েছে আমার রুমালটি। ছাইদানে কয়েকটি পোড়া সিগারেটের টুকরো; চেয়ারের নরম গদিতে আমাদের বসবার চিহ্ন তো এখনও সুস্পষ্ট!

জেসপার...আমার প্রিয় জেসপার মেঝেতে শুয়ে আছে, তার প্রভুর পায়ের শব্দ শুনলেই জ্বলজ্বলে বড় বড় চোখ দু'টি মেলে সে আনন্দে লেজ নাড়বে।

সহসা সুনীল আকাশের পরিপূর্ণ চাঁদের গায়ে একখণ্ড কালো মেঘ এসে পড়লো কোথা থেকে কে জানে। আমার অবাধ কল্পনার সব আলোও এক নিমেষে গেল নিভে। আবার সেই প্রাণহীন পুরী প্রেতাত্মার মত রইল দাঁড়িয়ে। মুখর অতীত স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ যেন এক সমাধি, আমাদের যা কিছু দুঃখ, বেদনা, দুর্ভোগ ও ভয় — সব কিছুর চিরসমাধি। এক লহমায় আমার মধুর স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল। কোথায় ম্যাণ্ডারলের সেই গোলাপ বাগান, ভোর বেলায় পাখিদের মিষ্টি মধুর কল কাকলি, বাদাম গাছের তলায় বসে চা খাওয়া, সাগরের মৃদু কল্লোল, প্রস্ফুটিত লিলি আর হ্যাপিভ্যালির নয়নাভিরাম সব দৃশ্য!

রূপকথার রাজ্য থেকে একেবারে নেমে এলাম মাটির পৃথিবীর অনাড়ম্বর ছোট্ট হোটেলের নিরস পরিবেশের অতি সাধারণ শোবার ঘরের বাস্তবতায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে চোখ মেলে দেখি

ভোর বেলাকার রোদের এক ঝলকে ঘর গেছে ভরে। আজ যে দিনের সুরু হল তাতে পরিপূর্ণ শান্তি হয়তো থাকবে কিন্তু বৈচিত্র্য তো কিছু নেই। ম্যাণ্ডারলের কথা, আমার স্বপ্নের কথা, কিছুই আমরা দু'জনে আলোচনা করবো না। কারণ ম্যাণ্ডারলে আর আমাদের নেই! ম্যাণ্ডারলে হারিয়ে গেছে চিরতরে……।

॥ ২ ॥

ম্যাণ্ডারলের ফেলে আসা জীবনে আমরা আর ফিরে যেতে পারবো না তা জানি। তবুও তো সে জীবনকে ভুলতে পারিনা। তখনকার অজানা অস্থিরতা, ভয়, ভাবনা—সবই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবুও যে ফিরে ফিরে সেই সব স্মৃতি মনকে দোলা দিয়ে যায়!

ম্যাণ্ডারলের স্মৃতিতে যখন তাঁর মন ব্যথিয়ে ওঠে আমি বেশ বুঝতে পারি। পলকহারা দৃষ্টি কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। সুন্দর মুখখানি তাঁর এক নিমেষে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তিনি একটার পর একটা সিগারেট জ্বালবেন আর আনমনে বসে থাকবেন। একটি কথাও বলবেন না। সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোগুলো ঝরা ফুলের পাপড়ির মত মেঝেয় জমবে!

লোকে বলে দুঃখের কষ্টিপাথরেই মানুষের জীবনের সত্যিকারের পরখ। দুঃখ না পেয়ে জীবনে নাকি বড় কিছু পাওয়া যায় না। দুঃখ আমরা জীবনে অনেক পেয়েছি দু'জনেই। জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণে ভয়, ভাবনা, নিঃসঙ্গতা ও মনস্তাপ দু'জনেই ভোগ করেছি। আজ যে আমরা শান্তি ও স্বস্তিতে আছি তার মূল্যও তো দিতে হয়েছে কম নয়! তবুও আজ আমরা সত্যিই সুখী। কারণ আমরা আর নিঃসঙ্গ নই। আমাদের জীবনের মত ও পথ এক হয়ে গেছে। আজকের

সুখ দুঃখ সবই দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। পরস্পরকে আমরা একান্ত করেই পেয়েছি।

হোটেলের গতানুগতিক অনাড়ম্বর জীবনধারার সহজ সরলতায় আমরা এখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নানারকম পত্রিকা, সাময়িকী, সংবাদপত্র, বই পড়ে আমাদের সময় যায় কেটে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে এখন আমি জোরে জোরে পড়তেও পারি। দেশ-বিদেশের খবরা-খবর আমিই এখন পড়ে শোনাই তাঁকে। যে কোন খেলা-ধুলোর খবর তা যত পুরানোই হোক, আমাদের দুজনকেই কত আনন্দ দেয়! কখনো বা 'ফিল্ডের' পুরানো কোন সংখ্যায় ইংলণ্ডের বসন্ত ঋতুর বর্ণনা পড়তে পড়তে কল্পনায় আবার ম্যাণ্ডারলের জীবনে ফিরে যাই। পুরানো বইয়ের ছেঁড়া মলিন পাতাগুলোর মধ্য থেকেই যেন ম্যাণ্ডারলের মাটির সোঁদা গন্ধ পাই!

একদিন বন্য পায়রার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ে তাঁকে শোনাচ্ছিলাম। পড়তে পড়তে ম্যাণ্ডারলের কুঞ্জবনের একটি দিন আবার চোখের ওপর ভেসে উঠলো।

গ্রীষ্মকালের নির্জন দুপুর। পায়রাগুলোর শান্ত ও মিষ্টি সুরের অশ্রান্ত বক্‌-বক্‌-বকম্‌ শুনতে শুনতে আমি গাছের ছায়ায় ঝরা পাতার বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। এমন সময় আমায় খুঁজতে খুঁজতে জেসপার এলো সেখানে। পায়রাগুলো ডানা ঝট্‌পট্‌ করে এক নিমেষে কে কোথায় পালিয়ে গেল। চারিধার আবার নিঝুম-নিথর। চমকে দেখি সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও ম্লান হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বেলা যে পড়ে এলো! গায়ের ধুলো ঝেড়ে জেসপারের সঙ্গে চলতে লাগলাম। মন যেতে চায় না, তাই ফিরে ফিরে পেছনে তাকাই।

আপন ভাবনায় মশগুল হয়ে কতক্ষণ চুপ করেছিলাম কে জানে! হঠাৎ চেয়ে দেখি তাঁর চেহারা গেছে বদলে, দৃষ্টি নিমেষহারা।

বিহ্বল! মুখখানিও বড় মলিন! অপ্রস্তুত হয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। অবশেষে এক জায়গায় ক্রিকেট খেলার বিবরণ পেয়ে জোরে জোরে পড়তে সুরু করলাম। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলাম তাঁর সুন্দর মুখখানি আবার সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যে স্মৃতির ভারে তাঁর মন ব্যথিয়ে ওঠে তাকে ভুলে থাকবার জন্য আমাদের কত আয়োজন! কিন্তু পারি কই? বিকেলে হোটেলের বারান্দায় দু'জনে চা খেতে বসে আমার মনে জাগে ম্যাণ্ডারলের বিকেল সাড়ে চারটের স্মৃতি! কল্পনার ডানা মেলে ম্যাণ্ডারলের জীবনে আবার যাই ফিরে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় লাইব্রেরি-ঘরে আগুনের ধারে টেবিলের তুষারশুভ্র আচ্ছাদনের ওপর চায়ের আয়োজন — রূপোর ট্রে, কেট্‌লী, পেয়ালা, পিরিচ আর থরে বিথরে বিচিত্র কত সুস্বাদু খাবার! কত রকমারি খাবার যে দেওয়া হত আমি সবগুলোর নামও জানতাম না। আমরা খুব অল্পই খেতাম। কিন্তু আমাদের টেবিলে এক একবারে যে পরিমাণে খাবার পরিবেশন করা হত তা দিয়ে একটা পরিবারের এক সপ্তাহ চলে যাবার কথা। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এত খাবার দিয়ে কি হয়? আমরা যে খাবারগুলো খেতাম না সেগুলো কি নষ্ট হত!

মিসেস ডানভারসকে এ প্রশ্ন করার মত সাহস আমার ছিল না। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যদি সে প্রশ্ন কখনও তাকে করতাম তা হলে কোনও কথা না বলে মৃদু হেসে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে থাকতো। সেই হাসিতে থাকত নীরব ভর্ৎসনা, প্রচ্ছন্ন অনুকম্পার রেশ! তার চোখের নীরব ভাষা যেন আমাকে বলত, 'মিসেস ডি উইণ্টার বেঁচে থাকতে এমন অভিযোগ তো কোনদিন করেন নি!'

মিসেস ডানভারস! সত্যি, আমি তাকে কোনদিনই কি ভুলতে পারবো! এক এক সময় ভাবি মিসেস ডানভারস আর ফ্যাবেল এখন কোথায়, কি করছে, কেমন আছে!

মনে পড়ে প্রথমদিন মিসেস ডানভারসের চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি দেখে আমি বড় অসোয়াস্তি বোধ করেছিলাম। তার দৃষ্টিই আমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিল রেবেকার সঙ্গে সে আমার তুলনা করছে। সেই মুহূর্তেই আমাদের দু'জনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেল। ভয় ভাবনার সেই সব দিনগুলির কবল থেকে আমরা দু'জনেই চিরতরে মুক্তি পেয়েছি। ম্যাণ্ডারলে আর নেই! আমার স্বপ্নে দেখা ম্যাণ্ডারলে আজ গভীরবনের অন্তরালে পরিত্যক্ত, শূন্য, অন্ধকার! কোনদিন কোন পথভোলা পথিক হয়ত ম্যাণ্ডারলের বিজন বনপথের ছলনায় অকারণ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বৃষ্টির তাড়নায় সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলে সেই ঘনবনের বিভীষিকায় তার গা ছম্ ছম্ করে উঠবে নাকি!

গাছের পাতাগুলি ঝিরঝির করে কেঁপে উঠলে তার নিশ্চয় মনে হবে সান্ধ্যবেশ পরে কোন মেয়ে বুঝি সংগোপনে চলেছে তার প্রিয়-অভিসারে। ঝরাপাতার দল এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লে মনে হবে মেয়েটি বুঝি ত্রস্তপদে চলে যাচ্ছে!

এখানকার দ্রাক্ষাকুঞ্জওতো সোনালি রোদের উজ্জ্বল আলোয় কি সুন্দর ঝিলিমিলি করছে! কিন্তু আশ্চর্য! এখানকার পরিবেশ আর ম্যাণ্ডারলের পরিবেশে কতই না প্রভেদ! ম্যাণ্ডারলের মায়াময় পরিবেশে ছিল যেন কোন্ মায়াবীর মায়ামন্ত্রের মোহন স্পর্শ!

হয়ত একদিন আজকের এই অতি সাধারণ, সহজ জীবনকেই খুব ভালবেসে ফেলবো। বাস্তবঘেঁষা এই পরিবেশকে এখনও ভালবাসতে পারিনি সত্যি, কিন্তু এখানেই যে আমি আমার আত্মবিশ্বাসকে ফিরে

পেয়েছি একথা অস্বীকার করতে পারি না। ম্যাণ্ডারলের পরিবর্তনের মত আমার সম্পূর্ণ রূপান্তরও আমি বেশ বুঝতে পারছি। অপরিচিতদের সম্মুখে আমার সেই আগেকার লজ্জা, ভয়, সংকোচ আজ আর এতটুকুও নেই!

প্রথম যখন ম্যাণ্ডারলে যাই, আমি ছিলাম লজ্জাশীলা, সশঙ্কিতা গেঁয়ো একটি মেয়ে। সংসার ও জীবন সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞা। কি করে সকলের মন পাব, সকলকে সুখী করবো কেবল তাই ভাবতাম। মিসেস ডানভারসের মত ম্যাণ্ডারলের আরও অনেকে হয়তো এই কারণেই আমাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নিছক কৃপার পাত্রী হিসেবে দেখতো! ম্যাণ্ডারলের সর্বময়ী কর্ত্রী রেবেকার পর আমি যে সেখানে কত বেমানান আজ সেই নির্মম সত্যকে মনে প্রাণে বুঝতে পারি।

মিসেস ভ্যানহপার নামে তথাকথিত ধনী ও ফ্যাশন-দুরস্ত এক ভদ্রমহিলার আশ্রয়পুষ্ট অতি সাধারণ একটি মেয়ের চেহারা এতদিন পরেও আজ চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠছে। সাধারণ কোট সার্ট জাম্পার পরা, ছোট ছোট সোজা চুল, প্রসাধনহীন একটি গেঁয়ো মেয়ের ছবি কল্পনা করে নাও। আর মিসেস ভ্যানহপার! উঁচু হিলের জুতোর ওপর তাঁর মোটা সোটা বেঁটে দেহটি টলমল করছে। ঝালর লাগানো অদ্ভুত জমকালো পোশাক পরে তাঁর বিশাল বিপুল দেহভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তাঁর মাথায় রয়েছে পুচ্ছ লাগানো বিরাট একটি টুপি একদিকে একটু হেলে। হাতে তাঁর একটি বিপুলকায় ব্যাগ যার মধ্যে আছে পাসপোর্ট, ডায়েরী, ব্রিজ খেলার স্কোর কার্ড, কত কি দরকারি অদরকারি সব কাগজপত্তর। রেস্তোরাঁর এক কোণে জানালার ধারে নির্দিষ্ট টেবিলে বসেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নেওয়া। তারপর একান্ত বিরক্তিভরে বলে উঠতেন, 'একজনও নাম করা লোক দেখতে পাচ্ছি

নাতো! এখানে তাহলে এসেছি কেন শুনি? চাকর-বাকরগুলোকে দেখতে নাকি? নাঃ! ম্যানেজারকে বলে বিল থেকে কাটতেই হবে।'

মন্টিকার্লোর বিখ্যাত সেই রেস্তোরাঁর জমজমাট খাবার ঘর আর আজকের এই শান্তিপূর্ণ ছোট্ট হোটেলের নিরিবিলি পারিপার্শ্বিক— এই দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান! আমার আজকের সাথী আর সেদিনকার সাথী, দু'জনার মধ্যে কতই না প্রভেদ ভাবলে অবাক লাগে! আমার আজকের সাথী তাঁর সুন্দর সবল হাতে ম্যাণ্ডারিণ নিয়ে নীরবে বসে বাজিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে। আর সেদিনকার সাথী খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে লুব্ধ দৃষ্টিতে বারবার আমার প্লেটের দিকে চাইছিলেন আমি কি খাচ্ছি তাই দেখতে। এ বিষয়ে তাঁর ঈর্ষার অবশ্য কোন সংগত কারণ ছিল না। কারণ হোটেলের চাকর-বাকরাও কি করে বুঝে নিত আমি মিসেস ভ্যানহপারের সমপর্যায়ের নই, অধীন মাত্র। তাই অন্যেরা যে খাবার না খেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে এমন সব বাজে আর ঠাণ্ডা খাবারই তারা আমাকে খেতে দিত। একবার মিসেস ভ্যানহপারের দেশের বাড়িতে দিন কয়েক ছিলাম। সেখানকার পরিচারিকা কোনদিন আমার ডাকে সাড়া দেয় নি। আমার কোন কাজ সে কখনও করে দিত না। সকাল বেলাকার চা আমার শোবার ঘরের দরজায় অবহেলাভরে রেখে চলে যেত। জীবন সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা আর ছেলেমানুষি চেহারাই হয়ত এজন্য দায়ী ছিল।

মনে পড়ছে সেদিনও আমি বিস্বাদ খাবার গুলো কোনরকমে গিলে যাচ্ছিলাম; মিসেস ভ্যানহপার একমনে তাঁর সুস্বাদু খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে ব্যস্ত। এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমাদের পাশের যে টেবিলটি এতদিন শূন্য পড়ে ছিল সেখানে একজন ভদ্রলোক একলা চুপচাপ বসে আছেন। মিসেস ভ্যানহপার খাওয়া শেষ হলে কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে সেদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে

লাগলেন। তিনি এমন ভাবে দেখছিলেন যে আমারই কেমন লজ্জা করতে লাগলো। দেখতে দেখতে মিসেস ভ্যানহপারের চোখদু'টি উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে উঠলো। আমার দিকে একটু ঝুঁকে বেশ জোরে বলে উঠলেন, 'জান, উনি কে! ম্যাণ্ডারলের মালিক ম্যাক্স ডি উইণ্টার। কিন্তু কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে না ওঁকে? লোকে অবশ্য বলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই উনি এমন হয়ে গেছেন।'

॥ ৩ ॥

মিসেস ভ্যানহপার চালবাজ, খোশামুদে এবং বড়লোক ঘেঁষা না হলে আমার জীবনের পরিণতি আজ কি হোত কে জানে! তাঁর এই বিশেষ গুণ গুলোই আমার আজকের জীবনের ভিত একথা ভাবলে সত্যি অবাক লাগে। সমস্ত বিষয়ে তাঁর অহেতুক কৌতূহল, অকারণ বাচালতায় প্রথম প্রথম মনটা আমার বিতৃষ্ণায় তিক্ত হয়ে উঠতো। তাঁর এই স্বভাবের জন্য লোকে আড়ালে তাঁকে উপহাস করলে বা এড়াবার জন্য তাঁকে দেখেই এদিক ওদিক সরে গেলে আবার কেমন দুঃখেও ভরে উঠতো মনটা!

মণ্টিকার্লোর সবাই জানে মিসেস ভ্যানহপার নামজাদা ধনী লোকদের যে ভাবেই হোক পাকড়াও করে তাদের সাথে আলাপ করবেনই। ব্রিজ খেলার মত এটাও ছিল তাঁর বড় একটা নেশা। তাঁর শিকাররা তাদের বিপদ জানবার আগেই তিনি তাদের সুকৌশলে ফাঁদে ফেলতেন। এ ব্যাপারে তাঁর আক্রমণ এত হঠাৎ ও সোজা-সুজি ভাবে হোত যে তারা আর পালাবার পথ খুঁজে পেতনা।

খাবার ঘর আর অভ্যর্থনা ঘরের মাঝে যে বিশ্রামের জায়গাটি ছিল সেখানে একখানি আরাম কেদারায় মিসেস ভ্যানহপার দুবেলা

খাবার পর বসে বসে কফি খেতেন। প্রত্যেককেই তাঁর পাশ দিয়ে আসতে বা যেতে হোত, তখনি তিনি তাঁর ফাঁদ ফেলতেন।

কত বছর চলে গেছে তারপর। কিন্তু মন্টিকার্লো হোটেলের সেই স্মরণীয় বিকেল বেলার কথা এ জীবনে ভুলবো না। মনে হয় ঘটনাটি যেন কাল ঘটেছে!

সেদিন খাওয়া শেষ করে মিসেস ভ্যানহপার তাঁর নির্দিষ্ট সোফায় চুপ করে বসেছিলেন। হয়ত তখন তিনি ভাবছিলেন কি করে কোন্ উপায়ে নবাগত মিঃ ডি উইণ্টারের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। হঠাৎ তাঁর চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আমার দিকে তাকিয়ে তিনি আদেশের সুরে বলে উঠলেন, 'ওপর থেকে আমার ভাগনের চিঠিটা নিয়ে এসো তো। সেই চিঠিটা, যার মধ্যে সে তার মধু যামিনীর কথা লিখেছে, ছবি পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

বুঝলাম তাঁর ফন্দি ঠিক হয়ে গেছে। ভাগনেই হবে এবারকার পরিচয়ের প্রধান সূত্র। মনে মনে খুব বিরক্ত হলাম। কেন জানিনা মনে হলো নবাগত এই ভদ্রলোক নিতান্ত গায়ে-পড়া এমন পরিচয়ের রীতি একটুও পছন্দ করবেন না।

কিন্তু মুখরা, আত্মমর্যাদা জ্ঞান শূন্যা মিসেস ভ্যানহপারকে সে কথা বোঝাবে কে! চিঠিটা খুঁজে পেয়েও আমি নিচে যেতে একটু দ্বিধা করতে লাগলাম। মনে হোল যে কয়েকটি মুহূর্ত আমি যেতে দেরি করবো সেই কয়েকটি মুহূর্তই তিনি একটু নিরালায় শান্তিতে থাকবেন। একবার ইচ্ছে হোল অন্য পথ দিয়ে ঘুরে তাঁকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথাটা জানিয়ে সাবধান করে দিয়ে যাই। কিন্তু কিভাবে তাঁকে বলবো কথাটা তা ভাবতেই মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেল। মিসেস ভ্যানহপারের পাশে বসে আগন্তুক ভদ্রলোকটির সাথে তাঁর গায়ে-পড়া অহেতুক-পরিচয়ের প্রহসন দেখা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় কি আছে!

ফিরে এসে দেখলাম তিনি মিসেস ভ্যানহপারের পাশে সোফায় বসে আছেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে হয়ত মিসেস ভ্যানহপার চিঠির জন্য আর অপেক্ষা না করে সোজাসুজি তাঁর কাছে গিয়ে আপন পরিচয় পেশ করেছেন। কোন কথা না বলে আমি চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। মিঃ ডি উইণ্টার আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। মিসেস ভ্যানহপার আমার দিকে না তাকিয়েই হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'মিঃ ডি উইণ্টার আমাদের সাথে কফি খাবেন। ওয়েটারকে বল আর এক কাপ কফি দিয়ে যেতে।'

তাঁর কথায় কেমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁদের আলাপ আলোচনায় আমি একান্তই অবাঞ্ছিত, তাঁর কথার স্বরে সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। কোন বিখ্যাত লোকের সাথে পরিচয় করবার সময় তিনি এরকম অবহেলার ভঙ্গিতেই আমার সাথে কথা বলেন। অনেকটা আত্মরক্ষার উপায় হিসেবেও তাঁকে এরকম ব্যবহার করতে হোত। কারণ একবার এক জায়গায় সকলে আমাকে তাঁর মেয়ে বলে মনে করায় আমরা দু'জনেই বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম।

মিঃ ডি উইণ্টার আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন বলে সত্যি আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। তিনি ইসারায় ওয়েটারকে ডাকলেন। তারপর মিসেস ভ্যানহপারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কথার প্রতিবাদ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। আমি নই, আপনারা দুজনেই আমার সাথে কফি খাবেন।' আমার পরিত্যক্ত কঠিন চেয়ারটিতে তিনি এবার বসে পড়লেন। আমি মিসেস ভ্যানহপারের পাশে গিয়ে সোফায় বসলাম।

এই ব্যবস্থায় মিসেস ভ্যানহপার খুব যে খুশি হলেন তা মনে হোল না। তবুও মুখের হাসি বজায় রেখে আমার এবং টেবিলের মাঝখান দিয়ে ঝুঁকে পড়ে খুব আগ্রহ ভরে তাঁর সাথে তিনি অনর্গল কথা বলতে

লাগলেন। 'আপনাকে একবার দেখেই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনি তো আমার ভাগনে বিলির বিশেষ বন্ধু। তাই ভাবলাম বিলি ও তার বৌয়ের মধুযামিনীর ছবি আপনাকে দেখিয়ে দিই। এই যে ছবিটি দেখুন। এই যে ডোরা, বিলির বৌ! কী সুন্দর দেখতে, তাই না? বিলি তো ডোরা বলতে একেবারে অজ্ঞান। বিলির ওখানে যে পার্টিতে আপনাকে আমি দেখেছি সেখানে ডোরা সেদিন ছিল না। আচ্ছা মিঃ ডি উইণ্টার, আমাকে আপনি ভুলে যাননি নিশ্চয়?' উৎসুক দৃষ্টিতে একগাল হেসে মিসেস ভ্যানহপার তাঁর দিকে তাকালেন।

'না। আপনাকে আমার বেশ মনে আছে।' মিঃ ডি উইণ্টারের এই উত্তরে আনন্দে গদগদ হয়ে মিসেস ভ্যানহপার তাঁদের সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি সালংকারে বলবার উপক্রম করতেই মিঃ ডি উইণ্টার তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে সিগারেটের কেস্‌টি এগিয়ে দিলেন।

মিঃ ডি উইণ্টারের প্রশান্ত, গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে সহসা আমার মনে হোল তাঁর সুন্দর ও আত্মসমাহিত মুখখানিতে এমন একটা ভাব রয়েছে ভাষায় যাকে প্রকাশ করা যায় না শুধু অনুভব করা যায়। অনেককাল আগে দেখা কোন চিত্রশালায় বিখ্যাত এক শিল্পীর আঁকা একখানি ছবির স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। বিস্মৃত অতীতকালের অপরিচিত এক পুরুষের ছবি! মিঃ ডি উইণ্টার যেন তারই প্রতিমূর্তি! চিত্রকরের নাম আজ আর আমার মনে নেই। কিন্তু তার অপূর্ব সৃষ্টি সেই আলেখ্যখানি আমার মনের পরতে পরতে আঁকা হয়ে আছে। সেই ছবি আজ শুধু ছবিই নয়, একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে! অবাক-বিস্ময়ে ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে কখন তাঁদের আলাপনের সূত্রও হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ শুনলাম মিসেস ভ্যানহপার তাঁকে বলছেন, 'শুনেছি ম্যাণ্ডারলে নাকি অপূর্ব জায়গা! একেবারে রূপকথার মত অপরূপ!' মিসেস

ভ্যানহপার একটু চুপ করে তাঁর দিকে তাকালেন তিনি হয়তো একটু হাসবেন এই আশায়। কিন্তু তিনি তখন নীরবে ধূমপান করছেন। লক্ষ্য করলাম কেমন যেন ভ্রূকুটি-কুটিল, হয়ে উঠলো তাঁর চাহনি। 'আমি অবশ্য ম্যাণ্ডারলের ছবি দেখেছি। সত্যি অপূর্ব! বিলি বলেছে ম্যাণ্ডারলের সৌন্দর্য অন্য সব জায়গার সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয়। আচ্ছা, অমন জায়গা ছেড়ে বিদেশে থাকতে আপনার ভাল লাগে?' মিসেস ভ্যানহপার বকবক করেই চলেছেন। মিঃ ডি উইণ্টার এবারও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর এই একান্ত স্তব্ধতার পরিপূর্ণ অর্থ অন্য যে কেউ হলে হয়ত বুঝতে পারতো। কিন্তু মিসেস ভ্যানহপারের সে বোধ শক্তি ছিল না। তিনি তাঁর খেয়াল খুশি মত বকতেই লাগলেন। লজ্জায় আর অপমানে আমার মুখ লাল হয়ে উঠলো।

'ইংরেজরা কখনও তাদের নিজেদের বাড়ির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। আপনিও দেখছি তা-ই! আচ্ছা, শুনেছি ম্যাণ্ডারলের চিত্রশালায় নাকি পৃথিবীর বড় বড় কবি ও চারণদের অনেক মূল্যবান ছবি আছে?' ওদিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে এবার তিনি আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয় কি জান, ইংলণ্ড বিজয়ের পর থেকেই ম্যাণ্ডারলে মিঃ ডি উইণ্টারের পূর্বপুরুষদের দখলে এসেছে। উনি অবশ্য এত বিনয়ী যে একথা হয়তো স্বীকারই করবেন না। আচ্ছা মিঃ ডি উইণ্টার, আপনার পূর্বপুরুষরা বোধ হয় প্রায়ই তখনকার রাজা ও রাজপরিবারকে ম্যাণ্ডারলের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করতেন?' তাঁর এই অশোভন প্রগল্‌ভতায় আমি লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম। মিঃ ডি উইণ্টার কিন্তু তখনি উত্তর দিলেন, 'এথেল রেডের পর আর কোন রাজাকে অভ্যর্থনা করা হয়নি। ইতিহাসে যাকে 'আনরেডি' বলা হয় সেই এথেল রেড। আমার পূর্বপুরুষদের সাথে তিনি যখন থাকতেন তখনই তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। কারণ একদিনও তিনি

সময়মত খাবার টেবিলে উপস্থিত হতে পারতেন না।' ভেবেছিলাম এই স্পষ্ট জবাবে মিসেস ভ্যানহপারের কাণ্ডজ্ঞান হয়ত ফিরবে। কিন্তু না, তিনি বোকার মত অবিরাম বলে যেতে লাগলেন, 'তাই নাকি? আমি তো তা জানতাম না। আমার অবশ্য ইতিহাসের জ্ঞান খুবই অল্প। আমার মেয়ে মস্তবড় বিদুষী। তাকে এই খবরটা জানাতে হবে তো!'

মিসেস ভ্যানহপারের এই নির্লজ্জ বাচালতায় আমি লজ্জা ও কুণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে নতমুখে ভাবতে লাগলাম ধরণী দ্বিধা হও। মিঃ ডি উইণ্টার হঠাৎ আমার দিকে একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন আমি আরও কফি নেব কিনা। বুঝলাম তিনি আমার বিব্রত অবস্থাটা অনুভব করতে পেরেছেন।

আমার আর কফি চাই না এই উত্তর দিতে গিয়ে দেখি তিনি আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে অপার বিস্ময় আর প্রশ্ন! হয়তো তিনি আমার এবং মিসেস ভ্যানহপারের প্রকৃত সম্পর্কটা বুঝবার চেষ্টা করছিলেন।

'মন্টিকার্লো আপনার কেমন লাগছে?' আবার তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন। আলাপ আলোচনায় আমি কোনদিনই পটু নই। স্কুলের মেয়ের মত তাই থতমত খেয়ে কোন রকমে উত্তর দিলাম মন্টিকার্লোর কৃত্রিমতা আমার এতটুকুও ভাল লাগে না। আমার কথা শেষ না হতেই মিসেস ভ্যানহপার বলে উঠলেন, 'ওর কথা শুনবেন না। ওকি ছাই কিছু বোঝে? কত মেয়ে তো মন্টিকার্লোতে আসবার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!'

'তাহলে তো আসল উদ্দেশ্যটাই ভেস্তে যাবে!' মিঃ ডি উইণ্টারের মুখে ফুটে উঠলো বিদ্রূপ ভরা বাঁকা হাসির একটু ঝলক। মিসেস ভ্যানহপার কাঁধ বেঁকিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। মিঃ ডি উইণ্টারকে তিনি এতটুকুও বুঝতে পারেন নি!

'মন্টি আমার বড় ভাল লাগে কিন্তু! প্রত্যেকবার শীতে এখানে না আসলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। আপনি তো বরাবর এখানে আসেন না। এবার এসেছেন কেন? বোধ হয় গলফ খেলতে?'

'কিছু ভেবে চিন্তে আমি আসিনি; হঠাৎ এসে পড়েছি।' কথা কয়টি বলেই তিনি বিমনা হয়ে পড়লেন। হয়তো তাঁর নিজের এই কথাগুলোই কোন্ স্মৃতির তন্ত্রীতে সহসা ঘা দিয়েছে। সুন্দর মুখখানি আবার বিষণ্ণ, তিক্ত হয়ে উঠলো। মিসেস ভ্যানহপার কোন কিছু লক্ষ্য না করে অনবরত বকবক করে যাচ্ছেন। 'ম্যাণ্ডারলের ঘন কুয়াশার স্মৃতি নিশ্চয়ই আপনার মনে জাগছে? বসন্তকালে ম্যাণ্ডারলের শোভা বুঝি অতুলনীয় হয়ে ওঠে?'

মিঃ ডি উইণ্টার এবার আনমনে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, বসন্তকালে ম্যাণ্ডারলের শোভা সত্যি অপূর্ব!'

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। মিঃ ডি উইণ্টারের দিকে সন্তর্পনে তাকিয়ে আমি তখন ভাবছিলাম কবেকার দেখা সেই ছবিখানির কথা! সহসা মিসেস ভ্যানহপারের তীক্ষ্ণ স্বর আমার সকল তন্ময়তা ভেঙ্গে দিল।

'আপনি এখানকার সকলকে চেনেন নিশ্চয়। তবে এবার বিশেষ নাম করা কেউ আসেন নি। মিডল সেক্সের ডিউক তাঁর বজরায় আছেন। আমি এখনও তাঁর সাথে দেখা করে উঠতে পারি নি। নেল্ মিডল্‌সেক্সকেও জানেন তো? ভা-রি সুন্দর দেখতে, তাই না? লোকে বলে তার দ্বিতীয় ছেলেটি নাকি ডিউকের ঔরসজাত নয়! অবশ্য আমি এসব বিশ্বাস করি না। কারণ সুন্দরী হলে মেয়েদের নামে লোকে যা তা বলবেই। আচ্ছা, কাক্সটন-দম্পতির বিবাহিত জীবন নাকি মোটেই সুখের হয়নি?' কোন উত্তরের আশা না করে মিসেস ভ্যানহপার এভাবে একটানা কথা বলে যেতে লাগলেন। নামগুলো যে

মিঃ ডি উইণ্টারের কাছে একেবারেই অপরিচিত তাও তিনি লক্ষ্য করলেন না। মিঃ ডি উইণ্টার একটি কথাও না বলে আপন ভাবনায় মগ্ন হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর পরিচারক এসে খবর দিল দর্জি মিসেস ভ্যানহপারের জন্য অপেক্ষা করছে। মিঃ ডি উইণ্টার চেয়ার সরিয়ে সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে আর আটকে রাখা উচিত হবে না। কারণ আপনি ওপরে যেতে না যেতেই হয়তো আবার ফ্যাশন বদলে যাবে!' তাঁর কথার শ্লেষটুকু মিসেস ভ্যানহপার একটুও বুঝলেন না। বরং প্রশংসা মনে করে আরও খুশি হয়ে উঠলেন।

লিফ্‌টের দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'আপনার সাথে আলাপ করে এত আনন্দ পেলাম কি বলবো! মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসবেন। কাল বিকেলে আমার কয়েকজন বন্ধু আসবে চায়ের আসরে। আপনিও কেন আসুন না?' আমি এবার বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আসতে পারবো না বলে বিশেষ দুঃখিত। কাল বাইরে যাচ্ছি। কখন ফিরবো কিছুই ঠিক নেই।'

'আশা করি আপনাকে এরা ভাল ঘরেই থাকতে দিয়েছে। বেশ আরামে আছেন তো? কোন অসুবিধা হচ্ছে না? আচ্ছা, আপনার চাকর সব জিনিসপত্তর খুলে ঠিক করে গুছিয়ে রেখেছে নিশ্চয়?' মিসেস ভ্যানহপারের অহেতুক কৌতুহল ও গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতার মাত্রা এতখানি ছাড়িয়ে যাবে তা আমিও ভাবতে পারিনি। মিঃ ডি উইণ্টারের মুখের ভাব দেখে মনে মনে শঙ্কিত হলাম। কিন্তু খুব শান্ত, সংযত স্বরে তিনি বললেন, 'না আমার সাথে কোন চাকর বাকর আসেনি। এজন্য আমার কোন অসুবিধা হলে আপনাকে নিশ্চয় জানাবো। আশাকরি আপনি আমাকে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন।' মিসেস ভ্যানহপার স্পষ্ট কথার আঘাতে এইবার প্রথম লজ্জায়

কিংবা রাগে লাল হয়ে উঠলেন। তবুও বোকার মত হেসে আমৃতা আমৃতা করে তিনি বললেন, 'সে কি, আশ্চর্যতো!' তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিঃ ডি উইণ্টার কোন সাহায্য চাইলে আশাকরি তুমি তাঁকে সাহায্য করবে। তুমি তো এসব বিষয়ে খুবই কাজের মেয়ে!'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিঃ ডি উইণ্টার বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে একবার আমাদের দু'জনের দিকেই তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'সুন্দর ও লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও বলছি, আমার কোন দরকার নেই।' আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি তখনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

লিফটে উঠতে উঠতে মিসেস ভ্যানহপার বললেন, 'ভা-রি অদ্ভুত ব্যাপার তো! আচ্ছা, এরকম হঠাৎ যে উনি চলে গেলেন এটাও এক রকমের ঠাট্টা, কি বল? পুরুষেরা মাঝে মাঝে সত্যি কেমন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে!' একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লিফট থেমে গেল। ঘরের দিকে যেতে যেতে তিনি আবার আমাকে বললেন, 'একটা কথা তোমাকে বলছি। ভেবো না আবার আমি রাগ করে বলছি। আজ মিঃ ডি উইণ্টারের সাথে তোমার আলাপ করবার আগ্রহ দেখে আমি সত্যি বড় অবাক হয়ে গেছি। পুরুষেরা এরকম গায়ে-পড়া স্বভাব কিন্তু একেবারেই পছন্দ করে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। কি আর বলবো! বলবার তো কিছু নেই। একটু শ্লেষের হাসি হেসে আবার তিনি বললেন, 'বিরক্ত হোয়ো না আমার কথায়। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার ব্যবহার আর আদব কায়দার জন্য আমিই তো দায়ী। কাজেই আমার উপদেশ একটু আধটু শুনলে তোমার ক্ষতি হবে না।' তারপর একটি গানের কলির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি তাঁর শোবার ঘরের দিকে চলে

গেলেন। আমি বসবার ঘরে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদ তখনও উজ্জ্বল। মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। আর আধঘণ্টা পর ঘরের জানালা বন্ধ করে এখানে ব্রিজ খেলার আসর জমবে। আমার উপস্থিতিতে মিসেস ভ্যানহপারের বান্ধবীদের অবাধ আলোচনার নগ্নতা খানিকটা বাধা পায়। তাই তারা আমার ওপর খুব খুশিও নয়। তাঁর পুরুষ বন্ধুর দল আমি মাত্র স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছি ভেবে আমাকে ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে ইতিহাস, অঙ্কন বিদ্যা এসব বিষয়ে দু'একটা প্রশ্নও করে। এভাবে অনর্থক সময় বয়ে যায়···।

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কয়েকদিন আগে বেড়াতে গিয়ে মোনাকোতে জীর্ণ, পুরানো একটি বাড়ি দেখেছিলাম। বাড়িটির ভাঙ্গা ছাদের একদিকে ছোট্ট একটি জানালা। কতকালের পুরানো বাড়ি কে জানে! সহসা সেই বাড়িটির ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো। কাগজের বুকে পেন্সিলের রেখায় তাকে ফুটিয়ে তুলবো ভেবে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলাম। কতক্ষণ আঁকার পর দেখি বাড়ি নয়—আমি এঁকেছি একখানি মুখ! বড় বিষণ্ণ তার চোখের দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাক, ঠোঁটের এক কোণে বিদ্রূপ-ভরা হাসির ছটা!···

হঠাৎ লিফ্‌ট-বয় এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আমি তাকে বললাম ম্যাডাম শোবার ঘরে আছেন। কিন্তু ছেলেটি মাথা নেড়ে বললো চিঠিটা নাকি আমারই। অবাক হয়ে সেটা খুলে দেখি তাতে অপরিচিত হাতের একছত্র লেখা—'আজ বিকেলে আমার অভদ্র ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি।' মাত্র এই কয়টি কথা! কোন আরম্ভ বা শেষ নেই চিঠিখানির। খামের ওপরে আমার নাম লেখা। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম নামটি নির্ভুল ভাবে লেখা রয়েছে দেখে।

'কোন উত্তর দেবেন কি?'

'না।' ছেলেটি চলে গেল। চিঠিটা পকেটে রেখে আমি আবার আঁকতে সুরু করলাম। কিন্তু কেন জানি না আর ভাল লাগলো না আঁকতে। আমার আঁকা মুখখানি কেমন যেন প্রাণহীন, পাষাণের মত কঠিন হয়ে গেল একনিমেষে!

॥ ৪ ॥

পরদিন একশো দুই ডিগ্রি জ্বর নিয়ে মিসেস ভ্যানহপারের ঘুম ভাঙ্গলো। ডাক্তারকে তখনি ফোন করলাম। ডাক্তার এসে বললেন সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা, ভয়ের কারণ নেই। তবে কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'অন্ততঃ দিন পনেরর জন্য একজন নার্সের ব্যবস্থা করুন। আপনি তো এঁকে নাড়াচাড়া করতে পারবেন না!'

নার্সের কি দরকার, আমি একাই সব করতে পারবো, একথা ডাক্তারকে বলতে যাবার আগেই দেখি মিসেস ভ্যানহপার তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছেন। নার্স রাখলে তাঁর এই সাধারণ অসুস্থতাই বিশেষ গুরুত্ব পাবে একথা ভেবেই হয়তো তিনি এই ব্যবস্থায় সায় দিয়েছেন।

তাঁর অসুস্থতার খবর এখনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তারপর বন্ধুবান্ধবেরা ঘন ঘন দেখতে আসবে, ফোনে সংবাদ নেবে, কত ফুল পাঠাবে! মন্টিকার্লোর জীবন বড় একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল তাঁর কাছে। এবার এই অসুস্থতাই একটু বৈচিত্র্যের সন্ধান দেবে হয়তো।

সেদিন মিসেস ভ্যানহপারকে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ও দামী জ্যাকেট পরিয়ে নরম বালিশের ওপর আধশোয়া ভাবে শুইয়ে রেখে

আমি চলে এলাম। নার্স এসে গেছে। এবার আমার ছুটি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় চায়ের আসরে যাদের আমন্ত্রণ ছিল তাদের এই অসুস্থতার খবর ফোনে জানিয়ে দিলাম। তারপর আর কিছু করবার ছিল না বলে নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগেই আমি খাবার ঘরের দিকে চললাম। বেলা একটার আগে কেউ খেতে আসে না। তাই ঘরটি তখন একেবারে খালি। কিন্তু একটু এগিয়েই দেখতে পেলাম আমাদের পাশের টেবিলে মিঃ ডি উইণ্টার বসে আছেন। আমি এই আকস্মিক ঘটনার জন্য একেবারেই তৈরী ছিলাম না। ভেবেছিলাম তিনি বাইরে গেছেন। হঠাৎ আমার মনে হোল আমাদের সাথে দেখা যাতে না হয় সে জন্যই হয়তো তিনি এত আগে খেতে এসেছেন।

মুহূর্তকালের জন্য ভাবলাম, ফিরে চলে যাই। কিন্তু আমি তখন ঘরের মাঝখানে এসে পড়েছি। এ অবস্থায় কি যে করবো ভেবে পেলাম না। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা আমাদের টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে তোয়ালেটি খুলে কোলে পাততে যাব, তখন কি করে হঠাৎ ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপর ফুলদানিটা উল্টে পড়ে গেল। ফুলদানির জল আমার কোলে পড়ে তোয়ালেটি ভিজিয়ে দিল। ঘরের এককোণে ওয়েটার দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছুই দেখতে পায়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে মিঃ ডি উইণ্টার শুকনো তোয়ালে হাতে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'উঠে আসুন। এভাবে বসবেন কি করে?' গম্ভীর স্বরে বললেন। তারপর শুকনো তোয়ালেটি দিয়ে টেবিল ঝাড়তে লাগলেন। ওয়েটার এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দৌড়ে এলো।

আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। এতে আমার কোন অসুবিধা হবেনা।' তিনি তার কোন উত্তর দিলেন

না। ওয়েটার ফুলদানিটি তুলে এদিক-ওদিক ছড়ানো ফুলগুলোকে সযত্নে আবার সাজিয়ে রাখতে লাগলো। এবার তিনি বলে উঠলেন, 'ওগুলো থাক। আমার টেবিলে আর একটি জায়গা করে দাও। উনি আমার সাথে খাবেন।' আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না, না, তা হয় না।'

'কেন?'

কি বলবো ভেবে পেলাম না। আমি তো জানি তিনি আমার সাথে খেতে পছন্দ করবেন না। শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে এই ব্যবস্থা করছিলেন। আমি অনুনয় করে বললাম, 'দয়া করে আপনি ভদ্রতা রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হবেন না। আমি এখানে বসেই বেশ খেতে পারবো।'

'নিছক ভদ্রতা রক্ষার জন্যই আমি বলছি না। আপনি আমার সাথে খেলে সত্যি আমি খুশি হবো। ফুলদানি উল্টে না গেলেও আমি আপনাকে এই অনুরোধই করতাম।' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় তিনি আমার দ্বিধা বুঝতে পারলেন। তাই একটু হেসে এবার বললেন, 'আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝতে পারছি। যাক, এখন তো আসুন। ভাল না লাগলে কোন কথা আমরা না-ই বা বললাম।'

কি আর করবো! সসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তারপর আমরা খেতে লাগলাম একটি কথাও না বলে।

আশ্চর্য, এই নীরবতার মাঝে এতটুকুও জড়তা ছিল না। এ যেন একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁর নির্লিপ্ত ভাব দেখে মনে হোল এটাই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য!

'আপনার বন্ধুর কি হয়েছে?' হঠাৎ তিনি আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে মিসেস ভ্যানহপারের ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা জানালাম।

'তাই নাকি? ভা-রি দুঃখের কথা তো!' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, 'আমার চিঠি পেয়েছিলেন তো? সেদিনকার অভদ্র ব্যবহারের জন্য আমি সত্যি খুব লজ্জিত। আমার একক জীবনের নিঃসঙ্গতাই আমাকে অসামজিক, অভদ্র করে তুলেছে।'

'না, না আপনি তো কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নি। তবে মিসেস ভ্যানহপারের হয়ে এটুকু বলতে চাই যে সেদিন তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ওরকম ব্যবহার করেন নি। ওটাই তাঁর স্বভাব। প্রত্যেকের সাথেই বিশেষ করে নামজাদা লোকেদের সাথে তিনি ওরকম করেন।'

'কিন্তু আমাকে তিনি নামজাদা লোক ভাবলেন কেন?'

একটু দ্বিধা করে উত্তর দিলাম, 'বোধহয় ম্যাণ্ডারলের জন্য।'

এবার তিনি চুপ করে রইলেন। অসন্তোষের ক্ষীণ রেখা তাঁর কপালে ভেসে উঠলো। আমি যেন কোন নিষিদ্ধ জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করেছি। ম্যাণ্ডারলে তাঁর নিজের বাড়ি এবং ম্যাণ্ডারলের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা কে না জানে! কিন্তু তারই কথা তোলা মাত্র কেন তিনি এমন বিবর্ণ ও নীরব হয়ে যান! ম্যাণ্ডারলে যেন তাঁর এবং অন্য সকলের মাঝে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর!

কোন কথা না বলে আমরা খেতে লাগলাম। হঠাৎ একখানি ছবির কথা আমার মনে পড়লো। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একবার গাঁয়ের এক দোকান থেকে দু'পেন্স দিয়ে ছবিটি কিনেছিলাম। ছবিখানি ছিল প্রাসাদোপম অপূর্ব সুন্দর একটি বাড়ির! কারুকার্যময় সুন্দর বাড়িটির শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, সবুজ প্রাঙ্গণ, অদূরে নীল সাগরের বেলাভূমি ছবির বুকে জমকালো রঙের রেখায় সত্যি অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছিল। কোন্ জায়গার ছবি দোকানিকে এই প্রশ্ন করলে সে অবাক হয়ে আমার দিকে

তাকিয়ে ছিল, বোধ হয় আমার অজ্ঞতার জন্য! তারপর সে উত্তর দিয়েছিল, 'তাও জান না? এ যে ম্যাণ্ডারলে!'

সেই ছবিখানি তারপর কোথায় কোন্ বইয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে কে জানে! আজ হঠাৎ মনে পড়তেই আমি বুঝতে পারলাম ম্যাণ্ডারলে সত্যি অন্য সমস্ত জায়গা থেকে কত স্বতন্ত্র! ম্যাণ্ডারলে সত্যিই সাধারণ আলোচনার বাইরে। বোধহয় তাই মিঃ ডি উইণ্টার এ বিষয়ে কোন কথা হলেই বিমনা ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আপনার বন্ধু তো আপনার চাইতে বয়সে অনেক বড়। উনি কি আপনার আত্মীয় নাকি? না, অনেক দিনের পরিচিত কেউ?'

'না, উনি আমার কেউ হননা। আমি ওঁর অধীনে কাজ করি মাত্র। উপযুক্ত সাথী হবার জন্য উনি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য আমি বছরে নব্বুই পাউণ্ড পাচ্ছি।'

'টাকা দিয়ে সাথী কেনা যায় তা তো জানতাম না! এ যে একেবারে দাস প্রথার মত দেখছি!'

'আমি একবার অভিধানে 'সাথী' শব্দের অর্থ দেখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল 'সাথী' মানে 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'।'

'তাঁর সাথে তো কোনদিক দিয়েই আপনার এতটুকু মিল নেই!' এবার তিনি একটু হাসলেন। তাঁর সেই নির্বিকার ভাব আর নেই। এখন তিনি একান্তই সহজ মানুষ।

'কেন একাজ করছেন?'

'আমার কাছে নব্বুই পাউণ্ডের মূল্য তো কম নয়!'

'আপনার আর কে কে আছে?'

'কেউ নেই।'

'আপনার নামটি কিন্তু ভারি সুন্দর! একটু অসাধারণও বটে!'

'নামের মত আমার বাবাও কিন্তু খুব সুন্দর এবং অসাধারণ লোক ছিলেন।'

'তাঁর কথা আমাকে বলুন।'

আমি এবার অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। আমার মনের মণিকোঠায় আমার বাবার স্মৃতি যখের ধনের মত কত সংগোপনে আমি সঞ্চয় করে রেখেছি। মিঃ ডি উইণ্টারের কাছে যেমন তাঁর ম্যাণ্ডারলে, আমার কাছে আমার বাবার স্মৃতিও তেমনি একান্ত আমারই একেলার ধন।

মণ্টিকার্লোর জনাকীর্ণ খাবার ঘরে বসে কি করে আমি আমার সেই আপন কথা বলবো! কিন্তু সেদিন সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল। আজও ভাবলে অবাক হয়ে যাই, কি করে সেদিন আমার মত লাজুক, মুখ চোরা মেয়ে তার পারিবারিক কথা, তার জীবনের সকল গোপন ব্যথার কাহিনী অপরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে উজাড় করে দিয়েছিল। তাঁর গভীর চোখের নীরব ভাষায় কি যে আন্তরিকতা ছিল জানি না। আমার লজ্জা আর সংকোচের বাধ গেল ভেঙ্গে!

আমার ছেলেবেলাকার সুখ দুঃখে মেশানো নানা রঙের দিনগুলির স্মৃতি আমি অনর্গল বলে যেতে লাগলাম।

আমার বাবার কথা, মায়ের কথা, বাবার চরিত্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বভাবের অনাবিল মাধুর্য, বাবার প্রতি আমার মায়ের প্রাণঢালা ভালবাসা, নিদারুণ শীতের প্রকোপে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে বাবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, তারপর মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে আমার মায়েরও শেষ যাত্রা—আমার দুর্বল ভাষার বর্ণনায় কতটা ফুটে উঠেছিল জানি না। কিন্তু আমি আমার সকল কথা একের পর এক বলে গেলাম। তারপর এক সময়ে আমার সব কথা গেল ফুরিয়ে!

তাকিয়ে দেখি ঘরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সকলেই গাল-গল্প আর খাওয়ার আনন্দে মশগুল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দু'টো বেজেছে। তাহলে দেড়ঘণ্টা আমরা এভাবে বসে আছি এবং আমিই কেবল অবিরাম কথা বলে যাচ্ছি! একনিমেষে আমার স্বপ্নের কুহেলি গেল কেটে।

অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়ে আমি তাঁর এতটা সময় নষ্ট করেছি বলে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু আমার কথায় তিনি কান দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার নামটি ভারি সুন্দর, অসাধারণ একথা আগেই বলেছি। কিছু মনে না করলে আরও বলতে চাই, আপনার বাবার মত আপনিও চমৎকার! অনেকদিন পর আমি সত্যিকারের আনন্দ পেলাম। আমার জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতার দুঃসহ জ্বালা থেকে যেন আপনি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দিয়েছেন।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। এখন তাঁকে ঘিরে যেন আর কোন অস্পষ্টতার কুয়াশা নেই!

তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'আমার ও আপনার এক বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে। আমরা দু'জনেই সংসারে বড় একেলা। আমার অবশ্য একটি বোন আছে, তার সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হয়। আর আছেন বৃদ্ধা দিদিমা, বছরে তিন চারবার তাঁকে দেখতে যাই। কিন্তু দু'জনের একজনকেও ঠিক সাথী বলা চলে না। মিসেস ভ্যানহপারের ভাগ্য সত্যি খুব ভাল, কারণ বছরে মাত্র নব্বুই পাউণ্ডের বিনিময়ে তিনি আপনার মত এমন সাথী পেয়েছেন!'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার তবু বাড়ি আছে। আমার যে কিছুই নেই।' কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম আবার ভুল করেছি। অনুশোচনায় মন ভরে উঠলো। তাঁর চোখের দৃষ্টি একনিমেষে আবার উদ্‌ভ্রান্ত ও কঠিন হয়ে উঠেছে। বড় অস্বোয়াস্তি বোধ করতে

লাগলাম। তিনি সিগারেট ধরাবার জন্য মাথা নিচু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'শূন্য বাড়ির নিঃসঙ্গতা জনাকীর্ণ হোটেলের নিঃসঙ্গতার মতই দুঃসহ।'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোল কি একটা কথা যেন তিনি বলতে চাইছেন। হয়তো বা ম্যাণ্ডারলের কথা। কিন্তু মনের সাথে বোঝাপড়া করে অবশেষে তাঁর দ্বিধারই জয় হোল বোধহয়! কারণ এবার তিনি অন্য প্রসঙ্গে এলেন।

'তাহলে, 'অন্তরঙ্গ সাথীর' আজ ছুটি?' অত্যন্ত সহজভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন। আবার তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন।

'ছুটিটা কি ভাবে উপভোগ করবেন?' তাঁর এই প্রশ্ন আমাকে মোনাকোর সেই পুরানো, জীর্ণ বাড়িটির কথা মনে করিয়ে দিল। আঁকবার খাতা পেন্সিল নিয়ে সেখানে গেলে তো বেশ হয়! 'আমি তাঁকে সংকোচ ভরে একথা জানালাম। তিনি বললেন, আমি আপনাকে গাড়ি করে সেখানে নিয়ে যাব।' মিঃ ডি উইন্টারের সাথে আলাপ করা নিয়ে গতকাল রাত্রে মিসেস ভ্যানহপারের নির্লজ্জ অপবাদ হঠাৎ আমার মনে পড়লো। ভাবলাম মোনাকোর কথা বলে ভাল করিনি। কারণ তিনিও হয়তো ভাববেন গাড়িতে যাওয়ার জন্য এটা একটা ছল মাত্র!

মিঃ ডি উইন্টারের সাথে একত্রে খাওয়ায় আমার মর্যাদা ইতিমধ্যেই অনেকটা বেড়ে গেছে। আমরা উঠে দাঁড়াতেই ওয়েটার এসে আমার চেয়ার সরিয়ে দিল, আমার দিকে তাকিয়ে নত হয়ে হাসি মুখে সম্মান জানিয়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়া আমার রুমালটি উঠিয়ে আমার হাতে দিল। তার আগের সেই নির্বিকার ও অবহেলার ভাব আজ আর নেই। এই অভাবনীয় পরিবর্তন মিঃ ডি উইন্টারের চোখে পড়লো না। কারণ তিনি তো জানেন না

মাত্র গতকালও আমাকে ঠাণ্ডা, বাসি খাবার দেওয়া হয়েছিল! এসব কথা ভাবতেই আমার নিজের ওপর বড় ঘৃণা হোল। আবার আমার বাবার কথা মনে পড়লো। তিনি বড়লোকের সাথে মেলা-মেশা করা বা চালবাজি করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে আমাকে তিনি সব সময় কত সতর্কও করেছেন।

'কি ভাবছেন?' তাঁর প্রশ্নে আমার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। তাকিয়ে দেখি তিনি আমার দিকে অপলক চেয়ে আছেন।

'কোন কারণে আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন। আনমনে সত্যি আমি কত কি যে ভাবছিলাম! এখন কফি খেতে খেতে তাঁকে তা বলতে লাগলাম। 'একবার ব্লেইজ নামে এক মেয়ে দর্জির কাছে আমি মিসেস ভ্যানহপারকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি তার কাছ থেকে সেবার তিনটে পোশাক কিনেছিলেন। তারপর আমি ব্লেইজের কর্মরত একটা ছবিও এঁকেছিলাম। ক্লান্ত চোখে সে সেলাই করছে, ঘরে মেঝেময় সেলাইর সাজ-সরঞ্জাম এদিক-ওদিক ছড়ানো রয়েছে। তার সেই ছবি আজও আমার স্পষ্ট চোখে ভাসে!'

'তারপর?'

'তারপর একদিন ব্লেইজ আমাকে একশোটি ফ্রাঙ্ক দিয়ে বললো, "আপনার মনিবকে আমার দোকানে আনবার জন্য সামান্য এই কমিশন গ্রহণ করলে খুব খুশি হবো।' আমি তা নিতে অস্বীকার করায় সে অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'এতে দোষের কিছু নেই। এটাই নিয়ম। আচ্ছা, একদিন না হয় আপনি আমার দোকানে আসবেন। আপনাকে একটা পোশাক এমনিতে দিয়ে দেব।'

খুব ছোটবেলা নিষিদ্ধ বই লুকিয়ে পড়লে যে-রকম অপরাধি মনে হয় নিজেকে, সেদিনও ঠিক সেইরকম একটা অনুভূতি হয়েছিল।

আজও যেন সেদিনের মত নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে। ভেবেছিলাম আমার তুচ্ছ গল্প শুনে তিনি হয়তো হাসবেন। কিন্তু তিনি আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি মস্তবড় ভুল করেছেন।'

'কেন ? একশো ফ্রাঙ্ক নিতে রাজি না হয়ে ?'

'না, না, তা কেন ? আপনি আমাকে এতটা ছোট ভাববেন না। আমার মনে হয় মিসেস ভ্যানহপারের মত লোকের কাছে আসা আপনার ভুল হয়েছে। এ ধরণের চাকুরী আপনার জন্য নয়। আপনি অত্যন্ত ছেলে-মানুষ। এই রকম চাকুরে জীবনে আরও কত ব্লেইজের দেখা পাবেন। হয় আপনাকে আপন সত্বা, ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ঐ ব্লেইজদের একজন হয়ে যেতে হবে, না হয় আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে অনেক আঘাত সইতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত হারও মানতে হবে। আচ্ছা, এমন কাজে আসতে কে আপনাকে বুদ্ধি দিয়েছিল বলুন তো ?'

তাঁর এই সহজ, সরল প্রশ্নে আমার মনে হোল আমরা যেন কত কালের পরিচিত বন্ধু! কয়েক বছরের অদর্শনের পর যেন আজ আবার আমাদের দেখা হয়েছে!

'আপনার ভবিষ্যতের কথা একবারও ভেবেছেন কি ? মনে করুন মিসেস ভ্যানহপারের যখন আপনাকে আর ভাল লাগবে না তখন কি হবে ?'

একটু হেসে আমি তাঁকে বললাম যে এজন্য আমি ভাবিনা। আত্মবিশ্বাস, কর্মশক্তি ও বয়স—সবই আমার আছে। তাই এ সংসারে মিসেস ভ্যানহপারদের অভাব কোনদিনই হবে না।

'আপনার বয়স কত ?' একটু হেসে তিনি প্রশ্ন করলেন। আমার বয়স শুনে মুখখানি তাঁর চাপা হাসির ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এরকম বেপরোয়া হওয়া এ বয়সটারই ধর্ম, তা জানি। শত বাধাবিপত্তিতেও এখন আপনি ভবিষ্যত সম্বন্ধে এতটুকুও বিচলিত হবেন না। সত্যি, আমি যে এ জীবনে এই বয়সটা আর ফিরে পাব না তা ভেবে ভারি দুঃখ হচ্ছে কিন্তু! যাক। এখন ওপরে গিয়ে চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে আসুন। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।'

ওপরে যেতে যেতে আমি মিঃ ডি উইন্টারের কালকের ব্যবহারের কথা ভাবছিলাম। তাঁর কালকের ব্যবহারের জন্য আমি তাঁকে কত ভুল বুঝেছিলাম। আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আমার একান্ত দরদী বন্ধু হয়ে গেছেন!

সেদিন বিকেল বেলায় তাঁর সাথে বেড়িয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম আমার জীবনে তা অক্ষয় সম্পদ! সেদিনকার মন্টিকার্লো যেন আমার এতদিনকার পরিচিত একঘেয়ে মন্টিকার্লো নয়! মন্টিকার্লোর আকাশে বাতাসে সেদিন নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করেছিলাম। সেদিনকার মৃদুমন্দ বাতাস যেন আমার গায়ে তার স্নেহ-কোমল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। কারণে-অকারণে আমরা দু'জনে কত হেসেছিলাম। সেই হাসির প্রতিধ্বনি যেন আজও আমার কানে বাজে।

মিসেস ভ্যানহপারের ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রিজখেলা, পার্টি এমনকি আমার নগণ্য অবস্থার কথা—সবই নিঃশেষে ভুলে গেলাম। আমার মধ্যে লজ্জায় সংকুচিতা যে ভীরু মেয়েটি ছিল সেদিনকার বাতাসের সাথে সেও যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা মোনাকোতে গেলাম। কিন্তু দম্‌কাহাওয়ার দাপটে ছবি আঁকতে পারলাম না। আবার আমরা অজানা পথে পাড়ি জমালাম। ওদিককার বিস্তীর্ণ জনবিরল পথটি পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে, গাড়ি সে পথেই চললো। নীল আকাশের বুকে পাখির মত

আমরাও ক্রমে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলাম। গাড়ির উদ্দাম গতিতে আমার মন আনন্দে ও অকারণ পুলকে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। আমি প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। আমার সেই হাসির লহর বাতাসে বাতাসে অনুরণিত হলো। সহসা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আর হাসছেন না, আবার বড় বিমনা ও গম্ভীর হয়ে পড়েছেন।

দীর্ঘায়ত গভীর কালো চোখে আবার সেই নির্লিপ্ত চাহনি! এত কাছে থেকেও যেন কত দূরে চলে গেছেন!

আমরা একেবারে পাহাড়ের শেষ সীমায় উঠে গেছি। গাড়ি এবার থামলো। পাহাড়ের গা বেয়ে যে সর্পিল পথ দিয়ে আমরা এসেছি তাকে ঐ তো দেখা যাচ্ছে। ওপরে উঠে পথটি যেখানে শেষ হয়েছে তারই কিনার ঘেঁষে বিরাট এক গহ্বর নেমে গেছে বোধ হয় দু'হাজার ফিট নিচুতে, যেখানে বিপুল সাগর এক হয়ে মিশে গেছে অনন্ত দিগন্তের কোলে! আমিও এবার স্তব্ধ বিস্ময়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম। সায়াহ্নের আরক্ত আভায় জায়গাটির দৃশ্য সত্যি কী অপূর্ব!

চারিদিক নিরালা, নিথর। এতক্ষণ যে পরিবেশে ছিলাম, এখানে এসে এক লহমায় যেন তা সম্পূর্ণ বদলে গেল! সহসা বাতাস ও যেন রূপ বদলে হিমেল হয়ে উঠলো।

সসংকোচে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি এর আগে কোনদিন এখানে এসেছিলেন কিনা। এবার তিনি আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর সেই শূন্য দৃষ্টি দেখে আমি বুঝলাম তিনি আমার কথা নিঃশেষে ভুলে গেছেন! নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বিস্মৃত কোন্ অতীতের অন্তরালে! হঠাৎ আমার মনে হোল তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃতস্থ নন। একথা ভাবতেই দুর্ভাবনায় আমার বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। আবার তাঁকে ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'আমরা এখন ফিরবো না? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।' দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করার

পর তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা এক নিমেষেই বুঝতে পেরে আমার হাত ধরে গাড়ির দিকে যেতে যেতে তিনি আবার বললেন, 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

তিনি এবার খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালালেন। আমি তখনও বড় অসুস্থ বোধ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর একটু সামলে নিয়ে তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে আগে কোনদিন এসেছিলেন?'

একটু থেমে তিনি বললেন, 'হাঁ, অনেক বছর আগে। তাই দেখছিলাম কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।'

'হয়েছে?'

'না।'

অতীতের কোন্ স্মৃতি তাঁকে অমন আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিল কে জানে! কিছু না জেনেই আমি তাঁর অদ্ভুত ভাবান্তরের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম। এখন মনে হচ্ছে তাঁর সাথে না এলেই ভাল করতাম।

আঁকা বাঁকা ঢালু পথে গাড়ি এবার অবাধ গতিতে নেমে এলো। আমরা কেউ আর একটি কথাও বলছি না। দিন শেষের সূর্যকে ঘিরে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের দল, বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ!

সহসা মিঃ ডি উইণ্টার নীরবতা ভেঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন, ম্যাণ্ডারলের কথা। ম্যাণ্ডারলেতে তাঁর নিজের জীবন যাত্রার কথা নয়, ম্যাণ্ডারলের পরিবেশের কথা। তাঁর প্রাণ ঢালা বর্ণনায় আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠলো ম্যাণ্ডারলের অপরূপ ছবি।

বসন্তকালের অপরাহ্নে ম্যাণ্ডারলের সূর্যাস্তের অপূর্ব শোভা নাকি কবি ও শিল্পীমনের অজস্র প্রেরণার উৎস। ম্যাণ্ডারলের অলিন্দ থেকে শোনা যায় নিস্তরঙ্গ সাগরের মৃদু মধুর কল্লোল!

ম্যাণ্ডারলের বনে বাগানে ড্যাফোডিলরা ফুটে ওঠে থরে বিথরে, সন্ধ্যার মৃদুল হাওয়া তাদের স্বর্ণাভ মাথাগুলিকে আনন্দে দুলিয়ে ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়! ক্রোকাসদের দিন ফুরিয়ে গেছে, এবার তাদের যাবার পালা! তুষার কণিকার মত তারা ঝরে ঝরে পড়ছে নরম মাটির বুকে। আগাছার মত চারিদিকে অজস্রভাবে ফুটে রয়েছে প্রিমরোজের দল। ব্লুবেলরা এখনও ফোটেনি, কচি পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে তারা বুঝি জাগরণের স্বপ্ন দেখছে! তাদের নীল বরণ আকাশের নীলিমাকেও হার মানায়। ম্যাণ্ডারলের আকাশে বাতাসে যেন চির বসন্তের ছোঁয়াচ, তাই ফুলে ফুলে তার এই অপরূপ সাজ বছরের আট মাসই লোকের চোখকে অনাবিল আনন্দের খোরাক জোগায়।

ম্যাণ্ডারলের বাগানে কত রকমারি গোলাপের বাহার! এক রকম গোলাপ আছে যাকে গুচ্ছ গুচ্ছ করে সাজিয়ে ফুলদানিতে রাখলে ভা-রি সুন্দর মানায়! ম্যাণ্ডারলের চারিদিক সব সময়েই ফুলের ঘন সুবাসে সুরভিত।

মিঃ ডি উইণ্টারের বোন নাকি অভিযোগ করেন ম্যাণ্ডারলের ফুলের তীব্র সুগন্ধ তাকে মাতাল করে তোলে। প্রাণমাতানো এই সুবাস কিন্তু মিঃ ডি উইণ্টারের বড় প্রিয়।

শ্বেত-শুভ্র ফুলদানিতে সযত্নে সাজিয়ে রাখা লিলাক গুচ্ছও তীব্র মধুর সুরভি চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। সাগরের বেলা ভূমির দিকে পায়ে চলা যে পথটি গেছে চলে তারই দু'ধারে এজেলিয়া আর রডোডেনড্রনের অফুরান মেলা। সে পথে চলতে চলতে এজেলিয়ার ঝরা একটি পাপড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে একটু ঘষলেই তার তীব্র মধুর গন্ধে নাকি তোমার রোমাঞ্চ হবে! অন্তর নিঙড়ানো ভাষায় তিনি এ-ভাবে ম্যাণ্ডারলের কথা বলে যাচ্ছিলেন। কথা তো নয়—যেন এক একটি ছবি তিনি আমার চোখের সামনে তুলে তুলে ধরছেন!

রাত্রির আঁধার কখন ঘন হয়ে নেমে এসেছে লক্ষ্য করিনি। এখন হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে দেখলাম গাড়ি মন্টিকার্লোর জনাকীর্ণ রাস্তার বুকে এসে গেছে। চারিদিকে কঠিন আলোর ঝলকানি! বাস্তবের রূঢ় আঘাতে মধুর স্বপ্ন এক নিমেষে গেল ভেঙ্গে। এখনই তো হোটেলের দোর গোড়ায় এসে পড়বো। আমি আমার দস্তানা খুঁজতে লাগলাম। দস্তানার সাথে একটি ছোট্ট বইও পেলাম আমার হাতের মুঠোয়। বইটি দেখেই মনে হোল কবিতার বই। নাম দেখবার জন্য পাতা ওল্টালাম। মিঃ ডি উইণ্টার তা দেখতে পেয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, 'বইটি পড়তে চান তো নিয়ে যান।'

আমাদের পথের শেষ হয়েছে। গাড়ি তখন হোটেলের দরজায় এসে গেছে। আমার স্বপ্নের ম্যাণ্ডারলে এখন শতেক যোজন দূর!···

বইটি পেয়ে খুশি হলাম। দিন শেষে আমার মন সংগোপনে যেন তাঁরই একটা জিনিস পেতে চাইছিল।

'আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। আজ রাতে আর দেখা হবে না। আমি বাইরে খাব। আজকের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!' কথা কয়টি বলেই তিনি চলে গেলেন।

হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে আমি একা উঠতে লাগলাম। অকারণ বেদনা-মাখানো নিঃসঙ্গতার অনুভূতিতে মনটা আমার ভরে উঠলো। সমস্ত বিকেলটা যেন এক মুহূর্তে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। নিরানন্দের মলিন অবসাদে মনের ভেতর বড় শূন্যতা বোধ করতে লাগলাম। এখন ওপরে গিয়ে নার্স বা মিসেস ভ্যানহপারের মুখোমুখি হতেও মন চাইলো না। নিচে বিশ্রাম করবার জায়গায় একটা বড় থামের আড়ালে ক্লান্তভাবে বসে পড়লাম। তখন প্রায় পৌনে ছ'টা।

ওয়েটারকে চা আনতে বলে আনমনে কবিতার বইটি নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ একটি কবিতা বেরিয়ে পড়লো আমার চোখের সামনে—

'বছরগুলোর খিলেন ধরে—
দিবস রাতির আড়াল করে,
মনের গভীর জটিল পথে—
পালাই তাঁহার নিকট হ'তে।
সাগর রচি' আঁখির জলে—
নিজেই ডুবি' তাহার তলে,
উছল কত হাসির স্রোতে—
লুকাই তাঁহার নিকট হ'তে।
সবল চরণ তাড়ায় পিছে,
উল্‌কা বেগে নামছি নিচে—
খাড়াই পথে, আঁধার বুকে—
নয়ত' বিকট ভয়ের মুখে।

কবিতাটি পড়ে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হোল। যেন বদ্ধ ঘরের অর্গল ফাঁক করে কেউ উঁকি মারছে! আর পড়তে ভাল লাগলো না। বইটি একপাশে সরিয়ে রাখলাম। সহসা আমার চোখে ভেসে উঠলো দু'হাজার ফিট নিচে সেই বিরাট গহ্বর আর তাঁর চোখের সেই শূন্য দৃষ্টি! স্তব্ধ অতীতের কোন্ স্মৃতির তাড়না তাঁকে অনুসরণ করেছিল! এরকম কবিতার বই তিনি কেনইবা সঙ্গে রেখেছেন? তাঁকে ঘিরে শত জিজ্ঞাসা আমার মনকে তোলপাড় করে তুললো। কিন্তু তিনি যেন আমাদের মত সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! ওয়েটার অপ্রসন্ন মুখে চা-টোষ্ট দিয়ে গেল। আজ আমাকে একা দেখে তার উৎসাহ, আগ্রহ সবই নিভে গেছে বুঝলাম। কোনও রকমে চা, টোষ্ট গলা দিয়ে নামিয়ে আবার একমনে ম্যাণ্ডারলের কথাই ভাবতে লাগলাম। এখানে বসেই যেন আমি এজেলিয়ার তীব্র মধুর গন্ধ পাচ্ছি। সাগরের বিস্তৃত বেলাভূমি আমার

চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠছে। অবাক হয়ে ভাবলাম ম্যাণ্ডারলে তাঁর কত প্রিয়, তবু কেন তিনি মন্টিকার্লোর এই কৃত্রিমতায় পড়ে আছেন!

মিসেস ভ্যানহপারকে বলেছিলেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এখানে আসেননি। খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। এখন যেন আমি বুঝতে পারছি কি এক অশ্রান্ত বিক্ষোভের ব্যাকুলতাই তাঁকে ম্যাণ্ডারলের মায়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠেলে দিয়েছে অজানা পথের অনিশ্চয়তার দিকে! আবার বইখানি হাতে নিলাম। এবার প্রথম পাতাটি খুলে উৎসর্গ-পত্রটি দেখতে লাগলাম। তাতে লেখা রয়েছে, 'ম্যাক্সকে— রেবেকা, ১৭ই মে।' লেখাটা অদ্ভুত ধরণের বাঁকা! অপর পাতায় কালির ছিঁটে পড়ে সাদা পাতাটি কলংকিত হয়েছে! লেখিকা অধৈর্য হয়ে হয়তো লেখনীটি ঝেড়েছিলেন কালির শ্লথ গতিকে স্বতঃস্ফূর্ত করবার জন্য। রেবেকা নামটি কালো কালির আঁচড়ে দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে!

রেবেকার 'র' লম্বাটে ও বাঁকা হয়ে আছে যেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে! বইটি বন্ধ করে আমার দস্তানার আড়ালে রেখে দিলাম। টেবিলের ওপর থেকে একটা পুরানো মাসিক পত্রিকা নিয়ে পড়তে সুরু করলাম। কিন্তু কতক্ষণ পর খেয়াল হোল একবর্ণও আমি পড়তে পারিনি! আমার মনের মুকুরে তখন যে ছবি ভেসে উঠেছিল তা মিসেস ভ্যানহপারের আগের দিনকার চেহারার ছবি! তাঁর ছোট ছোট চোখ দু'টিতে অসীম কৌতূহল নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'কী ভীষণ দুর্ঘটনা! সংবাদটি সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সবাই বলে এই ঘটনার পর একদিনও নাকি মিঃ ডি উইন্টার তার নাম মুখে আনেননি। ম্যাণ্ডারলের সাগরে সে ডুবে গেছে!'......

॥ ৫ ॥

গভীর ব্যথা ও বিস্ময়ের অনুভূতির মাঝে একদিন উপলব্ধি করলাম আমি ভালবেসেছি। এ যে কত বড় বন্ধন, কত মর্মান্তিক যাতনা, আমার সমস্ত অন্তর নিঙড়ানো অভিজ্ঞতার মূল্যে আমি আজ বুঝতে পারলাম। বুক ভরা আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে জড়ানো রয়েছে কত ভয়, ভাবনা ও আশঙ্কা!

অকারণ বেদনা আর ভয়ে মনটা যেন কেবলি কেঁদে কেঁদে মরছে! একুশ বছর বয়সের প্রেম যে বড় ভীরু! মানুষের জীবনে এই দুঃসহ দহন, এই ভালবাসা একবারই আসে। না হলে কী যে হোত কে জানে! কবিরা এ নিয়ে যতই কেন না কবিত্ব করুন ভালবাসার অনেক জ্বালা!

আজ যৌবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে সেইদিনকার সেই প্রথম অনুরাগের বিচিত্র অনুভূতিকে ভাষায় ঠিক প্রকাশ করতে পারবো না হয়তো! কিন্তু একথা আজও মনে আছে সেদিন তাঁর সামান্য একটু কথার টুকরো, একটুখানি স্পর্শ, একটুকু হাসিমাখা চকিত চাহনি আমার একুশ বছরের জীবনে কী আশ্চর্য আলোড়ন তুলেছিল! আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা!

মিসেস ভ্যানহপার তাঁর রোগশয্যায় শুয়ে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বিরক্তিভরা সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ সকালটা কেমন কাটলো?'

'টেনিস খেলা শিখছিলাম।' মিথ্যে কথাটা বলেই আমার বুক কেমন দুরু দুরু করে উঠলো।

'আমার অসুখ হবার পর থেকে তোমার তো কিছুই করবার নেই দেখছি!' সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে আবার তিনি বললেন, 'আমি

ভেবে অবাক হয়ে যাই সারাটা দিন তাহলে তুমি কি কর ? আজকাল তো কোন নূতন ছবিও আঁকছো না। আমার জন্য জিনিসপত্তর কেনাকাটা করতেও বের হওনি বোধ হয়। আমার 'ট্যাকৃসল' আনতে তো রোজই ভুলে যাচ্ছ! যাক। তবু যদি তোমার টেনিস খেলার কিছুটা উন্নতি হয় তো তাই লাভ। ভাল না খেলতে পারলে বড় মুস্কিল কিন্তু। আচ্ছা, এখনও কি খেলার নিয়মকানুনগুলোই শিখতে হচ্ছে ?' আমার দিকে তিনি একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

'হাঁ'। কোনমতে উত্তর দিলাম। তাঁর অসুস্থতার পর থেকে আমি টেনিস খেলা শিখছি না প্রায় পনের দিন হতে চললো। রোজ সকালে মিঃ ডি উইণ্টারের সাথে তাঁর গাড়ি করে বেড়াচ্ছি, তাঁর সাথে তাঁরই পাশে বসে খাচ্ছি। কিন্তু মিসেস ভ্যানহপার এসব কিছুই জানেন না।

'খুব মন দিয়ে আরও বেশিক্ষণ করে তাহলে তোমার খেলা শেখা উচিত। না হয় ভাল খেলা শিখবে কি করে ?' তিনি এভাবে অবিরাম বকে যেতে লাগলেন। আমি চুপ করেই রইলাম।

মন্টিকার্লোর কত জায়গায় আমরা দু'জনে ঘুরেছি, কত হেসেছি, কত কথার জাল বুনেছি। তার মধ্যে সব কথাই কি আর মনে আছে! কত কথা, কত স্মৃতি গেছে হারিয়ে ···!

কিন্তু ভুলিনি সেই পরম মুহূর্তটিকে, তাঁর সাথে বের হবার সময় যখন আশা ও আনন্দে, শঙ্কা ও সংকোচে আমি উতলা হয়ে উঠতাম। বিহ্বল আনন্দের আবেশে আমার আঙ্গুলগুলো থর থর করে কাঁপতো!

মনে পড়ে সেদিন তিনি গাড়িতে বসে পত্রিকা পড়তে পড়তে আমার অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে আসতে দেখে একটু হেসে গাড়ির দোর খুলে দিয়ে বললেন, 'অন্তরঙ্গ বন্ধুটির খবর কি আজ ? কোথায় যেতে মন চায় ?' আমি তাঁর পাশে বসেছি একথা ভাবতেই খুশিতে আমার

মন ভরে উঠেছে। এখন তিনি যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। কোন কথা না বলে আমি বসে রইলাম।

'ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আমার কোটটা পরে নাও।' তাঁর কোটটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কোটটি আমার কাঁধের ওপর রাখলাম। তাঁর কোটের স্পর্শে অকারণ আনন্দে আমার মন ভরপুর হয়ে গেল। সকাল বেলাটি যেন সেই মুহূর্তে আলো ঝলমল হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য! আমার জীবনেও ভালবাসা এলো! কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে লেখা চিরাচরিত পথে তো নয়! রূপে, গুণে, তাঁকে ভোলাবো এমন সম্বল আমার নেই! পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারি এমন কোন ছলা কলাও জানি না আমি! আমি যে অতি সাধারণ, অনভিজ্ঞ নগণ্য এক মেয়ে, প্রিয়-সান্নিধ্যে যার মন প্রাণ নীরব খুশির ভারে উছলে ওঠে শুধু, আর কিছুই যে জানে না!

পথ চলতে চলতে ঘড়ির পানে চোখ পড়লেই আমার মনটা কেমন ভেঙ্গে যেত। ঘড়িটা যেন আমার পরম শত্রু। তার কাঁটা দুটো ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে বেলা একটার দিকে, যখন আমাদের এই অকারণ, অবিরাম চলায় পড়বে ছেদ।

সাগরের তীরে তীরে পূব আর পশ্চিমে কত নাম না জানা গ্রামে গ্রামে আমরা ঘুরেছি তার হিসেবও নেই। একদিনকার কথা মনে পড়ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এগারটা বেজে কুড়ি। মনে মনে তখন ভাবছিলাম এই মুহূর্তটিকে যদি চিরতরে ধরে রাখা যেত! চোখ বুজে আমি যেন সেই পরম মুহূর্তটিকে মনে প্রাণে অনুভব করে নিচ্ছিলাম। চোখ মেলে দেখি গাড়ি তখন বাঁক ঘুরছে আর সেই বাঁকের কোলে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাক পরা এক কৃষক-মেয়ে। তার চোখে মুখে সরল হাসির ছটা। আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হাত নাড়ছে। গাড়ি এক পলকে সেই বাঁকটি ঘুরে সোজা রাস্তায় গিয়ে

পড়লো। মেয়েটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান থেকে খসে পড়ে সে মিলিয়ে গেল বিস্মৃত অতীতের অতল গহ্বরে।

সেখানে কি আবার ফিরে যাওয়া যায় না! সেই মুহূর্তটিকে আবার ফিরে পেতে চায় আমার মন! কিন্তু সহসা মনে হোল যদি ফিরে যাই আবার সেখানে তাহলে হয়তো সেই ক্ষণটিকে আর আগের মত করে পাব না! আকাশের রঙও বুঝি এরই মধ্যে কত বদলে গেছে! সেই কৃষকবালা হয়তো আনমনে পথ চলছে, আমাদের দিকে আর ফিরেও তাকাবে না সে। একথা ভাবতেই কি এক অজানা, অকারণ ব্যথায় মন আমার ছেয়ে গেল!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আরও পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। হোটেলে ফিরবার সময় যে হয়ে এলো!

'আচ্ছা, মানুষের মন যে বিশেষ মুহূর্তটিকে চিরতরে ধরে রাখতে চায়, তাকে যদি সুগন্ধের মত কোন পাত্রে বন্দী করে রাখবার কোন উপায় থাকতো! কখনও তা নষ্ট হবে না, হারিয়েও যাবে না! যখন খুশি সেই মুহূর্তটিকে সুগন্ধের মত উপভোগ করা যাবে!' কথাটা বলেই তিনি কি বলেন শুনবার জন্য আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি কিন্তু আমার দিকে তাকালেন না। একমনে গাড়ি চালিয়ে সমুখের পথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জীবনের কোন্ বিশেষ ক্ষণটিকে তুমি ধরে রাখতে চাও?'

আমাকে তিনি পরিহাস করছেন কিনা তাঁর স্বর শুনে তা বুঝতে পারলাম না। কোন কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, 'আমি এই মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চাই।'

'কেন? আজকের সুন্দর দিনটির জন্য?' একটু হেসে তিনি বললেন। আমি চুপ করে রইলাম। সহসা আমার মনে হোল

আমাদের দু'জনের মাঝখানে যে বিপুল ব্যবধান! সে কথা ভুলে গিয়ে আমার মন এমন কাঙালের মত হয়ে উঠলো কেন!

মনে মনে তখনি স্থির করলাম মিসেস ভ্যানহপারকে কোনদিন আমাদের এই অভিযানের কথা জানাবো না। মিঃ ডি উইণ্টারের হাসির মত তাঁর মৃদু হাসিও আমাকে অপমানিত করবে। আমি জানি তাঁকে সব কথা বললে তিনি এতটুকুও অবাক হবেন না, একটুও রাগ করবেন না। কিন্তু আমার কথায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করে নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে শুধু বলবেন, 'বাছা, তোমাকে যে তিনি তাঁর গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন এতো তাঁর উদারতারই পরিচয়! কিন্তু তুমি কি ঠিক জান যে তোমার সঙ্গ একঘেয়েমির বিরক্তিতে তাঁর মনকে তিক্ত করে তোলে না?'

তারপর হয়তো তিনি আমার পিঠ একটু চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর জন্য 'ট্যাকৃসল' আনবার কথা আর একবার আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। সংসারে অনভিজ্ঞ ও ছেলেমানুষ হওয়ার কত বিড়ম্বনা!

এসব ভাবতে ভাবতে আমি বিমনা হয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলাম। তাঁর সেই বিদ্রূপভরা একটুকরো হাসির স্মৃতি আমি ভুলতে পারছিলাম না। মনের ক্ষোভ চাপতে না পেরে বলে উঠলাম, 'আমি যদি কালো সার্টিনের জমকালো পোশাক ও মণি-মুক্তোর অলংকার পরা ছত্রিশ বছর বয়সের একজন জাঁদরেল ভদ্রমহিলা হতাম!'

'তাহলে আমার পাশে এই গাড়িতে তুমি বসতে পেতে না। একি, নখ কাটছো কেন? ওগুলো তো এরই মধ্যে যথেষ্ট কদাকার হয়েছে!'

'আপনি আমাকে যা-ই ভাবুন একটা প্রশ্ন না করে কিন্তু পারছি না। আচ্ছা, দিনের পর দিন কেন আমাকে আপনার সাথে বেড়াতে

নিয়ে যাচ্ছেন? আপনার উদারতা ও দয়ার সত্যি সীমা নেই! কিন্তু আমাকে কেন আপনার দয়া ও করুণার পাত্র হিসেবে বেছে নিলেন?'

'কারণ তুমি কালো সাটিনের পোশাক পরা, মণিমুক্তোর আভরণে ভূষিতা ছত্রিশ বছর বয়সের ভদ্রমহিলা নও, তাই।' তাঁর মুখ ভাবলেশ হীন। মনে মনে তিনি হাসছিলেন কিনা জানি না।

'আমার সব কথাই তো আপনি জানেন। যদিও আমার সহজ ছোট্ট জীবনে জানবার মত কিছুই নেই। আমি আপনার কথা সেই প্রথম পরিচয়ের দিন যতটুকু জানতাম, আজও তার বেশি জানি না।'

'সেদিন কি জানতে?'

'কেন, আপনি ম্যাণ্ডারলের মালিক। আর—আর সেখানেই আপনি আপনার স্ত্রীকে হারিয়েছেন।'

গত কয়েকদিন হোল যে কথা তাঁকে বলবো ভেবেছিলাম, অবশেষে তা বলেই ফেললাম। 'আপনার স্ত্রী' খুব সহজ ভাবে এই কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। শব্দটি বাতাসে বাতাসে অনুরণিত হয়ে আমার কানে বাজতে লাগলো। তিনি কোন উত্তর দিলেন না দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যে কথা বলার নয় তাই আমি বলে ফেলেছি! কিন্তু আর তো তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না! হঠাৎ সেই কবিতার বইয়ের পাতায় লেখা বাঁকা 'র' আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো। মনটা কেমন বিকল হয়ে গেল। আমার এই অপরাধ তিনি এবার আর ক্ষমা করবেন না। আমাদের পরিচয় ও বন্ধুত্বের এই হয়তো শেষ! তাঁর সাথে আর কোনদিনই বুঝি বেড়াতে পারবো না।

কালই যদি তিনি চলে যান এখান থেকে? পথের পরিচয় পথের শেষেই হয়ে যাবে শেষ! আমার জীবনে যেটুকু রঙ লেগেছিল একনিমেষেই তা ফিকে হয়ে যাবে। আবার সেই একটানা জীবন, মিসেস ভ্যানহপারের একঘেয়ে বিরক্তিকর সঙ্গ।

কতক্ষণ এভাবে আনমনে ভাবছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখি গাড়ির গতি খুব কমে গেছে। রাস্তার একধারে গাড়িটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন। গলায় জড়ানো রয়েছে একটি সাদা মাফ্‌লার। মাথায় টুপি নেই। বহুকাল আগের দেখা অবিকল সেই ছবিখানি! কিছুক্ষণ আগেও যিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁকে যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। এ আমি কার পাশে বসে আছি! কেন?

নীরবে কেটে গেল আরও কয়েকটি মুহূর্ত! আমার দিকে ফিরে তিনি সহসা বলে উঠলেন, ‘কিছুক্ষণ আগে তুমি কোন মুহূর্ত বা কোন স্মৃতিকে ধরে রাখবার উপায়ের কথা বলছিলে! তোমার জীবনের বিশেষ কোন মুহূর্তকে তুমি ধরে রাখতে চাও। কিন্তু আমার চাওয়া ঠিক তার বিপরীত! একবছর আগে একটা ঘটনা আমার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। সে সময়কার সকল কথা সকল অস্তিত্ব আমি নিঃশেষে ভুলে যেতে চাই। সে সবদিন শেষ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে! আমি আবার নূতন করে বাঁচতে চাই। প্রথমদিন মিসেস ভ্যানহপার জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি মন্টিকার্লোয় কেন এসেছি। এরকম প্রশ্ন আমার সেই তিক্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। তার তীব্র জ্বালায় আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে যাই। তোমাকে নিয়ে প্রথমদিন সেই পাহাড়ের চূড়ায় বেড়াতে গিয়ে আমার তাই হয়েছিল! তিন বছর আগে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। তুমি প্রশ্ন করেছিলে জায়গাটির কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। না, কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে শুধু আমার মনের। কিন্তু আমার সেই তিক্ত স্মৃতিকে, অবাঞ্ছিত অতীতকে তুমিই ভুলিয়ে দিয়েছ। মন্টিকার্লোর কোন কিছু যা করতে পারেনি তুমি তা-ই করেছ। তোমার জন্যই আমি মন্টিকার্লো ছেড়ে আর কোথাও

চলে যাইনি। না হয় এতদিনে হয়তো আবার কোন্ অজানা পথের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতাম। তুমি আমার উদারতার কথা বললে, তা যে একেবারেই অর্থহীন। তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়, আমার ভাল লাগে। তাই তোমাকে আমার সাথে বেড়াতে ডাকি। যদি আমার এ কথায় তোমার বিশ্বাস না হয় তাহলে গাড়ি থেকে এখনি নেমে যাও।'

আমি অভিভূতের মত নিথর হয়ে বসে রইলাম। তিনি কি বলছেন কি তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না।

'তাহলে কি করবে?' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন। আমি যদি আরও দু-এক বছরের ছোট হতাম তাহলে হয়তো জোরে কেঁদে উঠতাম। আমার চোখ দু'টো জ্বালা করতে লাগলো।

'আমি বাড়ি যাব।' উদ্গত কান্না চেপে অস্ফুটস্বরে কোনও রকমে বললাম। কোন কথা না বলে আমরা যে পথ ধরে এসেছি সেদিকেই তিনি গাড়ি চালালেন।

আমরা আবার সেই পথের বাঁকে এলাম যেখানে সেই মুহূর্তটিকে আমি ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। সেই কৃষক মেয়েটি আর নেই; দিনের আলো আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। এখানকার সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ যেন একনিমিষে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কান্নার আবেগ আর রোধ করতে পারলাম না। ঝরঝর করে আমার চোখের জল ঝরতে লাগলো অজস্র ধারায়। চোখের জলের এই অবিরল ধারা আমার সকল অপমান ও মনের জ্বালা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক।

সামনের দিকে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। চোখের জল মোছবার চেষ্টা করলাম না। সহসা তিনি আমার হাতটি তুলে তাঁর হাতের মুঠোয় নিলেন। একটিও কথা না বলে আমার হাতের ওপর তাঁর ঠোঁটের মৃদু পরশ বুলিয়ে দিলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার কোলের ওপর ফেলে দিলেন।

উপন্যাসের নায়িকারা কাঁদলে না জানি তাদের কত সুন্দর দেখায়! কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কান্নার আবেগে আমার ফোলা ফোলা লাল চোখমুখ বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল। সুন্দর সকাল বেলাটির সমস্ত আলো যেন নিভে গেল। সামনে পড়ে আছে দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি! এখন হোটেলে ফিরে মিসেস ভ্যানহপারের সাথে খেতে বসতে হবে। তারপর তাঁর সাথে তাসও খেলতে হবে হয়তো। সেই ঘরের ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো: খাটের ওপর তাঁর রোগশয্যায় পত্রিকা, ফরাসী উপন্যাস, আমেরিকান সাময়িকী কত কি এদিক-ওদিক ছড়ানো রয়েছে। সিগারেটের অসংখ্য টুকরো ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে আছে। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে সাজানো রয়েছে কত রকমারি ফুলের তোড়া। তারপর তাঁর বন্ধুর দল এসে গেলে আমাকেই তাদের যথারীতি আপ্যায়ন করতে হবে।

অপ্রীতিকর শুষ্ক কর্তব্যের এসব দায় সারতে সারতেই দিনটা কেটে যাবে অবসন্ন গ্লানির মধ্য দিয়ে। আমাকে হোটেলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে তিনি হয়তো একাকী কোথাও আবার চলে যাবেন। হয়তো বা সাগরবেলায় বা অন্য কোথাও। তখন বুঝি তাঁর সেই হারানো আনন্দ-বেদনার সুর, হারানো স্বপ্ন ও অতীতকে আবার পড়বে মনে! তাঁর জীবনের ফেলে আসা যে অধ্যায়ে আমার প্রবেশের অধিকার নেই সেখানেই আবার তিনি ফিরে যাবেন বুঝি! আমাদের দু'জনের মাঝে সত্যিই কী দুস্তর ব্যবধান! এত কাছে থেকেও তিনি কত দূরে! নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায়, একেলা মনে হোল আমার। তাঁর রুমাল দিয়ে চোখমুখ ভাল করে মুছে ফেললাম। তিনি বলে উঠলেন, 'এসব কথা এখন থাক, আর নয়।' তারপর তাঁর বাঁ হাতটি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে আমাকে তাঁর একান্ত কাছে টেনে নিলেন।

গাড়ি এবার ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে!···

'তুমি আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট ! তাই তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করবো ভেবে পাই না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তোমাকে আজ যা বলেছি সব ভুলে যেও। আমাকে আমার পরিবারের সবাই ম্যাক্সিম বলে ডাকে। তুমিও তাই ডাকবে, কেমন ?' তিনি এবার আমার টুপিটি নিয়ে পেছনের দিকে ফেলে দিলেন। তারপর নিচু হয়ে আমার কপালে ছোট্ট একটি চুমু দিলেন।

'প্রতিজ্ঞা কর কোনদিন তুমি কালো সার্টিনের পোশাক পরবে না।'

আমি এবার হেসে ফেললাম। তিনিও হেসে উঠলেন। আমাদের মনের আকাশ তখনি আবার স্বচ্ছ হয়ে গেল। সকাল বেলাটি আবার হাসি-খুশিতে ভরে উঠলো।

মিসেস ভ্যানহপারের কথা, দিনের একঘেয়ে কাজের কথা—সব ভুলে গেলাম। মনটা আবার আনন্দে নেচে উঠলো। আমাদের দু'জনের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান ঘুচে গেল। আমরা পরস্পরের মনকে আবার স্পর্শ করতে পেরেছি।

প্রথম থেকেই তিনি আমাকে আমার নাম ধরে ডাকেন। এখন থেকে আমিও তাঁকে নাম ধরে ডাকবো। আমার কপালে তিনি চুমু দিয়েছেন। যদিও তার মাঝে কোন নাটকীয়তা ছিল না। এ যেন একান্তই সহজ ও স্বাভাবিক।

আমি এখন থেকে তাঁকে 'ম্যাক্সিম' বলে ডাকবো—'ম্যা ক্সি ম' !···

সেদিন বিকেল বেলায় মিসেস ভ্যানহপারের সাথে তাস খেলতে আমার আগের মত খারাপ লাগলো না। খেলা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ তিনি বললেন, 'মিঃ ডি উইণ্টার এখনও হোটেলে আছেন নাকি ?' কি বলবো ভেবে পেলাম না। ভয়ে ভাবনায় বুক কেঁপে উঠলো। কোনও রকমে থতমত খেয়ে বললাম, 'হাঁ। তিনি তো খেতে রোজই খাবার ঘরে আসেন।'

আমাদের দু'জনকে একত্রে বেড়াতে দেখে কেউ হয়তো তাঁকে বলেছে, আমি যে টেনিস খেলছি না তাও তিনি জেনে গেছেন নিশ্চয়। তাঁর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, কোন কথা না বলে তিনি তাসগুলো বাক্সে তুলে রাখতে লাগলেন।

তাঁর এলোমেলো বিছানাটা আবার পরিপাটি করে গুছিয়ে দিলাম। পাউডারের কৌটো, লিপষ্টিক্, রুজ—প্রসাধন সম্ভারগুলো এগিয়ে দিলাম তাঁর হাতের কাছটিতে।

টেবিলের ওপর থেকে আয়নাটি হাতে নিয়ে তিনি আবার প্রসাধনে মত্ত হলেন। একটু পরে বলে উঠলেন, 'ভদ্রলোক বেশ সুন্দর দেখতে! কিন্তু স্বভাবটা বড় অদ্ভুত মনে হয়। সহজে বোঝা যায় না।'

আমি চুপ করে রইলাম। শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কেমন করে তিনি তাঁর ঠোঁটে লিপষ্টিকের প্রলেপ দিচ্ছেন, রুগ্ন মুখে ভুরুর সূক্ষ্ম রেখা এঁকে চলেছেন। আয়নাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখখানি দেখতে দেখতে আবার বললেন, 'শুনেছি সে নাকি অপরূপ রূপসী ছিল! কেবল রূপই নয়, তার গুণেরও নাকি অবধি ছিল না। ম্যাণ্ডারলেতে প্রায়ই তাঁরা কত জাঁকজমক করে পার্টি দিতেন। দুর্ঘটনাটি এত হঠাৎ ঘটলো! মিঃ ডি উইণ্টার নাকি তাকে অদ্ভুত ভাবে ভালবাসতেন!' তাঁর বন্ধুদের আগমন বার্তা জানিয়ে ঘণ্টা বাজার এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত তিনি রূপ-চর্চায় মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর বন্ধুরা এলে আমাকেই তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে এক এক করে পানীয় পরিবেশন করতে হোল। গ্রামোফোন বাজানো, ছাই দানের নোংরা পরিষ্কার করা, সকলের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা—এসব টুকিটাকি কাজ নীরবে করে যেতে লাগলাম।

'এখন কোন ছবি আঁকছো নাকি?' নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে এই প্রশ্ন করলেন।

'না। এখন কিছু আঁকছি না। আপনাকে কি আর একটা সিগারেট দেব?' এভাবে আমার যতটুকু করবার করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মনটা আমার সেখানে ছিল না। আমার নিভৃত মনের মুকুরে তখন ভেসে উঠেছিল অস্পষ্ট একখানি মুখের ছায়া! ক্রমে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। সে মুখখানি বড় সুন্দর! সেই অনুপম মুখের মন ভোলানো হাসিটুকুও যেন ভোলা যায় না। তার স্মৃতির সৌরভে যেন চারিদিক সুরভিত! আমার শোবার ঘরে বালিশের তলায় রয়েছে যে কাব্য গ্রন্থখানি তারই কোমল হাতের ছোঁয়াচ তার পাতায় পাতায়!......

আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বইটির প্রথম পাতা খুলে সে লিখে যাচ্ছে সেই বাঁকা লেখার আখরগুলো! 'ম্যাক্সকে—রেবেকা।' মিঃ ডি উইণ্টার যেন বইটির পাতা মেলে আগ্রহভরে দেখছেন। সেও তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে। দু'জনে এক সাথে হাসির লহর তুলেছে।

ম্যাক্স! তাঁকে সে ম্যাক্স বলে ডাকতো। কত সহজ ও সুন্দর ডাকটি! কত আপনার! কিন্তু পরিবারের আর সবাই তাঁকে ডাকে ম্যাক্সিম বলে। আমার মত নগণ্য মেয়ের জন্যও সেই ডাক।

ম্যাক্স—তারই একেলার অন্তরঙ্গ ডাক, আর কারও তাতে অধিকার নেই। সেই বাঁকা লেখার দৃঢ় ভঙ্গি যেন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে তার সেই অধিকারের একক দাবীকে। সাদা কাগজের বুকে কালোর আঁচড়ে সেই বাঁকা লেখার দীপ্ত ভঙ্গিমায় বুঝি তারই সবল, গর্বিত চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ! আমি যেন তার মধুর কোমল স্বরের সেই প্রিয় ডাকও শুনতে পাচ্ছি! কিন্তু আমি তাঁকে ডাকবো 'ম্যাক্সিম' বলে। শুধুই 'ম্যাক্সিম'।

॥ ৬ ॥

মন্টিকার্লোয় থাকার দিন ফুরিয়ে এলো। এবার যাবার পালা।
আবার সেই বাঁধা ছাঁদা সুরু হোল। আজ পর্যন্ত কতবারই তো
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এসেছি, গিয়েছি। কিন্তু এবার
মন্টিকার্লো থেকে বিদায়ের মুহূর্তে আমার সমস্ত মন অব্যক্ত এক
ব্যথার ভারে বোবা হয়ে গেছে। আমার জীবনের যা কিছু অমূল্য
সম্পদ সবই যেন এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছি। চরম পাওয়ার পরম
লগন আমার জীবনে এখানেই তো এসেছিল! আজ যাবার বেলায়
কেবলি মনে হচ্ছে এখানেই ফেলে রেখে যাচ্ছি আমার জীবনের সেই
পরম ক্ষণটিকে, আনন্দ-বেদনা মেশানো, অন্তর নিড়ানো বিচিত্র সেই
সুখানুভূতিকে!

মন্টিকার্লোর এই সামান্য হোটেলের চার দেওয়ালের মাঝেই আমি
ভালবেসেছি। তাঁর কথা শুনেছি, কত কথা বলেছি, তাঁর পাশে বসে
খেয়েছি, বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছে এই তো সব কালকের ঘটনা!

আজ মনে হয় আমার জীবনে যেন অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই।
আছে শুধুই বর্তমান! এই যে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি হাত
ধুচ্ছি, আমার সামনে একটা ভাঙ্গা আয়নায় আমার বিবর্ণ মুখ দেখা যাচ্ছে।
মনে হচ্ছে আমার জীবনটা যেন এখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।
অতীত বা ভবিষ্যতে আমার নেই তো কোন সম্বল। আমার এই
বর্তমানেই আমার জীবনের সকল অস্তিত্ব। তাও হারাবার সময়
এসে গেছে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি এবার খাবার ঘরে ঢুকলাম।
তিনি আমার জন্য অন্যদিনের মতই অপেক্ষা করছিলেন। আমার চোখে

মুখে গভীর চিন্তা ও দুঃসহ ক্লান্তির ছায়া পড়েছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। অমোঘ নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে আমি যেন অনিশ্চয়তার অতল অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছি! অন্যদিনের মত আমরা দু'জনে সেদিনও কত কথা বললাম, হাসলাম, পছন্দ মত কত খাবার খেলাম। কিন্তু থেকে থেকে কেবলই আমার মনে হতে লাগলো কালকের আমি এবং আজকের আমির মাঝে কী আকাশ পাতাল ব্যবধান। আজকের আমি যেন অন্য কেউ! আরও বয়স্ক, আরও অভিজ্ঞ। একদিনের মধ্যেই আমার বয়স যেন অনেক বছর এগিয়ে গেছে!…

খাওয়ার পর ঘরে ফিরে গিয়ে বাঁধা ছাঁদা জিনিস পত্রের জঞ্জালের মাঝে শূন্যমনে বসে রইলাম। এখানকার পালা এবার তাহলে সত্যি সাঙ্গ হোল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কি যে এলোমেলো ভাবনা ভাবতে লাগলাম। এ যেন ঠিক কোন এলবামের পাতা উল্টে একের পর এক ছবি দেখে যাওয়া। ছায়া ছবির মত কত কথা, কত স্মৃতি ভেসে উঠছে আমার মনের আরশিতে! ঐ যে দেখা যাচ্ছে আমার জানালা দিয়ে নীল সাগরের বুকের কাঁপন, আর তো এমন করে কোনদিন আমি দেখবো না! আমার বেদনা-মধুর বর্তমানের এক একটি দিন খসে খসে পড়ছে শুকনো ফুলের ঝরা পাপড়ির মত অতীতের স্মৃতি মন্দিরের আঙ্গিনায়।

অগোছালো ঘরের পরিত্যক্ত আবহাওয়ায় সহসা আমার মনে হোল আমরা যেন এখানে বাঞ্ছিত নই। আমরা চলে গেলে নূতন যারা আসবে এ ঘরে, তাদেরই কলরবে আবার মুখর হয়ে উঠবে এই শ্রীহীন ছোট্ট ঘরের রন্ধ্র অনুরন্ধ্র!

কাল চা খাবার সময় মিসেস ভ্যানেহপার আমার দিকে একটি চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ন্যানসির খুব অসুখ। তাই হেলেন শনিবার নিউইয়র্কে রওনা হচ্ছে। আমারও যাচ্ছি, বুঝলে? আমার আর

এখানে ভাল লাগছে না। আচ্ছা, নিউইয়র্ক দেখবে ভেবে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে না?'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত আমাকে ক্ষণকালের জন্য হতবাক করে দিল। আমার চোখে মুখে বোধ হয় আমার ভেতরকার দুঃসহ যন্ত্রণার ছায়াও ফুটে উঠেছিল। কারণ আমার দিকে তাকিয়েই তিনি অবাক হয়ে গেলেন বুঝতে পারলাম। তারপর একান্ত বিরক্তিভরা সুরে বললেন, 'তুমি বড় অদ্ভুত মেয়ে কিন্তু! কোন কিছুতেই যেন তোমার সন্তুষ্টি নেই বাছা। জান, তোমার মত নিঃসম্বল মেয়ের জন্য সেখানে পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে কত আনন্দ, কত মজা! জীবনকে সেখানে যেমন খুশি উপভোগ করতে পারবে। আর তাছাড়া মণ্টিকার্লোও তো তোমার ভাল লাগেনি বলেই জানতাম!'

'এখানকার জীবনে আমি একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' মনের বিক্ষুব্ধ ঝড়কে কোনও মতে একটু শান্ত করে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলাম। 'তা, নিউইয়র্কের জীবনেও ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তা যাক। এখনই যাবার সব ব্যবস্থা করা দরকার। কেরাণী বাবুটিকে চটপট সব ব্যবস্থা করে দিতে বল। আজ সারা দিন তোমার এত কাজ করবার আছে যে মণ্টিকার্লোর জন্য শোক করবার এতটুকু সময়ও পাবে না!' ইঙ্গিত ভরা হাসির একটু ঝিলিক ছড়িয়ে তিনি তাঁর বন্ধুদের ফোন করবার জন্য চলে গেলেন।

তখনি অফিসে যেতে আমার মন চাইলো না। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মেঝের ওপরেই বসে পড়লাম। বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। তাঁর কাছ থেকে চিরদিনের মত চলে যেতে হবে এবার!

সব শেষ হয়ে গেল। আসছে কাল সন্ধ্যে বেলায় এমন সময় আমরা ট্রেনে—কোথায়, কতদূরে! ট্রেনের ঝাঁকুনি ও বিচিত্র শব্দ

তরঙ্গ আমাকে প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দেবে তাঁর কাছ থেকে আমাকে কে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার মাইল দূরে !

তিনি হয়তো তখন মন্টিকার্লো হোটেলের খাবার ঘরে সেই টেবিলটিতে বসে কোন ,বই পড়তে পড়তে চা কি কফি খাবেন আমার কথা একবারও না ভেবে। চলে যাবার আগে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হবে। তিনি হয়তো একটু হেসে বলবেন, 'চলে যাচ্ছ ? মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখো।' অথবা বলবেন, 'তুমি আমার সাথে বেড়িয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ।' 'আচ্ছা, সেই ছবিগুলো আমাকে পাঠাবে তো ?' 'তোমার ঠিকানাটা কি ?' তারপর হয়তো একটি সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকারভাবে বসে থাকবেন। আমি তখন অধীরভাবে শুধু ভাববো আর তো কোনদিন তাঁকে দেখতে পাব না! যাবার মুহূর্তে আর কোন কথাই হয়তো বলা হবেনা। জীবনের পান্থশালায় আমরা দু'জনেই যেন ক্ষণিকের যাত্রী, দু'দিনের অতিথি! মুখে কোন কথা না বলা হলেও মন আমার কেবলি কেঁদে কেঁদে মরবে। বিচ্ছেদের গভীর ব্যথার আকুলতায় বারবার মন আমার বলে উঠবে, আমি তোমাকে ভালবেসেছি, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি।

এই পরম অনুভূতি প্রথম ও শেষবারের মত আমার জীবনকে ছুঁয়ে গেল। তোমাকে না দেখে আমি থাকবো কি করে! কিন্তু মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে প্রকাশ্যে হয়তো বলবো, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' তারপর চলে যেতে যেতে দেখবো তিনি আবার বইয়ের মাঝে ডুবে গেলেন।

বাথরুমের মেঝেয় বসে বসে আমি এসব এলোমেলো ভাবনা ভেবে চলেছি। নিউইয়র্কের দৃশ্যও যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মিসেস ভ্যানহপারের দ্বিতীয় সংস্করণ, মায়েরই উপযুক্ত মেয়ে হেলেন! তার তীক্ষ্ণ ও কর্কশ কণ্ঠস্বর আর তার আব্দারে মেয়ের একঘেয়ে কাঁদুনি যেন

আমার কানে বাজতে লাগলো। আমি জানি সেখানকার জীবন প্রতি মুহূর্তে আমাকে কত বিঁধবে। কোথা দিয়ে সময় বয়ে যাচ্ছিল জানি না। হঠাৎ মিসেস ভ্যানহপার কড়া নাড়লেন। 'কি করছো এতক্ষণ ?'

'এই যে আসছি।' জলের কলটা খুলে দিয়ে অকারণ তোয়ালে ঝাড়ার শব্দ করে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করলাম। বাথরুম থেকে বের হতেই তিনি আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমার কি হয়েছে বল তো ! এই কি স্বপ্ন দেখার সময় নাকি ? কত কাজ পড়ে আছে জান তো !' বিরক্তিভরে তিনি চলে গেলেন।

নিচে নামতে নামতে আমার মন আবার ভাবনা-মুখর হয়ে উঠলো। আমি জানি তিনিও কয়েকদিনের ভেতর ম্যাণ্ডারলে ফিরে যাবেন। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ম্যাণ্ডারলের হলঘরে টেবিলের ওপর এক গাদা চিঠি তাঁর হাতের স্পর্শ পাবার জন্য অপেক্ষা করছে। নিউইয়র্ক যাবার পথে তাঁকে যে চিঠি আমি লিখেছি সেটাও যেন সেখানে আছে। নেহাতই সামাজিক শুকনো চিঠি। তিনি হয়তো এক সপ্তাহ পর সেই চিঠির উত্তর দেবেন অভদ্রতার দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য। তারপর আর কিছু নয় ! বড়দিনের পরে হয়তো একখানা সুন্দর কার্ড পাঠাবেন আমায়। ম্যাণ্ডারলের ছবি হয়তো থাকবে তার বুকে। ছাপার স্বর্ণাভ আখরে তাতে লেখা থাকবে 'নূতন বছরে ম্যাক্সিলিয়ান ডি উইণ্টারের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' তার নিচে হয়তো তিনি দয়া করে তাঁর হাতের লেখায় স্বাক্ষর দেবেন 'ম্যাক্সিম' এই নামটি লিখে। জায়গা থাকলে আরও এক লাইন তিনি লিখবেন, 'আশা করি নিউইয়র্ক তোমার ভাল লাগছে।'

'আপনারা কালই চলে যাচ্ছেন ? আসছে সপ্তাহ থেকে তো ব্যালেট সুরু হবে। মিসেস ভ্যানহপার কি জানেন না সে খবর ?' হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি হোটেলের কেরাণী বাবুটি আমাকে উদ্দেশ্য

করেই বলছেন। ভাবতে ভাবতে আনমনে কখন অফিসের কাছে এসে গেছি সে খেয়াল ছিল না। কল্পনার জাল ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে টেনে নিয়ে এলাম রূঢ় বাস্তবের সংকীর্ণতার মাঝে।

তারপর মিসেস ভ্যানহপারের সাথে খাবার ঘরে ঢুকলাম। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর এই প্রথম তিনি এখানে খেতে এসেছেন। আমার একটুও খাওয়া হোল না। পেটের মধ্যে অসহ্য বেদনায় সবকিছু গুলিয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখলাম তিনি আজ খাবার ঘরে নেই। কাল অবশ্য একবার বলেছিলেন আজ তিনি বাইরে যাবেন।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার বাঁধা ছাঁদা করতে করতে দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলায় মিসেস ভ্যানহপারের বন্ধুরা বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলো। রাতে খাওয়ার পর তিনি বেশ তাড়াতাড়িই শুতে চলে গেলেন।

লেবেল নেবার ছল করে রাত্রি সাড়ে ন'টায় আমি নিচে নেমে এলাম। কিন্তু তখনও তাঁকে দেখতে পেলাম না। সেই কেরাণীটি আমাকে দেখে একটু হেসে বললো, 'আপনি কি মিঃ ডি উইণ্টারকে খুঁজছেন? এইমাত্র খবর পেলাম তিনি অনেক রাত করে ফিরবেন।' 'এক প্যাকেট লেবেল চাই।' আমি তার দিকে চেয়ে বললাম। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে আমি কেন এসেছি! শেষবারের মত আর একটি সন্ধ্যায় আমি তাঁর পাশে বসতে পেলাম না! সমস্ত দিন মনে প্রাণে এই ক্ষণটির জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা করেছি! আশাভঙ্গের দুঃসহবেদনা বুকে নিয়ে এখন আমি একাকী আমার শোবার ঘরে পড়ে থাকবো!

আজও মনে পড়ে সেদিন সমস্ত রাত আমি আকুল হয়ে কেঁদেছি, কেবল কেঁদেছি। আজ হয়তো তেমন কান্না আর আসবে না। বিছানা, বালিশ ভিজিয়ে অঝোর ধারায় তেমন কান্নার আবেগ একুশ বছর বয়সের

পর হয়তো আমাদের জীবনে আর আসে না। আমার সকল ব্যথা ও অভিমান যেন চোখের জল হয়ে সেদিন ঝরঝর করে অবিরল ধারায় ঝরে যেতে লাগলো। তবুও বুঝি তার শেষ নেই! চোখ দু'টো অসহ ব্যথায় বুজে এলো। গলা বুজে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সকালে উঠে এ মুখ আমি দেখাবো কেমন করে?

আজও মনে পড়ছে সেদিন খুব সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে উঠে খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম কতক্ষণ কে জানে! উষার অস্ফুট আলোয় মণ্টিকার্লোকে আবার যেন নূতন করে আরও ভাল লাগলো আমার। জগতের সকল জায়গার সেরা এই মণ্টিকার্লো! মণ্টিকার্লোকেও আমি ভালবেসে ফেলেছি। বাকি জীবন যদি এখানেই থাকতে পারতাম! আর কোথাও যেতে আমার মন চায় না। তবুও আজই চলে যেতে হবে এখান থেকে। এই ঘরে আজই আমার শেষদিন! এই বিছানায় আর তো আমি শোবনা! এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর আমার মুখ দেখবো না কোনদিন। মণ্টিকার্লো হোটেলের এই সাধারণ ছোট্ট একটি ঘরে আমি আমার জীবনকে ফেলে চলে যাচ্ছি একেবারে দেউলিয়া হয়ে, নিঃস্ব হয়ে।

সকালে চা খাবার সময় মিসেস ভ্যানহপার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?'

'কি জানি।' আমার চোখ মুখ হয়তো খুব বেশি রকম লাল ও ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। তাই আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে এরকম উত্তর না দিয়ে উপায় ছিল না।

'বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেলে কিন্তু আর এক মুহূর্তও থাকতে মন চায় না। কি বল? প্রথম ট্রেন এখনও চেষ্টা করলে ধরতে পারি। তাহলে প্যারিসেও একটু বেশি সময় থাকা যাবে। হেলেনকেও তো একটা তার করা দরকার।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার তিনি

বললেন, 'এখনও টিকিট বদলাবার সময় আছে। চেষ্টা করেই দেখা যাক না। যাও এখনি অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা কর।'

'আচ্ছা।' যন্ত্রের মত তাঁর কথায় সায় দিয়ে আমি আমার শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক বদলাতে লাগলাম। মিসেস ভ্যানহপারের ওপর আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। আমি যেন তাঁকে আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সকাল বেলাটিও এভাবে ব্যর্থ হোল। তাঁর কাছে বিদায় নেবার জন্য আমি দশ মিনিট সময়ও পাবনা।

মণ্টিকার্লো তাঁর আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না। তাই তিনি চলে যাবার জন্য এত উতলা হয়ে উঠেছেন। আমার মন যে যেতে চায়না তাঁর কাছে তার মূল্য কতটুকু? তাঁর ইচ্ছা ও অভিরুচির ওপরেই আমাকে নির্ভর করতে হবে। মনটাকে সংযত করে তাঁর নির্দেশ মতই আমাকে চলতে হবে। আমার মত নগণ্য মেয়ের আবার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভাললাগা না লাগা!

পোশাক বদলে এক মুহূর্তও লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা না করে তেতলায় উঠে গিয়ে তাঁর ঘরের কড়া নাড়তে লাগলাম। আসন্ন বিদায়ের ভারে আমার শরীর ও মন দুই-ই তখন বিকল। আমার যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

'কে? ভেতরে এসো।' ঘরের ভেতর থেকে তিনি বলে উঠলেন। দোর ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম এখন আসা আমার উচিত হয়নি। হয়তো এইমাত্র তিনি ঘুম থেকে উঠলেন কাল কত রাত্রে ফিরেছেন কে জানে! এখনও হয়তো বিছানাতেই শুয়ে আছেন। ঘরে ঢুকে দেখি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি দাঁড়ি কামাচ্ছেন। পায়জামার ওপর শুধু একটা জ্যাকেট পরা। আমার নিজের ফ্ল্যানেলের স্যুট, ভারি জুতো সেই মুহূর্তে বড় বাহুল্য মনে হোল। নিজেকে সহসা কেমন বোকা বোকা মনে হোল।

'কি হোল ? এমন অসময়ে যে !'

'আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। আজই আমরা চলে যাচ্ছি।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ক্ষুরটি নামিয়ে রেখে বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দাও।' দরজা বন্ধ করে আমি সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কি বললে ?'

'আমরা আজ চলে যাচ্ছি। আপনার সাথে আর তো দেখা করবার সময় পাবনা। তাই চলে যাবার আগে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।' কি যে বলছি নিজেই যেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। কলের পুতুলের মত শেখানো কথা যেন আবৃত্তি করে গেলাম।

'আমাকে একথা আগে জানাও নি কেন ?'

'মাত্র কাল তিনি ঠিক করেছেন। তাঁর মেয়ে শনিবার নিউইয়র্কে যাচ্ছে। আমরাও তাকে প্যারিসে গিয়ে ধরবো।'

'তাহলে তিনি তোমায় নিউইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'হাঁ। কিন্তু আমি যেতে চাইনা। আমার সমস্ত মন এর বিরুদ্ধে।'

'তাহলে যাচ্ছ কেন ?'

'আপনি তো জানেন যেতে আমাকে হবেই ! আমি তাঁর অধীনে কাজ করছি। না গেলে চলবে কেন ?'

তিনি আবার ক্ষুরটি তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বোস। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।' চেয়ারের ওপর থেকে পোশাক নিয়ে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। আমি তাঁর বিছানার ওপর বসে পড়লাম। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কিরকম অবাস্তব মনে হোল। তিনি কি ভাবলেন কে জানে ! ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আপন ভোলা পুরুষের ঘরের উপযুক্ত চেহারাই বটে ! ঘরটি একেবারে আগোছালো।

অসংখ্য জুতো আর টাই মেঝেতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। টেবিলের ওপর হাতির দাঁতের দু'টো চুলের ব্রাশ ও বড় এক বোতল চুলের সুগন্ধি লোশন রয়েছে।

মনের একান্তে আমি ভেবেছিলাম তাঁর বিছানার একপাশে টেবিলের ওপর বুঝি থাকবে একখানি ছবি। সুন্দর ও দামী চামড়ার ফ্রেমে বাঁধানো একখানি শুধু ছবি! কিন্তু কই, তা তো নেই! কয়েকটি বই এবং সিগারেটের একটি টিন ছাড়া আর কিছু নেই বিছানার পাশে শ্বেতপাথরের টেবিলটিতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি এসে পড়লেন।

'আমি চা খাব, এসো আমার সাথে।' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আর যে সময় নেই! এখনি আমাকে টিকিটের ব্যবস্থা করতে যেতে হবে।'

'তা হোক। এসো, তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

অনুপায় হয়ে তাঁর সাথে খাবার জায়গায় এসে তাঁর পাশে বসলাম। মিসেস ভ্যানহপার এখনি হয়তো আমার খোঁজ করবেন। আমাদের ট্রেন আর আধঘণ্টার মধ্যেই ছাড়বে। দুর্ভাবনায় আমার গলা শুকিয়ে গেল।

'তুমি কি খাবে বল।'

'আমি খেয়েছি। আর খাবনা। আর চার পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতেও পারবো না।' ওয়েটার এলে তিনি নিজের জন্য কফি, ডিমসিদ্ধ, টোষ্ট, মারমালেড আর কমলালেবু আনতে বললেন। তারপর পকেট থেকে নেল পলিস্ বের করে তাতে নখ ঘষতে ঘষতে বললেন, 'তাহলে মিসেস ভ্যানহপারের আর মন্টিকার্লো ভাল লাগছে না? এবার তিনি দেশে ফিরতে চান? আমারও আর এখানে ভাল লাগছে না। তিনি যাচ্ছেন নিউইয়র্কে আর আমি যাচ্ছি ম্যাণ্ডারলে। তুমি কি করবে?' এই দু'জায়গার মধ্যে একটাকে বেছে নাও।'

'এই কি ঠাট্টা করবার সময়?' রাগ দুঃখ দুই-ই বোধহয় আমার স্বরে প্রকাশ পেল।

'যদি ভেবে থাক সকাল বেলা ঠিক খাবার সময়টিতেই ঠাট্টা তামাসা করা আমার স্বভাব তাহলে আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ। সকাল বেলায় আমার মেজাজ সত্যি ভাল থাকে না। আমি আবারও বলছি তোমায়, কি করবে ভেবে নাও। মিসেস ভ্যানহপারের সাথে আমেরিকায় যাবে, না, আমার সাথে ম্যাণ্ডারলে আসবে। যা তোমার খুশি!'

'কেন, আপনার কি সেক্রেটারীর দরকার?'

'না। আমার একজন স্ত্রীর দরকার। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। বোকা মেয়ে, তাও বুঝলে না?'

ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেল। কোলের ওপর হাত দু'টো রেখে আমি নিশ্চল প্রতিমার মত স্থির হয়ে বসে রইলাম। ওয়েটার চলে গেলে আমি বলে উঠলাম, 'এ আপনি কি বলছেন! তা কি করে সম্ভব?'

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?' চামচ নামিয়ে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না সেকথা। এককথায় আমি আপনার উপযুক্ত নই। আপনার যে পরিবেঁশ সেখানে আমি সম্পূর্ণ বেমানান।'

'আমার পরিবেশ! সে আবার কি?'

'কেন, ম্যাণ্ডারলে! আমি কি বলতে চাই বুঝে নিন।'

তিনি আবার চামচ তুলে নিয়ে মারমালেড খেতে খেতে বললেন, 'তোমার দেখছি মিসেস ভ্যানহপারের মতই বুদ্ধি, বিবেচনা! তুমি ম্যাণ্ডারলের বিষয় কতটুকু জান? সেখানে তোমাকে মানাবে

কি মানাবে না তার বিচার আমিই করবো। তুমি ভাবছো নিউইয়র্কে যেতে তোমার মন চায় না বলেই বুঝি আমি এই প্রস্তাব করছি, তাই না? ভাবছো তোমাকে আমার গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, আমার সাথে তোমাকে খেতে বলে আমি যে উদারতা এতদিন দেখিয়েছি, তারই আর একটা নমুনা আমার এই প্রস্তাব, নয় কি?'

'হাঁ।'

'একদিন তুমি বুঝতে পারবে এরকম উদারতা ও বিশ্বপ্রেম আমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এখন কিছু বুঝবে না। তা যাক। তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর দাওনি। বল, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কিনা।'

যে কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, কল্পনাতেও যে ভাবনা ভাবতে আমি সাহস পাইনি কোনদিন, এখন তাই শুনে আমি হতবাক হয়ে রইলাম।

একবার তাঁর সাথে গাড়িতে করে বেড়াবার সময় অনেক দূর পর্যন্ত আমরা দু'জনেই নীরবে বসে ছিলাম। তখন মনে মনে কল্পনা করেছিলাম তিনি যেন হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর সেবা করছি। তাঁর কপালে অডিকোলনের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছি। আমার কল্পনার সীমানা ছিল ঐ পর্যন্তই। আর একবার ভেবেছিলাম আমি যেন ম্যাণ্ডারলের কাছে বাস করছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আমার ঘরে এসে বসেন। তাঁর সান্নিধ্য পাবার জন্য আমার ভীরু কল্পনা এতটুকু ভেবেই অনাবিল আনন্দ পেত! তার বেশি দাবী করবার সাহস আমার ছিল না। তাই, আকস্মিক এই বিয়ের প্রস্তাব আমাকে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে একেবারে হতচেতন করে দিয়েছে।

এ যে সত্য, এ যে সম্ভব হতে পারে আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ যেন স্বয়ং সম্রাট কোন ভিখারিণীকে গ্রহণ করতে চাইছেন! এও কি সম্ভব! তিনি কিন্তু খেয়ে চলেছেন বেশ নির্বিকার ও সহজ ভাবে। যেন কিছুই ঘটেনি!

নাটক নভেলে পড়েছি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্নময় মদির পরিবেশে পুরুষ প্রেম নিবেদন করে তার প্রিয়ার কাছে। এত সহজ ও সোজাসুজিভাবে খাবার টেবিলে বসে কেউ কি এমন প্রস্তাব করে! 'বুঝতে পারছি এই প্রস্তাব করা আমার উচিত হয়নি! আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আমায় ভালবাস। কিন্তু আমার সে ধারণা দেখেছি ভুল।' তার এই কথায় নীরবতা ভেঙ্গে আমি সহসা উতলা হয়ে বলে উঠলাম, 'আমি তোমায় ভালবাসি। সত্যি বড় ভালবাসি। আর তোমাকে কোনদিন দেখবো না একথা ভেবে কাল সারারাত আমি কেঁদেছি।' আমার একথা শুনে তিনি একটু হেসে টেবিলের ওপর দিয়ে তাঁর হাত আমার দিকে বাড়িয়ে আমার হাতটি ধরে বললেন, 'এজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। একদিন যখন তুমি ছত্রিশ বছর বয়সের মহিলা হবে তখন একথা তোমাকে আমি নিশ্চয়ই একবার মনে করিয়ে দেব, কেমন? সত্যি তুমিও যে কোনদিন এত বড় হবে সেকথা ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছে কিন্তু!' মনের আবেগে কথা কয়টি বলে ফেলেই আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

মেয়েদের মনের একান্ত গোপন কথা এভাবে ছেলেদের কাছে ব্যক্ত করতে নেই এই পরম সত্য আমি যেন তখনি বুঝতে পারলাম। আমি যে কিছুই জানিনা। জীবন সম্বন্ধে কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা আমার!

'তাহলে মিসেস ভ্যানহপারের সাথী না হয়ে তুমি আমারই চিরকালের সঙ্গী হবে, তাই তো? তোমার কাজের কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন

হবে না। একমাত্র প্রভেদ এই যে আমি 'ট্যাক্সল' ব্যবহার করি না, 'ইনো' ব্যবহার করি। তোমার আমি কিন্তু আমার এত দিনের এই অভ্যেস ছাড়তে পারবো না তা বলে রাখছি।'

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তিনি কি এখনও ঠাট্টা করছেন? আমার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'আমার ব্যবহার খুব খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তাই না? জানি বিয়ের প্রস্তাব লোকে এভাবে করে না। শুভ্র-সুন্দর ঝলমলে পোশাক পরে, হাতে গোলাপ-গুচ্ছ নিয়ে বাগানে পাম গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় তুমি থাকবে বসে! অদূরে বাজবে মনমাতানো করুণ সুরের লহরী। আমি তখন তোমায় আকুল হয়ে শোনাবো আমার মনের কথা। তবেই না সেটা বেশ সুষ্ঠু ও শোভন হবে, কি বল? আচ্ছা, এজন্য দুঃখ কোরো না। বিয়ের পর মধুযামিনীতে আমি তোমায় নিয়ে যাব ভেনিসে বা অন্য কোথাও তেমনি সুন্দর মায়াময় পরিবেশে। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকবো না। আমি যে তোমাকে ম্যাণ্ডারলে দেখাতে চাই।'

তিনি আমাকে ম্যাণ্ডারলে দেখাতে চান! তাহলে সত্যি এসব ঘটবে! আমিই হবো তাঁর স্ত্রী! ম্যাণ্ডারলের বনে বাগানে, নির্জন সাগর বেলায় আমরা দু'জনে বেড়াবো!

আজ বুঝতে পারছি আমার অনাগত জীবনের সূচনা হয়েছিল সেদিনই যেদিন আমার একান্ত অজানিতে আমি ম্যাণ্ডারলের ছবিখানি কিনে ছিলাম।

তিনি আমাকে ম্যাণ্ডারলে দেখাবেন। আমার ছেলেবেলার সেই ছোট্ট ছবিখানির অপূর্ব সুন্দর ম্যাণ্ডারলে! মন আমার সহসা আনন্দে মেতে উঠলো। ছায়াচিত্রের মত একটির পর একটি ছবি যেন মনের মুকুরে ভেসে উঠলো। কল্পনার রঙে রঙীন কত ছবি!

তিনি একমনে খেয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমার স্বপ্নালু মন তখন কোন্ অচিন দেশের মায়াময় পরিবেশে উধাও হয়ে গেছে।

আমরা দু'জনে যেন কোন জমকালো পার্টিতে গিয়েছি নিমন্ত্রিত হয়ে। তিনি কাকে যেন বলছেন, 'আমার স্ত্রীর সাথে আপনার আলাপ হয়েছে কি ?'

মিসেস ডি উইণ্টার! আমিই হবো মিসেস ডি উইণ্টার! চেক বই, চিঠি পত্র, সমস্ত কিছুতে আমি সই করবো এই নামটি! মিসেস ডি উইণ্টার! কী যাদু এই নামে!

ম্যাণ্ডারলের খাবার ঘরের চকচকে সুন্দর বিরাট টেবিলটা যেন আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো। ম্যাক্সিম বসে আছে টেবিলের এক কোণে। আমাকে ঘিরে কত লোকের সমারোহ! গ্লাস তুলে ধরে আমারই দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে যেন সকলে বলছে, 'মিসেস ডি উইণ্টারের স্বাস্থ্য পান করছি।' সব শেষে ম্যাক্সিম আমায় বলছে, 'তোমাকে এত সুন্দর আর কোনদিন দেখিনি!' বড় বড় ঘর রকমারি ফুলের শোভায় অপরূপ সাজে সাজানো। মিষ্টি মধুর সুবাসে চারিধার আকুল। ম্যাণ্ডারলে···আমার ম্যাণ্ডারলে।

একদিন আমি যেন আমার শোবার ঘরে চুল্লির ধারে চুপচাপ বসে আছি। এমন সময় কে বুঝি কড়া নাড়লো। হাসতে হাসতে একজন ভদ্রমহিলা ঘরে এলেন। ইনিই ম্যাক্সিমের বোন! আমাকে যেন বললেন, 'তুমি সত্যি ওকে সুখী করতে পেরেছ এজন্য আমরাও তোমার ওপর খুব খুশি।'

এমনিভাবে কত কি যে ভেবে চলেছিলাম।

'নাঃ! খেতে আর ভাল লাগছে না। কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে খাবারটা!' হঠাৎ তাঁর এই কথার ধাক্কায় আমি আমার কল্পনা থেকে

জেগে উঠলাম। তাঁর দিকে প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তারপর একটু একটু করে যেন বুঝতে পারলাম আমি কোথায়......!

'মিসেস ভ্যানহপারকে কে বলবে খবরটা? তুমি, না, আমি?' তাঁর কথার সহজ সুরে মনে হোল এ যেন খুব সামান্য একটা ব্যাপার! এতে ভাববার কিছুই নেই। কিন্তু আমার কাছে এ যে জীবন মরণ সমস্যা।

'আমি পারবো না বলতে। তিনি আমার ওপর খুব রেগে যাবেন।' ক্ষীণ স্বরে বললাম।

এবার আমরা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমার তখনকার মনের অবস্থা সত্যি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! আশা ও আশঙ্কায় আমার সমস্ত শরীর বিবশ হয়ে আসছিল। ভাবলাম এখনি হয়তো তিনি আমার হাত ধরে ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলবেন, 'তুমিও নিশ্চয় আমাদের অভিনন্দন জানাবে! আমাদের যে বিয়ে!' তাঁর কথা শুনতে পেয়ে অন্য সব ওয়েটাররাও হেসে মাথা নোয়াবে আমাদের সম্মান দেখাবার জন্য। তারপর আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে চলে যাব, পেছনে রেখে যাব বিস্ময়ভরা কৌতুহলী কত গুঞ্জন! কিন্তু তিনি একটি কথাও বললেন না, আমার হাতও ধরলেন না। নীরবে আমরা চলেছি। অফিস ঘরের সমুখ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না। কেরাণীবাবুটি তার সহকারীর সাথে কি কথা বলতে খুব ব্যস্ত। সে তো জানে না আমি মিসেস ডি উইন্টার হতে চলেছি! ম্যাণ্ডারলে যে আমার হবে!

লিফ্‌টে দোতলায় উঠে আমরা বারান্দা দিয়ে চুপচাপ এগিয়ে চললাম। এবার সহসা তিনি আমার একটি হাত তাঁর হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন।

'আচ্ছা, বেয়াল্লিশ বছর বয়স কি তোমার কাছে খুব বেশি মনে হচ্ছে ?' আমার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন।

'না তো। অল্প বয়সী যুবকদের আমি পছন্দ করি না।' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম।

'তাদের কাউকে তো তুমি জানবার সুযোগ পাওনি।' কয়েকটি মুহূর্ত আবার নীরবে কেটে গেল।

'দু-এক দিনের মধ্যেই আমি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে চাই। এজন্য রেজিষ্টারী বিয়েতেই আমার মত। তারপর ভেনিস বা অন্য কোথাও যেদিকে মন চায় চলে যাব দু'জনে, কেমন ?'

'কেন, বিয়ে কি চার্চে হবে না ? তোমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবেরা কেউ থাকবে না ?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমার একবার সামাজিকভাবে জাঁকজমক করে বিয়ে হয়ে গেছে !' আমরা তখন মিসেস ভ্যানহপারের বসবার ঘরের কাছে এসে গেছি।

'তাহলে তোমার কি মত বল।'

'তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে।' বিবর্ণ মুখে জোর করে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম। বসবার ঘর থেকে মিসেস ভ্যানহপারের গলা এবার শোনা গেল, 'এসেছো ? এতক্ষণ কি করছিলে বলতো ! আমি তিন তিনবার অফিসে ফোন করে জেনেছি তুমি সেখানে যাওনি !'

সহসা আমার বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো। মনে হোল এসব কোন কিছু আমার জীবনে না ঘটলেই ভাল ছিল। ভাবনা-বিহীন একক জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যেই মন আমার আবার ফিরে যেতে চায় !

'এজন্য আমিই দায়ী।' বলতে বলতে মিঃ ডি উইণ্টার বসবার ঘরের দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মিসেস ভ্যানহপার খুব অবাক হয়ে কি যেন বলে উঠলেন। তারপর আমি শোবার ঘরে

গিয়ে খোলা জানালার ধারে ক্লান্তভাবে বসে পড়লাম। এযেন ঠিক ডাক্তারের অপারেশন-রুমের পাশের ঘরে বসে অস্থির মনে অপেক্ষা করা! কখন নার্স এসে বলবে, অপারেশন ভাল ভাবেই হয়ে গেছে। আর চিন্তার কোন কারণ নেই।

ওঘরের কোন কথার আভাস এদিকে পৌঁছলো না। তিনি তাঁকে কি ভাবে কথাটা বললেন কে জানে! হয়তো তিনি বলবেন, 'প্রথম দিন থেকেই ওকে আমার খুব ভাল লেগেছে!' মিসেস ভ্যানহপার তার উত্তরে বলবেন, 'এযে রূপকথার মত আশ্চর্য মনে হচ্ছে!'

সত্যি তাই! এ যেন উপন্যাসের বিষয় বস্তুর মতই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর! আকস্মিক ও বিচিত্র এই ঘটনা সকলকেই হতবাক করে দেবে। আমি মিসেস ডি উইন্টার হবো! সত্যি, এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে! আমি যাকে মনে প্রাণে ভালবেসেছি তারই সাথে হবে আমার বিয়ে! আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন এগিয়ে আসছে! কিন্তু তবুও কেন মাঝে মাঝে মন আমার এত অস্থির, উতলা হয়ে উঠছে! বুকের ভেতরটা অজানা ব্যথার ভারে কেঁপে কেঁপে উঠছে! পাশের ঘরে এভাবে অপেক্ষা না করে দু'জনে হাত ধরাধরি করে ওখানে গিয়ে যদি বলতাম, 'আমরা ভালবেসেছি, এবার বিয়ে করবো!' তবেই বোধ হয় সেটা বেশ সহজ, স্বাভাবিক হতো। ভালবাসা! কিন্তু কই, তিনি তো একবারও বলেননি যে আমাকে তিনি ভালবসেন! হয়তো বলবার সুযোগ ও অবকাশ এখনও হয়নি। এত তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কত সংক্ষেপে নিতান্ত সহজ ভাষায় তিনি কেবল বিয়ের কথাই বলেছেন; নিছক বাস্তব-কথা। অন্যদের মত করে তিনি তাঁর মনের কথা বলেন নি। বইয়ে পড়েছি এই প্রসঙ্গে যুবকেরা ভাবালুতায় কত কি দুর্বোধ্য কথা বলে, মনের বাঁধন হারা উচ্ছ্বাসে অসম্ভব কত কথা বলতেও

তাদের বাধে না। তিনিও হয়তো প্রথমবার রেবেকাকে ওরকম করেই মনের কথা জানিয়ে ছিলেন। স্বপ্ন দিয়ে গড়া কত ভাবের কথা, গভীর প্রণয়ের কথা তাকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এসব কি ভাবছি আমি! না, না, আর ভাববো না এমন করে। এযে অন্যায়!

তিনি আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন। আমাকে তিনি ম্যাণ্ডারলে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথা এখনও শেষ হোল না! কী এত কথা! আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারি না।…ঐ যে বিছানার ওপর কবিতার বইটি পড়ে আছে। তিনি হয়তো একেবারেই ভুলে গেছেন বইটির কথা। উঠে গিয়ে যন্ত্র চালিতের মত আমি বইটি তুলে নিলাম। সহসা কিসে যেন হোচট খেলাম। বইটি তখনি আমার হাত থেকে মেঝেয় কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়লো প্রথম পাতাটি আমার চোখের সামনে মেলে ধরে। 'ম্যাক্সকে — রেবেকা।'

সে তো আর নেই। তবু কেন তাকে আমি ভাবছি! যারা মরে যায় তারা মাটির বুকে নরম ঘাসের আস্তরণে পরম শান্তিতে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু এই যে তার লেখা, এটা কেন এত জীবন্ত! যেন এখনি কথা কয়ে উঠবে! বাঁকা লেখার স্পষ্ট আখরগুলি। কালির সেই উজ্জল দাগ। দেখে মনে হয় মাত্র কাল যেন লেখাটা সে লিখেছে। ড্রয়ার থেকে কাঁচি বের করে পাতাটি সন্তর্পণে কেটে ফেললাম বইয়ের বুক থেকে। হঠাৎ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হোল। পাতাটি টুকরো টুকরো করে কেটে আবর্জনা ফেলবার ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। তার চিহ্ন বই থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বইটিকে এখন একেবারে নূতন মনে হচ্ছে। আবার জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। কিন্তু আশ্চর্য, পাতাটি কেটে ফেলেও তার স্মৃতি মন থেকে দূর করতে পারছি না কেন! আবার উঠে এসে টুকরো কাগজগুলো হাতে নিয়ে দেখি লেখাটি তখনও নষ্ট হয়নি। তেমনি স্পষ্ট, তেমনি প্রাণবন্ত আছে।

আমি এবার টুকরোগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিলাম। আলোর নীল শিখা খুব আস্তে আস্তে কাগজের টুকরোগুলোকে গ্রাস করে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সবশেষে সেই বাঁকা 'র' আলোর শিখায় আরও উজ্জ্বল, আরও বড় হয়ে উঠে একটু একটু করে ছোট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তারপর ভাল করে হাত ধুয়ে আবার এসে জানালায় বসলাম। এবার একটু আরাম পাচ্ছি মনে। যেন বছর শেষে নূতন বছরের প্রথম দিনের নূতন সুখানুভূতি! যেন জীবনকে নূতনভাবে আরম্ভ করবার প্রেরণা পেলাম। এমন সময় তিনি ঘরে ঢুকলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খবর ভাল। প্রথমটা তিনি খুব হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য একটু সামলে উঠেছেন। আমি নিচে গিয়ে তাঁর প্রথম ট্রেন ধরবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তিনি ভেবেছিলেন আমাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন। আমি বুঝি তাঁকে আমাদের বিয়েতে থাকতে বলবো। কিন্তু আমি তা হতে দেইনা। যাক। যাও, এবার তাঁর সাথে কথা বল গিয়ে।' তিনি এবারও কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। কাছে এসে আমার হাতখানিও একবার ধরলেন না। শুধু একটু হেসে চলে গেলেন বারান্দার দিকে। আমি আনমনে মিসেস ভ্যানহপারের কাছে চললাম। তিনি তখন সিগারেট হাতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হোল এই বেঁটে গোলগাল মানুষটিকে আর তো কোনদিন দেখবো না!

'এই যে এসেছো।' শুকনো, বিরস স্বরে তিনি বললেন। 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া তো হচ্ছিল বেশ! তা, শেষরক্ষা করলে কি করে?' কি বলবো ভেবে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

'আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে তো তোমার শাপে বর-ই হয়েছিল। এখন বেশ বুঝতে পারছি কেমন করে কি ভাবে তুমি দিনগুলো কাটাতে। কাজের কথা কেনই বা এত ভুলে যেতে। টেনিস খেলা শেখার কথা

বলে আমার চোখে ধুলো দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছ। কেন, আমাকে সব কথা খুলে বললে কি ক্ষতিটা হোত?'

'সেজন্য আমি দুঃখিত।' অনেক কষ্টে বলে ফেললাম। তিনি শ্যেন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সম্ভব হলে তাঁর সেই দৃষ্টি বুঝি আমাকে সে মুহূর্তেই ভস্ম করে ফেলতো।

'দু-এক দিনের মধ্যেই নাকি তিনি তোমাকে বিয়ে করছেন? তা বেশ! এ বিষয়ে মতামত নেবার জন্য তোমার তো তিন কুলে কেউ নেই। এটাও মস্ত বড় সৌভাগ্য, কি বল? একটা কথা ভেবে কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি, তাঁর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা এ বিয়েতে কি বলবে! তিনি তো বয়সেও তোমার চেয়ে ঢের বড়, তা জান?'

'জানি। কিন্তু আমার বয়সও তো কিছু কম নয়।' তিনি এবার হেসে উঠলেন। তারপরে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তা তো বটেই।' আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বিচারকের কঠোর ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে যেন তিনি আমার মূল্য যাচাই করছিলেন। তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি আমাকে প্রতিমুহূর্তে বড় বিঁধতে লাগলো।

'আচ্ছা বল তো, এমন কোন নিষিদ্ধ কাজ করেছ নাকি যার জন্য'— অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত এবার তিনি আমাকে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন। তাঁর কথায় কি একটা বিশ্রী ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে বুঝতে পেরে ঘৃণায়, রাগে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো। বললাম, 'আপনি কি বলতে চান বুঝতে পারছিনা।' আবার সেই বিশ্রী হাসি হেসে তিনি বললেন, 'তাই নাকি? তা বেশ। কিছু মনে কোরনা বাছা। তাহলে আমাকে একাই প্যারিসে যেতে হচ্ছে? আচ্ছা, তিনি তো আমাকে তোমাদের বিয়েতে আমন্ত্রণও করলেন না।'

'আমার মনে হয় সেটা তিনি চান না।' বেশ কঠিনস্বরে এবার বলে ফেললাম। ব্যাগ থেকে পাউডার বের করে তিনি প্রসাধনে ব্যস্ত হলেন।

তারপর আবার বলতে সুরু করলেন, 'তোমার মনের সাথে ভাল করে বোঝাপড়া করেছ তো ? হাজার হোক ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল কিনা। তাঁর সাথে তুমি ঠিক খাপ খাওয়াতে পারবে বলে মনে হয় না আমার। এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাতেই তো ছিলে আমার কাছে। এখন অবশ্য ম্যাণ্ডারলের সর্বময়ী কর্ত্রী হতে যাচ্ছ। সত্যি কথা বলতে কি, একথা আমি ভাবতেই পারছি না।'

আমার এক ঘণ্টা আগের মনের ভাবনাই যেন আবার তাঁর এই কথার ভেতর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো।

'তোমার এবিষয়ে এতটুকুও অভিজ্ঞতা নেই। দু'টো কথাও তো ভাল করে গুছিয়ে বলতে পার না লোকের সাথে। ম্যাণ্ডারলের জমকালো সব পার্টির কথা শুনেছ তো ? তিনি তোমাকে ওখানকার সব কথাই বলেছেন নিশ্চয় ?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বলে যেতে লাগলেন।

'অবশ্য তুমি সুখী হও আমিও তাই চাই। তিনি সবদিক দিয়েই চমৎকার লোক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও আমার কি মনে হচ্ছে জান ? মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় মস্তবড় একটা ভুল করছো। এজন্য পরে হয়তো তোমাকে অনুতাপও করতে হবে।'

এবার হয়তো তিনি সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এসব শুনতেও আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করবো। তাঁকে আর কোনদিন দেখবো না একথা ভাবতেই বড় আরাম পেলাম মনে। এতদিন তাঁর মত লোকের অধীনে কাজ করে তাঁরই আজ্ঞাবহ ছায়ার মত ছিলাম বলে এখন নিজের ওপর কেমন ঘৃণা হোল। জীবনের অনেকখানি সময় যেন বৃথা অকাজে বয়ে গেছে। জীবন সম্বন্ধে আমি কত অনভিজ্ঞ। অতি সাধারণ নগণ্য একটি মেয়ে আমি, যার রূপ নেই, গুণও নেই। সবই তো জানি। তবু কেন ইচ্ছে করেই তিনি আমাকে এভাবে আঘাত দিতে চাইছেন বার বার ? মেয়ে সুলভ ঈর্ষার জ্বালায়

হয়তো তিনি আমার এই বিয়ের খবরে এতটুকুও খুশি হতে পারেন নি। তাঁর এই তিক্ত বাক্যবাণ আমি মনে করে রাখবো না, এমন কি একদিন তাঁকেও হয় তো নিঃশেষে ভুলে যাব। সেই পাতাখানি পুড়িয়ে ফেলবার পর আমি নূতন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আমরা দু'জনেই এবার আমাদের অতীতকে ভুলে যাব। নূতন করে জীবন সুরু করবো। সে আর আমি!

মড়া গাছের শুকনো পাতার মত, এক মুঠো ছাইয়ের মত আমাদের অতীত উড়ে যাক……আমি মিসেস ডি উইণ্টার হবো। মিসেস ডি উইণ্টার! ম্যাণ্ডারলে এখন আমার। আমি সেখানে থাকবো চিরকাল… আমরণ। মিসেস ভ্যানহপার এখান থেকে চলে গেলে আমরা দু'জনে দু'জনকে আরও নিবিড় করে পাব। ভবিষ্যত জীবনের কত রঙীন ছবি ভেসে উঠবে আমাদের চোখের সামনে। তখন তিনি হয়তো বলবেন তাঁর ভালবাসার কথা! মনের কথা বলবার পরম ক্ষণটি বুঝি তখনই আসবে!

হঠাৎ আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি মিসেস ভ্যানহপার আমার দিকে তখনও সেই রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে অনিমেষ তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে যেন একটু বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। ভাবলাম এবার হয়তো তিনি ভদ্রতা রক্ষার জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন হাতে হাত মিলিয়ে আমাকে মৌখিক শুভেচ্ছা জানাতে। কিন্তু তিনি আবার সেই বাঁকা হাসির একটু ঝিলিক খেলিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চয় জান কেন তিনি তোমাকে বিয়ে করছেন? তোমার প্রেমে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন তাই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছো নাকি? আসল কথাটা কি জান, ঐ বিরাট প্রাসাদে একা আর তিনি থাকতে পারছেন না, নির্জন পুরীর নিঃসঙ্গতা তাঁকে পাগল করে তুলেছে। তাই তোমাকে তাঁর দরকার, বুঝলে?'

॥ ৭ ॥

মে-র প্রথম দিকে আমরা ম্যাণ্ডারলে এলাম। ম্যাণ্ডারলের বনে বাগানে, লতায় পাতায় তখন নব বসন্তের ছোঁয়াচ লেগেছে। ফুলের মন-মাতানো গন্ধ ভরা বসন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে, পাখিরা গান গাইছে, কুঞ্জলতার ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে রঙ-বেরঙের কত ফুলের মেলা। ম্যাণ্ডারলের পুষ্পিত কুঞ্জবনের ব্লুবেলরা কেবল ফুটতে সুরু করেছে। এজেলিয়ার উগ্র মদির বিচিত্র সৌরভে মন মাতাল হয়ে ওঠে। রডোডেনড্রনের নিষ্পত্র গাছগুলি ভরে আছে অজস্র রাঙা ফুলে ফুলে। চারিধারে বসন্ত-প্রকৃতির মুক্ত হাতের ছড়ানো ঐশ্বর্য সম্ভারে ম্যাণ্ডারলের সেই অপরূপ শোভা মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে দেখে দেখেও বুঝি আশ মেটে না।......

মনে পড়ে লণ্ডন থেকে যেদিন সকাল বেলায় আমরা গাড়ি করে রওনা হয়েছিলাম তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। বিকেল পাঁচটায় ঠিক চা খাবার সময় আমাদের ম্যাণ্ডারলে পৌঁছবার কথা। সেদিনও আমার পরনে ছিল আগের মতই খুব সাধারণ পোশাক, গলায় ছোট্ট একটি মাফলার। বৃষ্টির জন্য আমার গায়ের ওপর ছিল প্রকাণ্ড একটা বর্ষাতি। আমার হাতে ছিল এক জোড়া দস্তানা আর চামড়ার বড় একটা ব্যাগ।

রওনা হবার সময় ম্যাক্সিম বলেছিল, 'একেই বলে লণ্ডনের বৃষ্টি। এই আছে, এই নেই। ম্যাণ্ডারলে গিয়ে হয়তো রোদে ঝলমল দিনের দেখা পাবে।'

সত্যি তাই হোল। আমারা মাঝপথে যেতে না যেতেই মেঘের সেই ঘনঘটা কোথায় গেল মিলিয়ে। সুনীল আকাশ সোনার রোদে আবার ঝলমল করে উঠলো। আমাদের সামনে পরিষ্কার সুন্দর

পথরেখাটি দেখা যাচ্ছে। লণ্ডনের মেঘমেদুর আকাশ ও অবিরল বৃষ্টির ধারায় আমার মন বড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল এ যেন বড় অশুভ লক্ষণ। তাই আবার রোদের পরশ পেয়ে বেশ ভাল লাগলো।

'কি, ভাল লাগছে তো?' ম্যাক্সিম মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমিও একটু হেসে কোন কথা না বলে তাঁর হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছিলাম ম্যাক্সিম যাচ্ছে তার নিজের বাড়িতে একান্ত পরিচিত জীবন যাত্রার মধ্যে। তাই তো তার ভাবভঙ্গি, তার প্রতিটি কথা কত সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাকে যে সেই অজানা জায়গার নূতন জীবনের চিন্তা বড় ভাবিয়ে তুলেছে।

অজানা এক আশঙ্কায় আমার বুক দুরু দুরু করছে সে কথা কি ম্যাক্সিম বুঝতে পেরেছে? কে জানে!

'আমরা এখনি পৌঁছে যাব। আর বেশি দেরি নেই। তোমার এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে, তাই না?' সামনে একটি বাঁক এসে গেছে। তাই সে আমার হাত থেকে তার হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ির গতি কমাবার দিকে মন দিল। তার কথায় বুঝলাম আমার নীরবতাকে সে পথের ক্লান্তি ভেবে নিয়েছে। ম্যাণ্ডারলের পথ যতই এগিয়ে আসছে আমি যে ততই অস্থির হয়ে ভাবছি পথ যেন এখনি না ফুরোয়, সে কথা তো সে জানে না। পথের ধারে কোন পান্থশালায় নেমে আরও খানিকটা সময় যদি কাটিয়ে যেতে পারতাম! কিংবা ম্যাক্সিম যদি আমার যাযাবর পথিক স্বামী হোত! চিরকাল পথের সাথী হয়ে তার সঙ্গে পথে পথেই যদি ঘুরে বেড়াতে পারতাম! ম্যাক্সিম ডি উইন্টারের স্ত্রী হয়ে কেন যাচ্ছি আমি ম্যাণ্ডারলের ঐশ্বর্য সম্ভারের মধ্যে! কেন?

যেতে যেতে আমাদের পথের দু'ধারে কত গ্রাম পড়লো। ছায়াভরা মাটির পথের দু'দিকে ছবির মত সুন্দর সব ছোট ছোট কুটির। কোন

কুটিরের দোরে কৃষক-বধূ ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে হাসিভরা চোখে তাকিয়ে। একজন কৃষক জল আনতে বালতি হাতে কুঁয়োর দিকে চলেছে পথ পার হয়ে। এমনি কত ঘরকন্নার ছবি দেখতে দেখতে আমরা চলেছি। সহসা আমার মনে হোল আমিও যদি ওদের মত ওই কুটিরের এক খানিতে থাকতে পারতাম ওদেরই একজন হয়ে! সন্ধ্যাবেলা আমার কৃষক স্বামী ম্যাক্সিম সেই কুটিরের দোর গোড়ায় সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারই আপন হাতে গড়া সুন্দর সাজানো বাগানের দিকে তৃপ্তিভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে সে। আমি তখন রান্নাঘরে আমাদের রাত্রির খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত থাকবো। খাবার ঘরে টেবিলের একপাশে ছোট্ট একটি ঘড়ি টিক্ টিক্ করে বাজবে, একপাশে সাজানো থাকবে খাবারের প্লেটগুলো আর অন্য যা কিছু সরঞ্জাম। আমাদের রাত্রির খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ম্যাক্সিম বসে বসে পত্রিকা পড়বে, আর আমি কতগুলো পুরানো পোশাক নিয়ে তারই পাশে বসবো সেগুলো রিফু করতে। কত সহজ ও সুন্দর এই জীবন। গরীব হলেও তারই মধ্যে না জানি কত শান্তি, কত তৃপ্তি।...

'আর মাত্র দু'মাইল আছে।' ম্যাক্সিম বলে উঠলো। 'ঐ যে দূরে পাহাড় গুলোর ফাঁকে ফাঁকে বিরাট সব গাছের সারি দেখা যাচ্ছে আর সেই নিবিড় বনের সবুজ যেখানে সাগরের নীলে এক হয়ে মিশে গেছে সেখানটিতেই ম্যাণ্ডারলে। ওই গাছগুলো ম্যাণ্ডারলের চারিপাশের গভীর অরণ্য।'

আমি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে জোর করে একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। ভয়ে ও আশঙ্কায় আমার বুক শুকিয়ে উঠলো। মনের এই অকারণ অসোয়াস্তিকে কিছুতেই শান্ত করতে পারলাম না। এতক্ষণ যে মধুর কল্পনায় ডুবে ছিলাম এক লহমায় তা কোথায় মিলিয়ে গেল। অবোধ শিশুকে যেন প্রথম স্কুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমার

মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হোল। বিয়ের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি যতটুকু আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলাম এখন যেন এই বাতাসের সাথে তা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ম্যাণ্ডারলের মত জায়গায় চলতে হলে যে রকম আচার ব্যবহার, রীতি নীতি জানা দরকার তার বিন্দুমাত্রও যে আমি জানি না। সেখানে গিয়ে আমি কি করবো!

'বর্ষাতিটা এখন খুলে ফেল।' ম্যাক্সিম আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখছো, এদিকে এক ফোঁটাও জল হয়নি। মাফলারটা ঠিক করে দাও।' আমার দিকে ভাল করে আর একবার তাকিয়ে আবার গম্ভীরভাবে বললো, 'তোমাকে এরকম সাধারণ পোশাকে আনা আমার খুব অন্যায় হয়েছে। তোমার জন্য কয়েকটি পোশাক লণ্ডনেই কেনা উচিত ছিল এখন বুঝতে পারছি।'

'তুমি কিছু মনে না করলে আমার এই পোশাকই বেশ ভাল।' আমি বললাম।

এবার সে আনমনে বলে উঠলো, 'মেয়েরা কিন্তু প্রায় সবাই কেবল সাজ পোশাকের কথা ভাবে।' আমাদের গাড়ি আর একটা বাঁক ঘুরে এবার উঁচু প্রাচীর ঘেরা আর একটি রাস্তায় পড়লো।

'এই যে আমরা এসে গেছি।' ম্যাক্সিম উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো। আমি হঠাৎ যেন খুব ভয় পেয়ে দু'হাতে বসবার সিটটাকেই আঁকড়ে ধরলাম। আঁকা বাঁকা এই পথটি আমাদের বাঁ দিকে একটি বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে বিরাট এক লোহার ফটকের সীমানায় শেষ হয়ে গেছে। ফটকের মধ্যে ঢুকেই সামনে গাড়ি চলবার বিস্তীর্ণ পথ। সেখান দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ফটকের পাশের সেই বাড়িটির জানালা দিয়ে কতগুলো মুখ সাগ্রহে উঁকি ঝুঁকি মারছে। পথের একপাশে একটি ছোট ছেলে কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে যাচ্ছে। কেন এরা এভাবে উঁকি দিচ্ছে বুঝতে

পেরে আমার বুক আবার কেঁপে উঠলো। আমি কেমন তাই তারা দেখতে চায়। হয়তো এতক্ষণে তাদের ছোট্ট রান্নাঘরে জমা হয়ে আমার কথা কত কি আলোচনা করছে। কেউ হয়তো বলছে, 'তার টুপির ওপরটা শুধু দেখলাম।' কেউ বলছে, 'তার মুখ তো দেখতে পেলাম না।' এমনি কত কি।

ম্যাক্সিম আমার মনের অবস্থা এবার হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরেছে। তাই আমার একখানি হাত তার ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমাকে দেখবার জন্য এদের আগ্রহ এবং কৌতূহল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তাই কিছু মনে কোর না। আমার মনে হয় গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তোমার কথা ছাড়া এরা আর কোন বিষয়ে আলোচনা করেনি। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে। এরা তোমাকে ভাল বাসবেই। ম্যাণ্ডারলের কথাও তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা। মিসেস ডানভারসই সব করবে। প্রথম কয়েক দিন হয়তো সে একটু দূরত্ব রেখে চলবে। সে জন্যও কিছু ভেবোনা। তার চরিত্র সত্যি একটু অদ্ভুত।' আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি তখন ভাবছিলাম কবেকার সেই ছোট্ট একটি মেয়ের কথা। গাঁয়ের দোকান থেকে একখানি ছবি কিনে আনন্দে মশগুল হয়ে সে ভেবেছিল এই সুন্দর ছবিখানি তার এলবামে থাকবে। ম্যাণ্ডারলে। কী সুন্দর নামটি। ছবির সেই ম্যাণ্ডারলে আজ সম্পূর্ণই বাস্তব। একান্তই আমার। আশ্চর্য! গাড়ি চলার এই পথটি আজ আমার কাছে কত অজানা, অচেনা। কিন্তু একদিন এই পথরেখার প্রতিটি ধুলি কণাও আমার কত পরিচিত হয়ে যাবে। এই পথ দিয়ে চলতে চলতে আমি হয়তো দাঁড়িয়ে পড়বো যেখানে মালিরা আপন মনে তাদের কাজ করে চলেছে। তারপর সেই ফটকের পাশে বাড়িটির সামনে এসে তাদের খোঁজ নেব। তারাও আমাকে সাদরে তাদের রান্নাঘরে ডেকে নেবে। আমার

সম্বন্ধে তখন আর থাকবে না তাদের কোন কৌতূহল। তারা আমাকে ভালবাসবে।

ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে মুখে নির্লিপ্ত এক শান্তির ভাব ফুটে উঠেছে। নিজের বাড়িতে এসে সে সত্যি খুশি হয়েছে। তার এই সহজ, সুখী ভাব দেখে আমার যেন হিংসে হচ্ছে। জানিনা কবে তার মত আমিও এখানকার জীবনে একান্ত সহজভাবে আপনাকে মিশিয়ে দিতে পারবো। তার আরও কত দেরি! যেদিন আমার অনেক বয়স হবে, চুলে পাক ধরবে সেদিন নিশ্চয় আজকের মত আর ভীরু থাকবো না।

সহসা আমার কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ি ভেতরে ঢুকে যেতেই লোহার ফটক সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বড় রাস্তা আর দেখা যাচ্ছে না। ভেবেছিলাম ম্যাণ্ডারলের গাড়ি চলার পথটি হবে সবুজ, কোমল দূর্বার আস্তরণে ঢাকা সুন্দর ও বিস্তীর্ণ একটি পথ। কিন্তু যে পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে আমার কল্পনার সঙ্গে তার এতটুকুও মিল নেই। এই পথটি চলেছে সাপের মত এঁকে বেঁকে। পথের দু'পাশে যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিশাল অগনন গাছের সারি একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। দুপুরের প্রখর সূর্যও এই সারিবদ্ধ গাছগুলোর নিবিড় আলিঙ্গন ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। আলোর সামান্য একটু রেখা কেবল পাতার ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি মেরে পথের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে সোনার কুচি কুচি টুকরোর মত। চারিদিক নীরব, নিথর! মৃদুমন্দ বাতাসও আর বইছে না। গাড়ির ইঞ্জিনের সুরও যেন বদলে গেছে। গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে উপত্যকার দিকে, নাম না জানা কত গাছ আমাদের দিকে এগিয়ে এলো এত কাছে যে আমি যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছুঁতে পারি। এক জায়গায় পাহাড়ী ঝরণা বয়ে যাচ্ছে তর্ তর্ করে, তারই ওপর দিয়ে ছোট্ট

একটি সেতু পার হয়ে গাড়ি ক্রমেই আরও নেমে চললো এঁকে বেঁকে নিবিড় অন্ধকার বনের দিকে, যেন গভীর অরণ্যের একেবারে বুকের মাঝখানটিতে! কোন মায়াবীর যাদুমন্ত্র যেন আমাদের গাড়িটিকে সুদূর, দুর্গম নির্বাসনে নিয়ে চলেছে। এভাবে চলেছি তো চলেছি। কোথায় বা এই গভীর বনের শেষ, কোথায়ই বা ম্যাণ্ডারলে! নিবিড় অরণ্যের বুক চিঁড়ে অনন্ত এই সর্পিল পথের ইসারা আমাকে আরও অসুস্থ করে তুললো। প্রতিমুহূর্তে আমি ভাবছি এই বুঝি বনের শেষ হয়ে দেখতে পাব প্রাসাদোপম একখানি সুন্দর বাড়ি। কিন্তু কোথায়, লোকালয়ের কোনও চিহ্ন নেই চারিপাশে। কেবল স্তব্ধ বন আর বন। আকাশের দিগন্তে মিশে গেছে এই বনভূমির শ্যামলিমা। আর কিছু নেই।......পেছনে ফেলে আসা সেই ফটক, সেই বাড়ি ও রাজপথের কথা এখন শুধুই স্মৃতি হয়ে রইলো আমার মনে। এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগত বাইরের পৃথিবীর সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। সহসা লক্ষ্য করলাম বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। তাই গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীলাকাশের এক ফালি ওই যে দেখা যাচ্ছে। এক নিমিষে দৈত্যের মত বিরাটকায় গাছগুলো সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বন শেষ হয়ে এখন আমাদের পথের দু'ধারে দেখা দিল ঘন রক্তবর্ণের প্রাচীর। অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়েও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এ কোথায় আমরা এসে পড়েছি! এ যে অজস্র রডেডেনড্রনের প্রাচীর!

গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে এই আকস্মিকতার জন্য আমার মন এতটুকুও তৈরী ছিল না। এই গাছগুলোয় নেই কোন পাতা বা শাখার চিহ্ন। গাছের গোড়া থেকে চূড়ো পর্যন্ত কেবল রক্তমুখী ফুল আর ফুল, এমন শত শত গাছ দাঁড়িয়ে আছে পথের দু'ধারে প্রহরীর মত। আমার এতদিনকার জীবনে সত্যিই আমি এমন বিচিত্র রডোডেনড্রন আর দেখিনি। এরা যেন স্বপ্নের মতই অবাস্তব। আমি

ম্যাক্সিমের দিকে তাকালাম। সে কিন্তু হাসছিল তখন। 'কি? ভাল লাগছে এদের?' আমি উত্তরে 'হাঁ' বললাম। কিন্তু নিজেই বুঝলাম না সত্য কথা বললাম কিনা। অনেক বাড়ির সাজানো বাগানে লালচে বা গোলাপী রঙের যে রডোডেনড্রন ফুল আমি দেখেছি তাদের সাথে আজকের এই রক্তিম অতিকায় ফুলের এতটুকুও মিল নেই। এরা আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকের মত উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এরা সত্যিই ভয়ংকর সুন্দর! আমরা এবার বাড়ির খুব কাছে এসে গেছি। রডোডেনড্রন-প্রাচীরের পাশ কাটিয়ে গাড়ি আর একটি বাঁক ঘুরতেই একেবারে ম্যাণ্ডারলের সামনে এসে দাঁড়ালো। এ-ই ম্যাণ্ডারলে! আমার ছেলেবেলার সেই মন-ভুলানো ছবির ম্যাণ্ডারলে! এত অপূর্ব! এত সুন্দর! এযে আমার কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। এ কোন্ শিল্পীর জীবনভর সাধনার ধন! বুঝি এমন সৌন্দর্যভরা জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ম্যাণ্ডারলের প্রশস্ত প্রাঙ্গন আর সুন্দর বাগানের শ্যামলিমা অদূরে নীল সাগরের বুকে এক হয়ে মিশে গেছে। ম্যাণ্ডারলের শ্বেত পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ির কাছে এসে আমাদের গাড়ি থামলো। হলঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল অনেক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম ম্যাক্সিম বলছে আপন মনে, 'এ সব কি? আমি এসব পছন্দ করি না তা এরা বেশ জানে। তবুও—' তার স্বরে কেমন বিরক্তিভরা সুর বেজে উঠলো। 'এরা কারা?' ক্ষীণকণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলাম। 'মিসেস ডানভারস ম্যাণ্ডারলের সমস্ত কর্মচারিদের এনে জড়ো করেছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে বলে। যাক। এজন্য কিছু ভেবোনা। যা বলবার আমিই বলবো।' আমি গাড়ির দরজা খুলবার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু ভয়ে ভাবনায় আমার হাত তখন হিম-শীতল হয়ে গেছে। সে সময় ম্যাণ্ডারলের বাটলার একজন পরিচারক সঙ্গে

নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিল। তার বয়স হয়েছে। মুখের ভাবে কেমন একটা সরলতা মাখানো, তাকে দেখেই আমার ভাল লাগলো। তাই একটু হেসে তার দিকে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সেদিকে সে লক্ষ্য না করে আমার বর্ষাতি আর ছোট্ট ড্রেসিং কেসটি হাতে নিয়ে ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন জানালো।

'এই যে ফার্থ, আমরা এসে গেছি।' ম্যাক্সিম তাঁর হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে বললো। 'আমরা লণ্ডন থেকে রওনা হবার সময় বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে বোধহয় বৃষ্টি হয়নি ? তোমরা সকলে ভাল আছ তো ?'

'হাঁ স্যার ভাল আছি। না, এখানে একদিনও বৃষ্টি হয়নি তো। আপনারা দু'জনে ভাল আছেন তো ?' ফার্থ সসম্ভ্রমে বললো।

'হাঁ। আমরা বেশ ভালই আছি ফার্থ। এতটা পথ গাড়িতে এসে শুধু একটু ক্লান্তি বোধ করছি। এখনি চা চাই। কিন্তু এসব কি ব্যাপার বল তো ? এরকম আমি আশা করিনি।' হলঘরের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্সিম বললো।

'মিসেস ডানভারস এই ব্যবস্থা করেছেন'। ফার্থের মুখ ভাবলেশহীন।

'সে আমি অনুমানেই বুঝেছি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ম্যাক্সিম বললো, 'এসো।' আমরা দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। ফার্থ ও সেই পরিচারকটি জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। অজানা এক আশঙ্কা ও উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। আজও আমি চোখ বুজলে সেই দিনটির ছবি স্পষ্ট দেখতে পাই। দেখতে পাই সাধারণ পোশাক পরা ভীরু, লাজুক ও নগণ্য একটি মেয়ে সসংকোচে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাণ্ডারলের প্রশস্ত কারুকার্যময় প্রবেশপথে স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে। আজও স্পষ্ট অনুভব করতে পারি সেদিন কতখানি বিস্ময় নিয়ে আমি দেখেছিলাম

ম্যাণ্ডারলের বিরাট সেই শ্বেত পাথরের অপূর্ব সুন্দর হলঘর। হলঘরের বিরাট, বিশাল দরজাগুলো চলে গেছে লাইব্রেরির দিকে যেখানে দেওয়ালের গায়ে গায়ে তুলির রেখায় ফুটে উঠেছে নিপুণ কোন শিল্পীর মায়াময় কত স্বপ্ন!

হলঘরে সেদিন অসীম কৌতূহলে কারা প্রতীক্ষা করছিল আমাকেই দেখবে বলে। নিজেকে তখন ঠিক আসামীর মত মনে হোল। দু'হাত পেছনে রেখে আমি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পরনে ছিল সম্পূর্ণ কালো পোশাক। শরীরটি লম্বা ও ক্ষীণ। উঁচু কপোল। তার কাগজের মত শাদা মুখে বড় বড় ও গভীর দু'টি চোখ। চোখ দু'টি এত ভাবহীন ও শূন্যগর্ভ যে দেখেই আমার মনে হোল একটি কঙ্কাল যেন আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এবার সে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি পুতুলের মত তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম! অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তার চলার মধ্যে কেমন একটা সহজ আত্মমর্যাদার ভাব ফুটে উঠেছে। তার অমন চলন-ভঙ্গি দেখে আমার হিংসা হোল। সে কাছে এসে আমার হাত ধরলো। কিন্তু একি! সেই হাতখানিও মৃতের হাতের মতই শক্ত, ঠাণ্ডা এবং ভারি। প্রাণহীন একটা কিছু যেন আমার হাতের মুঠোয় পড়ে আছে।

'ইনিই মিসেস ডানভারস।' ম্যাক্সিম পরিচয় করিয়ে দিল। সেই অবশ হাতখানি আমার হাতের মধ্যে রেখেই সে এবার কথা বলতে আরম্ভ করলো। তার গভীর দু'টি চোখ অপলক আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে আমি আর তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। তার নিষ্প্রাণ সেই হাতখানি এবার আমার হাতের মুঠোয় একটু নড়ে উঠলো। কেমন এক অজানা অসোয়াস্তি আর অশান্তিতে সমস্ত মন আমার তখনি গেল ছেয়ে। সেদিন সে কি বলেছিল আজ তার কিছুই

আমার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে তার হাতের মতই ঠাণ্ডা ও নির্জীব স্বরে নিছক যন্ত্রের মত সে তার নিজের এবং ম্যাণ্ডারলের কর্মচারিদের পক্ষ থেকে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কি জানি সব বলেছিল। তার কথা শেষ করে সে আমার উত্তর শুনবার জন্যই আমার দিকে তাকিয়েছিল। লজ্জা ও ভয়ে আমার সমস্ত রক্ত যেন আমার মুখে উঠে এলো। থতমত খেয়ে আমি শুধু তাকে ধন্যবাদ জানালাম। হঠাৎ দস্তানা জোড়া আমার হাত থেকে মেঝেয় পড়ে গেল। সে তখনি নিচু হয়ে সেই দস্তানা আমার হাতে উঠিয়ে দিল। আমি দেখলাম তার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির একটুখানি রেখার আভাস। হয়তো সে হাসি ভৎসনার হাসি। আমার সম্বন্ধে না জানি কত হীন ধারণা তার হোল। আদব-কায়দা, রীতি-নীতি আমি যে কিছুই জানি না সেটা তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেল। তার মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে কি রকম একটা বিদ্বেষ ভাব ফুটে উঠেছিল আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমার মন সেই মুহূর্তেই নিরানন্দের কালো ছায়ায় ম্লান হয়ে গেল। তার কথা বলা শেষ হলে সে অন্যদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমার মনে হোল অন্য সকলের থেকে সে অনেক স্বতন্ত্র। সকলের মাঝখানে থেকেও সে যেন কত আলাদা। তারপর সে আর একটি কথাও বলে নি। কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম তার শূন্যগর্ভ গভীর চোখ দু'টি আমারই মুখের ওপর স্থির হয়ে ছিল। ম্যাক্সিম এবার আমার পাশে এসে আমার হাত ধরলো খুব সহজ ভাবে। তাদের সকলের উদ্দেশ্যে দু'একটি কি কথা বলে সে আমার অবশ দেহটিকে এক রকম টেনেই লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে এলো। আমাদের পেছনে লাইব্রেরি ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এবার আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো সুন্দর দু'টি স্প্যানিয়াল। রেশমের মত নরম তুলতুলে কানগুলি নেড়ে তারা আনন্দে

ম্যাক্সিমের কাছে গিয়ে তার হাতের মধ্যে তাদের নাক ঘষতে লাগলো। তারপর তারা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমার পায়ের কাছে এসে দ্বিধাভরে প্রথম গন্ধ শুঁকতে লাগলো। তাদের মধ্যে যেটি মা, তার একটি চোখ অন্ধ। সে কয়েক মুহূর্ত পর নির্বিকার ভাবে চুল্লির ধারে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ছোট স্প্যানিয়ালটি, ম্যাক্সিম যাকে জেসপার বলে আদর জানিয়েছে সে আমার খুব কাছে এসে আমার হাতে তার নাকটি ঢুকিয়ে দিয়ে আদর জানাতে তার একটি থাবা আমার হাঁটুর ওপর তুলে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগলো। তার নীরব চোখের দৃষ্টিতে কি এক গভীর ভাষা ফুটে উঠলো। আমি তার নরম কানে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। মাথার টুপি, গলার মাফলার খুলে ফেলে এবার একটু আরাম বোধ করছি। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখি ভারি সুন্দর চোখজুড়ানো ঘরখানি। চারি ধারে দেওয়াল জোড়া দামী আলমারিতে অসংখ্য বই সাজানো রয়েছে। এক কোণে চুল্লি জ্বলছে। তার চারপাশ ঘিরে কত সোফা, চেয়ার, ও আরাম কেদারা। আর এক পাশে কুকুর দু'টির জন্য বাস্কেট রয়েছে। ঘরখানির প্রশস্ত জানালাগুলো সুন্দর, সবুজ আঙিনার দিকে খোলা। সেই আঙিনার সবুজ শোভা যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে দেখা যাচ্ছে নীল সাগরের একটুখানি ঝিকিমিকি। ঘরখানি সব মিলে এতই সুন্দর যে এখান থেকে বের হতে আর মন চায় না।

কেমন একটা পুরানো স্নিগ্ধ গন্ধ ঘরখানিকে ঘিরে রেখেছে। সেই গন্ধ যেন এই ঘরের একান্তই আপনার। সাগরের জলো হাওয়া বাগান থেকে ফুলের সৌরভ বুকে নিয়ে অবিরাম ঢুকছে এই ঘরে। কিন্তু পুরানো সেই কেমন ধারা মন মাতানো স্নিগ্ধ গন্ধ ঠিক তেমনি আছে। নিভৃত, শান্ত এই পরিবেশ কোন প্রাচীন গির্জার সৌম্য পরিবেশের কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়। এ যেন সত্যি একমনে ভাববার, ধ্যান করবার

উপযুক্ত জায়গা। এমন সময় ফার্থ সেই ভৃত্যটিকে সঙ্গে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ওপর তারা সসম্ভ্রমে, পরম সমাদরে চা ও খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেল। ম্যাক্সিম তখন এতদিনকার জমানো চিঠিপত্রের স্তূপে ডুবে ছিল। আমি সেই অবসরে খাবারগুলো একটু নাড়াচাড়া করে শুধু চা খেতে লাগলাম। ম্যাক্সিম মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসছে। তারপর আবার চিঠির মধ্যে মনোযোগ দিচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হোল, তার ম্যাণ্ডারলের জীবন যাত্রার কথা কতটুকুই বা আমি জানি। ম্যাণ্ডারলেতে তাঁর পরিজন, পরিচিত এবং অজস্র কাজের মধ্য দিয়ে তার যে জীবন ধারা বয়ে চলেছে দিনের পর দিন তার সাথে তো আমার কোন পরিচয়ই নেই। আমাদের বিয়ের পর সাতটি সপ্তাহ যেন হাওয়ার মত কোথা দিয়ে কেটে গেছে। গাড়িতে তারই পাশে বসে ফ্রান্স, ইতালীর স্বপ্নময় দেশে বেড়াতে বেড়াতে যে কথা আমি ভেবেছি, তার সাথে তার অতীত বা ভবিষ্যত জীবনের তো কোন সম্পর্ক ছিল না। তখন শুধু ভেবেছি তার প্রতি আমার ভালবাসার কথা, আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে যে ভালবাসা। ম্যাক্সিমের দৃষ্টি দিয়েই আমি ভেনিসের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, নীরবে তার কথা শুনেছি। তার অতীতের কোন কথা কোনদিন তুলিনি, ভবিষ্যতের কোন রঙীন স্বপ্নের জালও বুনিনি। তাকে আমার পাশে পেয়েছি, আমার জীবনে একান্ত করে পেয়েছি, বর্তমানের সেই চরম পাওয়ার পরম আনন্দেই আমি তখন মগ্ন ছিলাম। বিয়ের পর যে ম্যাক্সিমকে আমি কাছে পেয়েছি, তার সাথে মন্টিকার্লো হোটেলে দেখা নির্বিকার, উদাসীন ও আত্ম সমাহিত সেই ম্যাক্সিম ডি উইণ্টারের সত্যিই কোন মিল ছিল না। আমার ম্যাক্সিম প্রাণ প্রাচুর্যে উচ্ছল হয়ে হাসে, গান গায়, আনন্দে বাঁধন হারা হয়ে ছেলে মানুষের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে, কত আদরে আমার হাত জড়িয়ে ধরে। তার প্রশস্ত, সুন্দর ও নিটোল কপালের কোথাও এতটুকু চিন্তার

রেখা তখন একদিনের জন্যও দেখিনি। মধুযামিনীর কয়টি সপ্তাহ আমি তাকে একান্ত কাছে পেয়েছি আমার প্রিয়, আমার বন্ধুরূপে, ভালবাসার অজস্র প্রাচুর্যের মাঝে। তাই আমি নিঃশেষে ভুলে গিয়েছিলাম যে ম্যাণ্ডারলেতে ম্যাক্সিমের নিজস্ব একটা জীবন ধারা রয়েছে যার সঙ্গে আমার নেই এতটুকুও পরিচয়। ম্যাক্সিম শুধু আমার একার নয়, সে ম্যাণ্ডারলের ম্যাক্সিম ডি উইণ্টার। সেখানকার জীবন তাকে সে যেখানেই থাক, বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। মাত্র কয়েকটি সপ্তাহের সেই মধুর অভিজ্ঞতা, অনাবিল মিলনের বিচিত্র সেই অনুভব ম্যাণ্ডারলের চিরাচরিত জীবন প্রবাহে আজ হয়তো শুধুই থাকবে স্মৃতি হয়ে। পাখির পালকের মত হালকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া সে সব দিন যেন আমার জীবনের বিস্মৃত অতীতের এক জীবন-স্বপ্ন।

ম্যাক্সিম তখনও চিঠি পড়ছিল। আমি তার মুখের পানে তাকিয়ে ছিলাম। কখনও তার চোখে মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠছে। আবার কখনও বা একটুখানি হাসির রেখা। কোন চিঠি বেশ মন দিয়ে পড়ছে, আবার কোন চিঠিতে সামান্য একটু চোখ বুলিয়েই সেটা একপাশে সরিয়ে রেখে দিচ্ছে। তাই দেখে দেখে হঠাৎ আমার মনে হোল নিউইয়র্ক থেকে আমি যদি তাকে চিঠি লিখতাম, এমনি অবজ্ঞাভরে সেই চিঠি কি সে সরিয়ে রাখতো! এই ভাবনা এক নিমেষে আমার মনকে বিকল করে দিল। বিচিত্র ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আজ আমার জীবনে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা যদি না-ই হোত! তাহলে আজ আমি নিউইয়র্কে বসে এমন সময় হয়তো মিসেস ভ্যানহপারের সাথে ব্রিজ খেলতাম। আর দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে তার একখানি চিঠির জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষা করতাম। কিন্তু ম্যাক্সিম এখানে বসে এমনি করে আমার চিঠিতে একটিবার চোখ বুলাতো কি না বুলাতো। না, এসব আমি কি ভাবছি! যা হয়নি কিন্তু হতে পারতো তারই দুশ্চিন্তায় মন আর কালো করবো না। এবার

চেয়ারে আরাম করে বসে ঘরের চারিদিকে আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম সত্যিই আমি ম্যাণ্ডারলে এসেছি।

আমার ছেলে বেলাকার কত সাধের সেই ছবির ম্যাণ্ডারলে এখন সত্যি বাস্তব। কিন্তু মনের মাঝে এই অনুভবকে কেন নিবিড় করে পাচ্ছি না? এই যে চেয়ারে বসে আছি আমি, কত বইয়ের সারি চারিদিকে, দেওয়ালের গায়ে কত সুন্দর সব চিত্র, ওই ফুল বাগান, ম্যাণ্ডারলের নিবিড় ঘন বন, সবই এখন আমার!

ম্যাক্সিমের মত এসবে আমারও তো অধিকার। আমরা দু'জনে এখানেই বুড়ো হবো। সেদিনও আজকের মতই এভাবে এই ঘরের শান্ত পরিবেশে এই সোফায় আমরা বসে থাকবো। চুল্লির ধারে আজকের মতই কুকুররা থাকবে শুয়ে। ঘরের পুরানো এই স্নিগ্ধ গন্ধ সেদিনও থাকবে ঠিক এমনি। ছোট্ট সুন্দর ছেলেমেয়ের দল তাদের রাজ্যের যত খেলনা, পুতুল নিয়ে আনন্দ কলরবে ঘর খানিকে মুখর করে তুলবে। আমাদের ছেলে মেয়ে! আমি তাদের বলবো, 'যাও তো লক্ষ্মী সোনারা, তোমাদের পড়ার ঘরে গিয়ে খেলা করগে।' অমনি তারা ছুটে পালিয়ে যাবে। সবচেয়ে ছোট্ট শিশুটি হয়তো এখানেই আমার কাছটিতে বসে আপন মনে খেলা করতে থাকবে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে আমার মধুর কল্পনার আবেশ গেল ভেঙ্গে। তাকিয়ে দেখি ফার্থ সেই ভৃত্যটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকছে চায়ের সব সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে। আমার দিকে তাকিয়ে ফার্থ সসম্ভ্রমে বললো, 'মিসেস ডানভারস জানতে চেয়েছেন আপনি কি এখন আপনার ঘর দেখবেন?'

ম্যাক্সিম এবার তার চিঠির মধ্য থেকে দৃষ্টি তুলে বললো, 'পূব মহল সাজানো শেষ হয়েছে? কেমন সাজানো হয়েছে ফার্থ?'

'খুব সুন্দর হয়েছে স্যার।'

আমি ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কোন পরিবর্তন করা হয়েছে নাকি ?'

'না, তেমন কিছু নয়। পূব মহলের ঘরগুলোকে আর একবার নূতন করে সাজানো হোল। আমরা ওদিকটাতেই থাকবো ঠিক করেছি। সত্যি, ও মহলটা ভারি সুন্দর। সামনেই গোলাপ বাগান। আমার মা বেঁচে থাকতে ওটাই ছিল ম্যাণ্ডারলের অতিথিদের থাকবার মহল। যাও, মিসেস ডানভারসের সাথে আলাপ করে এসো। আমি এই চিঠিগুলো শেষ করেই তোমার কাছে আসবো।'

ইচ্ছা না থাকলেও উঠে হলঘরের দিকে যেতে লাগলাম। কিন্তু আবার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। মিসেস ডানভারসের সামনে একা যেতে আমার মন চাইছিল না। বিরাট হলঘর এখন শূন্য, নিস্তব্ধ। আমার চলার সামান্য শব্দও যেন আমার কানে বড় বাজতে লাগলো।

'ঘরটি কত বড়।' একরকম জোর করেই যেন আমি কথাটা বলে ফেললাম। স্কুলের কোন ছোট্ট মেয়ের অবোধ কথার মতই শোনালো আমার কথাটা। কিন্তু ফার্থ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'হাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। ম্যাণ্ডারলে সত্যি খুব বড় জায়গা। এই ঘরটি আগে খাবার ঘর ছিল। এখনও মাঝে মাঝে সে রকম বিশেষ কোন আয়োজনের জন্য এ ঘরেই ব্যবস্থা করা হয়। আপনি বোধহয় জানেন সপ্তাহে একবার বাইরের লোককে এখানে আসতে দেওয়া হয় ম্যাণ্ডারলে দেখবার জন্য।'

'হাঁ, জানি।' আমি খুব সন্তর্পনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উত্তর দিলাম। সহসা আমার মনে হোল আমিও যেন বাইরের লোকদেরই একজন। ম্যাণ্ডারলে দেখতে এসেছি। এদিক ওদিক বিস্ময় ভরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে তাকাতে ম্যাণ্ডারলের কোন দর্শকের মতই ব্যবহার করছি। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে দেখলাম ওপরে কালো

পোশাক পরা সেই মূর্তি নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে রক্তের চিহ্ন নেই, জীবনের এতটুকুও স্পন্দন নেই। কিন্তু শাদা পাথরের মত ভাবলেশহীন সেই মুখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছিল। আমি ফার্থের জন্য পেছনদিকে তাকালাম। কিন্তু ফার্থ ততক্ষণে হলঘরের মধ্য দিয়ে ওদিককার বারান্দায় চলে গেছে। এখন মিসেস ডানভারসের সামনে আমি একা। তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। তার হাত দু'টো সামনের দিকে জড়ো করা। তার চোখের অদ্ভুত সেই নিমেষ হারা দৃষ্টি আমার মুখের ওপর তেমনি স্তব্ধ হয়ে আছে। আমি জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললাম। কিন্তু ওদিক থেকে সেই হাসির কোন প্রত্যুত্তর পেলাম না।

'আমার জন্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি তো?' আমি এবার তাকে প্রশ্ন করলাম।

'আপনার যখন সময় হবে তখনই আসবেন। আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ মাত্র।' একথা বলে সে চিত্রশালার পাশ দিয়ে ওদিককার বারান্দার দিকে এগিয়ে চললো। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। আমরা সুন্দর কার্পেট বিছানো প্রশস্ত সেই পথ দিয়ে চলতে চলতে বাঁ দিকে ঘুরে একটি বড় দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকে কয়েকটি সিঁড়ি নিচে নেমে আবার কয়েকটি সিঁড়ি ওপরে উঠে আরেকটি দরজা দিয়ে ঢুকলাম। সেই দরজাটি খুলে দিয়ে আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলে সে একপাশে সরে দাঁড়ালো। আমি যে ঘরে ঢুকলাম সেটা বসবার ছোট্ট একটি ঘর; সোফা, চেয়ার, লিখবার ডেস্ক দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো। তা'রপরের ঘরখানি শোবার ঘর। সেই ঘরের দরজা, জানালা খুব বড় বড়। তার পাশেই বাথরুম। আমি জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরের দিকে তাকাতেই দেখি জানালার ঠিক নিচেই গোলাপ-বাগান।

'এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না?' তার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলাম।

'না। এ মহল থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। এমন কি তার কল্লোলও শোনা যায় না। এখান থেকে বোঝা যায় না যে ম্যাণ্ডারলের এত কাছেই রয়েছে সমুদ্র।' কথাগুলি সে এমনভাবে বললো যেন তার পেছনে কোন অর্থ লুকানো রয়েছে।

'আমি কিন্তু সমুদ্র বড় ভালবাসি।' সে আমার এ কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো।

'আচ্ছা, আমরা থাকবো বলেই বুঝি এদিকটা নূতন করে সাজানো হয়েছে?'

'হাঁ।'

'আগে কি রকম ছিল?'

'সম্পূর্ণ অন্যরকম। মিঃ ডি উইণ্টার আগে এ মহলটা তেমন পছন্দ করতেন না। এদিকটা বেশি ব্যবহারও করা হোত না। মাঝে মাঝে অতিথি কেউ আসলে খুলে দেওয়া হোত। কিন্তু এবার মিঃ ডি উইণ্টার তাঁর চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার থাকবার ব্যবস্থা এ মহলেই করতে হবে।'

'তাহলে এটা তাঁর শোবার ঘর নয়?'

'না। এদিকটা তিনি কোনদিনই ব্যবহার করেন নি।'

'ও। কিন্তু একথা আমাকে তো তিনি বলেন নি।' আমি ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলাম। আমার জিনিসপত্র সব এরই মধ্যে খুলে গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

'এলিস আপনার জিনিসপত্র খুলে গুছিয়ে রেখেছে। আপনার নিজের পরিচারিকা না আসা পর্যন্ত এলিসই আপনার সব কাজ করবে।'

আমি এবার তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তারপর ব্রাশ নামিয়ে

রেখে বললাম, 'আমার তো কোন পরিচারিকা নেই। এলিসই আমার কাজ করবে।' প্রথম পরিচয়ের সময় যখন আমার হাত থেকে দস্তানা মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল ঠিক তখনকার মত অদ্ভুত একটা অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টি এবারও তার চোখে ফুটে উঠলো।

'সে ব্যবস্থা তো বেশিদিন চলতে পারেনা। আপনিও নিশ্চয় জানেন যে আপনার মত পদ মর্যাদায় নিজের একজন পরিচারিকা না থাকলে কত অশোভন হবে।'

আমার মুখ এবার লজ্জা ও অপমানে লাল হয়ে উঠলো। তার কথার মধ্যে কেমন একটা বিদ্রূপের জ্বালা ছিল। তার চোখের দিকে না তাকিয়ে আমি বললাম, 'যদি দরকার মনে করেন আপনিই সে ব্যবস্থা করবেন। কোন মেয়েকে একটু শিখিয়ে নিলেই তো চলবে মনে হয়।'

'আপনি বললেই তা হবে।'

তারপর দু'জনেই চুপ করে রইলাম। আমি ভাবছিলাম কেন সে চলে যাচ্ছে না। সেখানে এভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপলক আমার দিকে তাকিয়ে থাকার কি অর্থ হতে পারে।

'আপনি অনেক দিন হোল এখানে আছেন? বোধহয় সব চেয়ে পুরানো লোক?' নীরবতা ভেঙ্গে আমিই কথা বললাম।

'না। ফার্থ সবচেয়ে পুরানো। মিঃ ডি উইণ্টার যখন খুব ছোট ছিলেন তখন তাঁর বাবার আমলে ফার্থ এখানে এসেছিল।' তার গলার স্বর অদ্ভুত রকমের নিষ্প্রাণ। আমার হাতের মুঠোয় তার নির্জীব হাতের সেই হিম শীতল স্পর্শের অনুভূতির তিক্ত স্মৃতি হঠাৎ আমার মনে পড়লো।

'ও। তাহলে ফার্থের পরেই বুঝি আপনি এসেছেন?'

'না। ঠিক তার পরেই আমি আসিনি।'

নিজের অজানিতেই তার চোখের দিকে এবার আমার চোখ পড়লো। সেই নিষ্প্রভ অতল স্পর্শী দৃষ্টি ঠিক তেমনি আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। অজানা এক অশান্তির ছায়ায় আমার বুক আবার কেঁপে উঠলো। তার সেই নিমেষ হারা শ্যেন দৃষ্টি যেন কী এক আক্রোশে আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। এবার সে বলে উঠলো, 'মিসেস ডি উইণ্টার যখন নূতন বিয়ে হয়ে ম্যাণ্ডারলে এসেছিলেন তখন তাঁর সাথেই আমি এখানে এসেছিলাম।'

তার এতক্ষণকার নির্জীব, নিষ্প্রাণ স্বর আচমকা কেমন প্রফুল্ল শোনালো। এবারকার এই কথার মাঝে যেন প্রাণের ছোঁয়াচ লেগেছে। তার শাদা গালে একটু রক্তিমাভাও বুঝি ফুটে উঠলো। এই পরিবর্তন এত আকস্মিক যে আমি মনে মনে চমকে উঠলাম। কি করবো, কি বলবো ভেবে পেলাম না। মনে হোল যে কথা খুব সংগোপনে সে আপন মনের গভীরে সযতনে লুকিয়ে রেখেছিল তাকেই হঠাৎ সে বলে ফেলেছে। তার দৃষ্টি কিন্তু তখনও আমার মুখের ওপর থেকে সরে যায়নি। সেই দৃষ্টিতে এবার দেখলাম কেমন একটু করুণা মেশানো ভর্ৎসনার আভাস। অবাঞ্ছিত এই দৃষ্টির সামনে নিজেকে সত্যি বড় অসহায়, বড় দুর্বল, জীবন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ মনে হোল। বুঝতে পারলাম সে আমাকে ঘৃণার চোখে দেখছে। প্রতিটি কথায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি ম্যাণ্ডারলের এই পদ মর্যাদার উপযুক্ত নই।

আমি অতি সাধারণ, ভীরু ও লাজুক গেঁয়ো একটি মেয়ে মাত্র। আমার আরও মনে হোল তার ওই অবহেলার দৃষ্টির মধ্যে হয়তো বা ঈর্ষারও একটু ইঙ্গিত ছিল। এভাবে চুপ করে তার সেই দৃষ্টি আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। যা হোক কিছু বলা দরকার। তাই একরকম জোর করেই বলে ফেললাম, 'মিসেস ডানভারস, আমি আশা করি আমরা দু'জনে পরস্পরকে বন্ধুভাবে বুঝবার চেষ্টা করবো। আপনি

নিশ্চয়ই জানেন আমি এতদিন একেবারে অন্য ধরণের জীবন যাপন করেছি। এখানকার জীবন আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা। আমি এখানকার উপযুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। গৃহস্থালীর সব দায়িত্ব আমি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। মিঃ ডি উইণ্টার 'ও তাই বলেন।' এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে ফেলে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। তার দিকে চোখ পড়তেই দেখি সে এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'আশাকরি আপনার পছন্দ মত কাজ করতে পারবো। এক বছরের ওপর হতে চললো এই বাড়ির সমস্ত ভার আমার ওপর। মিঃ ডি উইণ্টারও এ বিষয়ে কোনদিন কোন অভিযোগ করেন নি। অবশ্য মিসেস ডি উইণ্টার বেঁচে থাকতে এখানকার সব ব্যবস্থাই অন্যরকম ছিল। তখন প্রায় প্রতিদিনই কত আনন্দ-উৎসব লেগে থাকতো। তাঁর নির্দেশমত আমি শুধু কাজ করে যেতাম। তিনি নিজেই সব দেখা শুনো করতে ভালবাসতেন।'

'আমি আপনার ওপরেই সব ছেড়ে দিচ্ছি।' এ বিষয়ে তাকে আরও কিছু বলবার সুযোগ না দেবার জন্যই আমি তাড়াতাড়ি একথা বলে উঠলাম। তার চোখে তখনি ফিরে এলো আগেকার সেই অবজ্ঞা মেশানো নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

'আমি আপনার জন্য এখন আর কি করতে পারি?' সে এবার নির্বিকারভাবে বললো। আমি ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'না। কোন দরকার নেই আমার। সত্যি, আপনি ভারি সুন্দর করে ঘরখানিকে সাজিয়ে রেখেছেন।'

'মিঃ ডি উইণ্টারের নির্দেশ মতই আমি এসব করেছি।' দরজার হাতল ধরে তখনও সে দাঁড়িয়েছিল। মনে হোল আরও কি যেন সে বলতে চায়, তাই চলে যাচ্ছে না। আমি প্রতিমুহূর্তে কামনা করছিলাম

সে চলে যাক। একটা দুঃস্বপ্নের ছায়ার মত আমার চোখের ওপর, আমার মনের ওপর কেন সে দাঁড়িয়ে আছে! ভয়ংকর একটা কঙ্কালের গহ্বর থেকে যেন গভীর, নিষ্কম্প দৃষ্টি অনবরত আমাকে বিঁধছে।

'যদি কোন অসুবিধা বোধ করেন আমাকে তখনি খবর দেবেন।'

'হাঁ। দেব।'

আবার আমরা চুপ করে রইলাম। অসহ্য নীরবতার আরও কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ সে আবার বলে উঠলো, 'যদি মিঃ ডি উইণ্টার তাঁর পোশাক রাখার আলমারির কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে তাঁকে বলবেন সেটা এখানে আনা সম্ভব হোল না। এই ঘরের ছোট দরজা দিয়ে সেটাকে অনেক চেষ্টা করেও ঢোকানো গেল না। কারণ পশ্চিম মহলের ঘরগুলোর চাইতে এ মহলের ঘরগুলো অনেক ছোট। যদি এদিকে থাকতে তাঁর ভাল না লাগে তাহলেও যেন আমাকে তিনি খবর দেন।'

'আপনি এত চিন্তিত হবেন না মিসেস ডানভার্স। আমি জানি তিনি এই ব্যবস্থাতেই খুশি হবেন। আপনাকে এজন্য এত কষ্ট করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এসবের কোন দরকার ছিল না। আমি তো পশ্চিম মহলেই বেশ থাকতে পারতাম। আমার তাতে কোন অসুবিধাই হোত না।' এবার তার দৃষ্টিতে যেন একটু কৌতুহল ফুটে উঠলো।

'মিঃ ডি উইণ্টার বলেছেন আপনি এই মহলে থাকতে চান। পশ্চিম মহলের ঘরগুলো অবশ্য অনেক পুরানো। কিন্তু শোবার ঘরটি এই ঘরের চেয়ে অনেক বড়। সৌন্দর্যে এবং কারুকার্যেও ঐ ঘরটিই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। দামী আসবাব পত্র দিয়ে খুব চমৎকার ভাবে সাজানো। সেই ঘরের জানালা দিয়ে ম্যাণ্ডারলের সবুজ আঙিনা পার হয়ে সব সময় সমুদ্র দেখা যায়।'

আমি আবার বড় অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। কেন সে বারবার এমনি করে এমন সব কথা বলছে যাতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমাকে যে মহলে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেদিকটা আমারই মত অতি সাধারণ ও নগণ্য। 'আমার মনে হয় মিঃ ডি উইণ্টার বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানিকে সাধারণের দেখবার জন্য অব্যবহৃত রাখতে চান।' আমি বললাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার দিকে তেমনি তাকিয়ে এবার আরও নিস্পৃহ স্বরে সে বললো, 'শোবারঘর কখনও বাইরের লোককে দেখানো হয় না। হলঘর, চিত্রশালা, নিচের অন্য ঘরগুলোই কেবল সাধারণকে দেখতে দেওয়া হয়।' তারপর আরও কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললো, 'মিসেস ডি উইণ্টার বেঁচে থাকতে তাঁরা সেই মহল ব্যবহার করতেন। ওই সুন্দর ঘরখানিই ছিল মিসেস ডি উইণ্টারের শোবার ঘর।' এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ হতেই ডানভারস তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়ালো।

ম্যাক্সিম ঘর ঢুকলো। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, 'কেমন হয়েছে? সব ঠিক আছে তো? তোমার পছন্দ হয়েছে?' স্কুলের ছোট্ট ছেলের মত আনন্দে তার চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘরের চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে সে আবার বললো, 'আমি জানি এই ঘরখানি ভারি সুন্দর। বাঃ! সাজানোও হয়েছে চমৎকার! ডানভারস, এজন্য অবশ্য প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।'

'ধন্যবাদ স্যার।' ভাবলেশহীন সেই মুখ থেকে এবার শুধু এই কথাটি বের হলো। তারপর খুব আস্তে দরজা ঠেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ম্যাক্সিম এবার প্রায় ছুটে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'আমি গোলাপ-বাগান বড় ভালবাসি। মনে পড়ে খুব ছেলেবেলায় মায়ের সাথে আমি এই বাগানে কত বেড়িয়েছি। এই ঘরের শান্ত পরিবেশে যেন একটা শান্তির স্পর্শ পাই। কেউ বুঝতে

পারবে না এখান থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে সমুদ্র রয়েছে।' একটু চুপ করে থাকার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো আমার দিকে চেয়ে, 'মিসেস ডানভারসকে তোমার কেমন লাগলো ?' আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার আমার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললাম, 'একটু গম্ভীর ও দাম্ভিক প্রকৃতির মনে হোল।' তারপর দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, 'হয়তো সে ভেবেছিল আমি তার কাজে বাধা দেব।'

'তাহলেও সে কিছু মনে করতো না।' হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আয়নার ওপর আমার প্রতিবিম্বের দিকে ম্যাক্সিম তাকিয়ে আছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে ফিরে গিয়ে আবার জানালার ধারে দাঁড়ালো। আপন মনে ভারি মিষ্টি সুরে সে তখন শিষ দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর বললো, 'যাক, তার কথা আর ভেবোনা। তার চরিত্র সত্যি একটু অদ্ভুত। এজন্য কোনদিন একটুও অসুবিধার সৃষ্টি হলে আমি তাকে বিদায় করে দেব। কিন্তু ঘরকন্নার কাজে সে সত্যি খুব পটু। একাই সব কাজ নিপুণভাবে করতে পারে। তবে অন্য পরিচারকদের ওপর খুশিমত কর্তৃত্বও করতে ছাড়েনা। অবশ্য আমার কথার ওপর সে কোনদিন কথা বলতে সাহস পায়নি।'

'প্রথম কয়েকদিন আমার ওপর তার একটু অসন্তোষভাব থাকাটা খুব স্বাভাবিক।'

'কেন ? এসব কি বলছো তুমি !' ম্যাক্সিমের স্বরে এবার বিস্ময় ঝরে পড়লো। জানালা থেকে তখনি সে আমার দিকে সরে এলো। সেই মুহূর্তে তার চোখে মুখে একটা রাগের ভাবও প্রকাশ পেল। আমার এই কথায় কেন সে রাগ করছে বুঝতে না পেরেও কথাটা ফেরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'একজন পুরুষ মানুষকে দেখাশুনো করা অনেক সহজ। তাই হয়তো আমি আসায় সে খুশি হতে পারেনি। তাছাড়া হয়তো সে ভেবেছে আমি খুব দাম্ভিকও হবো।'

'দাম্ভিক! ওঃ কি সব আবোল তাবোল ভাবছো তুমি বল তো'
বলতে বলতে সে আমার একান্ত কাছে এসে আমার কপালের ওপর খুব আস্তে তার ঠোঁটের মৃদু পরশ বুলিয়ে দিল। তার মুখ আবার প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। 'থাকগে, এখন তার কথা ভুলে যাও। এসো, আমি তোমাকে ম্যাণ্ডারলে দেখাবো।'

সেই সন্ধ্যায় ডানভারসকে আর দেখিনি। তার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে আমি বেশ আরাম পেলাম। ম্যাক্সিমের হাত ধরে নিচের মহল দেখছিলাম আর ভাবতে চেষ্টা করছিলাম আমার সেইসব রঙীন স্বপ্নের কথা, ম্যাণ্ডারলেতে আমাদের অনাগত জীবনধারার মধুর সম্ভাবনার কথা।

ম্যাক্সিমের পাশে পাশে ম্যাণ্ডারলের প্রথম সন্ধ্যা আমার ভালই কাটলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে কোথা দিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল বুঝতেও পারলাম না। হঠাৎ ম্যাক্সিম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো যে এখনি আমাদের ডিনারে বসতে হবে। পোশাক বদলাবার সময়ও আর নেই। পোশাক বদলাতে হোল না বলে আমি বেশ খুশিও হলাম। রেঁস্তোরায় বসে দু'জনে যেমন খেয়েছি ঠিক তেমনি সহজভাবে আমরা সেদিন খেতে বসলাম। আমার মধ্যে তখন এতটুকুও জড়তা ছিলনা। খাবার পর আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে বসলাম। ঘরের পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে। চুল্লিতে আরও কাঠ দেওয়া হোল। আগুনের গরম আমেজে খুব আরাম পেলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়লো খাবার পর এভাবে এক জায়গায় বসে থাকা আমাদের এই প্রথম। ইতালীতে আমরা খেয়েই বের হতাম পথে পথে, বনে উপবনে। কোথাও একদণ্ড স্থির হয়ে বসতামনা। আজ ম্যাক্সিম চুল্লির বাঁ ধারের চেয়ারটিতে আরাম করে বসেছে। সামনের টেবিল থেকে একখানা পত্রিকা হাতে তুলে নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। তার দিকে চেয়ে আমার মনে হোল, এই বুঝি তার প্রতিদিনকার

নিয়ম। আপন বাড়ির এই অভ্যস্ত আরামের মধ্যে, নিয়মের মধ্যে এসে সত্যি সে কত সুখী হয়েছে। আর আমি! গালে হাত দিয়ে আমার একপাশে জেসপারের নরম তুলতুলে কানের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে ভাবছিলাম এই চেয়ারে আমিই তো প্রথম বসছি না। আমার আগে যে এখানে বসতো, তার বসবার চিহ্ন হয়তো এই চেয়ারের গায়ে এখনও কত সুস্পষ্ট! এই যে আমি জেসপারের কানে হাত বুলাচ্ছি সেও বুঝি তাই করতো। হঠাৎ আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠে মনে হোল কে যেন আমার পেছনে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে তারই চেয়ারে বসে আছি! জেসপার আমার পায়ের কাছে এসে শুয়েছে, কারণ এটাই তার এতদিনকার নিয়ম। সে জানে রেবেকা তাকে ঠিক এমনি করেই আদর করতো, আজ আমি এই মুহূর্তে যেমনটি করছি।

॥ ৮ ॥

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ম্যাণ্ডারলের জীবনধারা এমন বাঁধাধরা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলবে। পেছনে ফেলে আসা সেই জীবনের দিকে ফিরে তাকালে আজও মনে পড়ে ম্যাণ্ডারলের প্রথম প্রভাতের অভিজ্ঞতার কথা।

ম্যাক্সিম খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠেই অনেকগুলো কি কাগজ পত্র নিয়ে বসলো। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। অদূরে কোন পেটা ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে বেলা ন'টায় আমার সেই ঘুম গেল ভেঙ্গে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খুব অপ্রস্তুত ও ব্যস্ত হয়ে নিচে খাবার ঘরে এসে দেখি ম্যাক্সিম ততক্ষণে তার সকাল বেলাকার খাবার প্রায় শেষ করে এনেছে। আমি ঢুকতেই সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো, 'কিছু মনে

কোরনা। আমার অনেক কাজ আছে বলে এত সকালে উঠেছি। ম্যাণ্ডারলের দেখাশুনোর কাজ এত বেশি জমে গেছে যে সারাদিন কাজ করলেও কাজ ফুরোবে না। ওই যে খাবার আলমারির তাকে তোমার জন্য কফি, চা, খাবার গরম গরম সব সাজানো রয়েছে। তোমার যা খুশি নিয়ে খাও। সকাল বেলার খাবার তোমাকে নিজে নিয়েই খেতে হবে। এখানকার এই রীতি।'

আমার উঠতে এত বেলা হয়েছে বলে বড় লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। ম্যাক্সিম কিন্তু আমার সে অবস্থা লক্ষ্যও করলো না। সে তখন একমনে একটি চিঠি পড়ছিল। তার চোখে মুখে বিরক্তির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠে আবার তখনি তা মিলিয়ে গেল। আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে ম্যাণ্ডারলের সকাল বেলাকার খাবারের সমারোহ দেখে সেদিন আমি কি রকম আশ্চর্য হয়েছিলাম। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি আলমারির তাকে রূপোর পাত্রে চা, কফি হিটারের ওপর রয়েছে। আরও আছে মাছ, মাংস, ডিমের রকমারি কত কি খাবার। আরেকটি তাকে রয়েছে ডিমসিদ্ধ, পরিজ। টেবিলের ওপর এককোণে টোষ্ট, মাখম, নানারকমের জ্যাম, জেলি, মারমালেড, মধু। আরেকদিকে থরে থরে কত ফল সাজানো আছে।

এতদিন ম্যাক্সিমকে দেখেছি শুধু ফল আর সামান্য কিছু খাবার খেতে। তাই ম্যাণ্ডারলের সকাল বেলাকার খাবারের এই অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁকে কল্পনা করে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। প্রায় দশ পনের জনের খাবার আমাদের দু'জনের জন্য রাখা হয়েছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এখানে এভাবেই তো চলছে! ম্যাক্সিমের কাছে এটাই একান্ত স্বাভাবিক। তাই তার আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। লক্ষ্য করে দেখলাম ম্যাক্সিম মাত্র ছোট্ট এক টুকরো মাছের তৈরী খাবার খেয়েছে। আমি শুধু একটা ডিম সিদ্ধ নিলাম। এত খাবারের

বাকি গুলো কি হবে ভেবে খুব অবাক হয়ে গেলাম। ম্যাণ্ডারলের চাকর-বাকরেরা, যাদের আমি এখন পর্যন্ত দেখিইনি তারাই কি এগুলো খাবে? না, সমস্ত খাবার ধরে ফেলে দেওয়া হবে? কে জানে! এবিষয়ে কোন দিন কিছু জানতে পারবোনা। কারণ কাউকে জিজ্ঞেস করবার সাহস তো আমার নেই।

হঠাৎ ম্যাক্সিম বলে উঠল, 'আমাদের অনেক ভাগ্য যে আমার আত্মীয় স্বজন বেশি নেই। একটি মাত্র বোন আর এক দিদিমা আছেন। বোনের নাম বিয়েট্রিস। তার সাথেও খুব কম দেখা শুনো হয়। আজ সে এখানে দুপুরে খাবে। তোমাকে দেখতেই সে আসছে।'

'আজ?' ভয়ে আশঙ্কায় আমার সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে যেতে লাগলো।

'হাঁ। আজই আসবে। এই তো তার চিঠি পেলাম। আমার মনে হয় তাকে তোমার ভাল লাগবে। সে খুব স্পষ্টবাদী। মনে এক, মুখে আর এক নয়। তোমাকে তার ভাল না লাগলে তোমার মুখের ওপরেই জানিয়ে দেবে সেকথা।'

ম্যাক্সিমের একথায় আমি এতটুকুও সান্ত্বনা পেলাম না। মনে হোল সময় বিশেষে মানুষ মনের কথা মুখে না বললেই বুঝি ভাল! ম্যাক্সিম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'এখনি আমাকে বের হতে হবে। তুমি একা থাকতে পারবে তো? ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে যাব। কিন্তু এখনই ফ্র্যাঙ্ক ক্রলের সাথে দেখা না করলেই নয়। অনেকদিন এখানে না থাকায় এত কাজ জমে আছে কি বলবো! ও, হাঁ, ক্রলেও আজ আমাদের সাথে দুপুরে খেতে আসবে।' ম্যাক্সিম কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলো। তারপর আবার বললো, 'তাহলে একা একা থাকতে তোমার কষ্ট হবে না তো?'

'না।' ম্যাক্সিম এবার তার কাগজপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ম্যাণ্ডারলের প্রথম সকাল বেলাটি এভাবে একেলা কাটবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম সকালবেলা ম্যাক্সিম আমাকে সাগরের দিকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। এদিক ওদিক বেড়িয়ে অনেক বেলা করে আমরা দু'জনে বাড়ি ফিরবো খুব ক্লান্ত হয়ে। লাইব্রেরি ঘরের জানালা দিয়ে যে বাদাম গাছটি দেখা যায়, দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারই তলায় ঝিরিঝিরি পাতার ছায়ায় দু'জনে বসে থাকবো পাশাপাশি অলস, অন্য মনে। এভাবেই সময় যাবে বয়ে.......!

এসব কত কি ভাবতে ভাবতে ম্যাণ্ডারলের প্রথম প্রভাতের জলখাবার খেতে লাগলাম একটু একটু করে। কোথা দিয়ে যে কত সময় বয়ে গেল কোন খেয়াল ছিল না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ফার্থ পর্দার ওপাশ থেকে ঘরে ঢুকছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম বেলা দশটা। নিজেকে বড় অপরাধী মনে করে তখনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এত দেরি করার জন্য খুব লজ্জিত হয়ে ফার্থের দিকে তাকালাম। সে সসম্ভ্রমে মাথা নিচু করে আমাকে সম্মান দেখালো, কিন্তু কিছুই বললো না। তার ব্যবহার এত সুন্দর, এত নম্র! কিন্তু তার চোখে এবার যেন বিস্ময়ের একটুখানি রেশও দেখতে পেলাম। মনে মনে সে আমাকে কি ভাবলো কে জানে! ডানভারসের মত ফার্থও কি বুঝতে পেরেছে যে আমার চাল-চলনে, ব্যবহারে কোথাও আভিজাত্য এবং আত্মবিশ্বাসের কণামাত্রও নেই! অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা ও দুঃখের বিনিময়ে আপ্রাণ চেষ্টার পর আমাকে তা আয়ত্ত করতে হবে।

ঘর থেকে বের হয়ে আমি যে কোনদিকে যাচ্ছিলাম নিজেও তা জানি না। হঠাৎ দোর গোড়ায় হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। ফার্থ তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এলো, আমার রুমালটি মেঝে থেকে

উঠিয়ে হাতে দিল। সেই ছোক্‌রা ভৃত্য রবার্ট পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার অবস্থা দেখে সে হাসি লুকোবার জন্যই বুঝি মুখ ফেরালো।

হলঘরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমি তাদের কথার গুঞ্জন শুনতে পেলাম। রবার্টের হাসির শব্দও কানে এলো। তারা হয়তো আমার কথা বলাবলি করে হাসছিল। সকলের চোখের অন্তরালে শোবার ঘরের একান্ত নিজনতায় নিজেকে লুকিয়ে রাখবো বলে ওদিকে চললাম। কিন্তু শোবার ঘরের দরজা খুলে দেখি দু'জন পরিচারিকা সেখানে কাজ করছে। একজন মেঝে পরিষ্কার করছে, আরেকজন ড্রেসিং টেবিলটার ধুলো ঝাড়ছে। আমাকে দেখে তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। তখনি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এসময়ে শোবার ঘরে ঢোকা নিশ্চয়ই এখানকার রীতি বিরুদ্ধ! প্রতি পদে পদে আমার এই অজ্ঞতা ম্যাণ্ডারলের চিরাচরিত নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে হয়তো।

আমি চুপি চুপি আবার নিচে নেমে এলাম। এবার লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলাম। লাইব্রেরি তখন হিম শীতল হয়ে আছে। জানালাগুলো সব খোলা ছিল। কিন্তু চুল্লি জ্বালানো হয়নি। জানালা বন্ধ করে দিয়ে আমি দেশলাই খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না।

কালরাত্রে লাইব্রেরিতে চুল্লির গরম আমেজে বসে থাকতে কেমন আরাম লেগেছিল! কিন্তু আজ এই সকাল বেলাতেই ঘরখানি কী ঠাণ্ডা, একেবারে বরফের মত! আমার শোবার ঘরে দেশলাই আছে, কিন্তু সেখানেই বা এখন যাই কেমন করে? তারা নিশ্চয় এখনও সেখানে কাজ করছে। তাদের বারে বারে বিরক্ত করাও উচিত নয়। তাছাড়া, আবার তারা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সেকথা ভেবে সেখানে যাবার ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেল। অনেক ভেবে ঠিক করলাম ফার্থ আর রবার্ট যখন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন সেখানে গিয়ে দেশলাই নিয়ে আসবো। নিঃশব্দে

আবার হলঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারা তখনও কাজ করছিল। আমি তাদের গলা শুনতে পেলাম। প্লেট, ট্রে সরাবার শব্দও শুনতে পেলাম। তারপর এক সময় সব চুপচাপ হয়ে গেল। তারা নিশ্চয় এতক্ষণে রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে ভেবে আবার হলঘর পার হয়ে খাবার ঘরে ঢুকলাম। তাক থেকে দেশলাই নিতে যাব এমন সময় ফার্থ আবার ঘরে এলো। আমি তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলবো ভাবলাম। কিন্তু ফার্থ দেখে ফেলেছে আমার হাতে কি একটা আছে। সে খুব আশ্চর্যও হয়েছে মনে হোল।

'আপনি কি কিছু খুঁজছেন?' সে নম্রভাবে আমাকে প্রশ্ন করলো।

'দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লাইব্রেরির চুল্লিতে আগুন দেব বলে দেশলাই খুঁজছিলাম।'

'বিকেলের আগে লাইব্রেরি ঘরে তো চুল্লি জ্বালানো হয় না! সকাল বেলায় মিসেস ডি উইণ্টার সর্বদা বসবার ঘরই ব্যবহার করতেন। তাই এসময়ে সেখানেই চুল্লি জ্বালানো হয়। অবশ্য আপনি যদি বলেন তাহলে লাইব্রেরিতে চুল্লি ধরাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

'না, না, তার কোন দরকার নেই। আমি সে ঘরেই যাচ্ছি।' খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম।

'সে ঘরে আপনি চিঠি লেখার কাগজ, কালি, কলম, সব পাবেন। সকাল বেলা খাবার পর মিসেস ডি উইণ্টার বসবার ঘরে বসেই চিঠিপত্র লিখতেন, ফোন করতেন। বাড়ির ফোন ওঘরেই আছে। কোন দরকার হলে মিসেস ডানভারসকে আপনি ফোন করবেন।'

'আচ্ছা।' আমি আবার হলঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। বসবার ঘর যে কোথায় কোনদিকে তাও আমি জানি না। কিন্তু সে কথা ফার্থকে বলাও যায় না। চলতে চলতেই বুঝতে পারলাম ফার্থ খাবার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি কোনদিকে যাচ্ছি বোধহয় তাই দেখবার জন্য।

সিঁড়ির বাঁ দিকে একটি দরজা দিয়ে ঢুকে গেলাম। মনে মনে আকুল হয়ে কামনা করছিলাম এপথেই যেন আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু ঘরটিতে ঢুকেই দেখি এ তো ফুল-ঘর! দেওয়ালের গায়ে গায়ে বাস্কেট-চেয়ারের মধ্যে রয়েছে কত রকমের গাছ, গাছরা, ফুল ফলের বীজ। একটি পেরেকে ঝুলানো রয়েছে তিন চারটি বর্ষাতি। হতাশ হয়ে আবার এঘর থেকে বের হলাম। হঠাৎ হলঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম ফার্থ তখনও সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অবস্থা সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল। আমার দিকে এগিয়ে এসে এবার সে বললো, 'আপনি ড্রয়িং রুমের মধ্য দিয়ে যাবেন। তারপর সিঁড়ির ডানদিকে যে দরজা আছে সেই দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা বড় ড্রয়িং রুমের ভেতর দিয়ে গিয়ে আবার বাঁ দিকে ঘুরবেন।'

'আচ্ছা।' তার নির্দেশমত আমি বড় ড্রয়িং রুমের মধ্য দিয়ে চলেছি। ঘরটি খুব প্রশস্ত। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। খুব সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরের জানালাগুলো ম্যাণ্ডারলের সবুজ আঙ্গিনার দিকে খোলা। আঙ্গিনা শেষ হয়েই অসীম নীল সাগরের ইসারা! হয়তো এ ঘরখানিও বাইরের লোককে দেখানো হয়। ফার্থই তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখায়, দেওয়ালের ছবি ও ঘরের সব আসবাব পত্রের ইতিহাস তাদের বুঝিয়ে বলে। সত্যি ঘরখানি অপূর্ব, দেখবার মতই বটে! সমস্ত আসবাব এত মূল্যবান ও সুন্দর যে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কেবল অবাক হতে লাগলাম। কিন্তু আশ্চর্য, তবুও যেন এখানে বেশিক্ষণ থাকতে মন চায় না! ওই মূল্যবান চেয়ারে বসে, কারুকার্যময় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলি মনে হচ্ছে ঘরখানি ঠিক থাকবার উপযুক্ত নয়, এ যেন একটি যাদুঘর, পুরানো দিনের মহামূল্যবান সম্পদ যেখানে অতি যত্নে বছরের পর বছর সাজিয়ে রাখা

হয়েছে! কিছুক্ষণ সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অতীত দিনের ঐশ্বর্য সম্ভার দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ে আমি আবার চলতে সুরু করলাম বাঁ দিকে। তারপর আমার গন্তব্য সেই বসবার ঘরখানির সন্ধান পেলাম। এ ঘরটি তো কালরাত্রে আমি দেখিনি! চুল্লির কাছটিতে কুকুর দু'টি শুয়ে আছে দেখে আমার মন খুশিতে ভরে উঠলো। জেসপার আমাকে দেখেই আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এলো। আমার হাতের মুঠোয় তার নাক ঘষে আদর জানাতে লাগলো। জেসপারের মা আমি ঘরে ঢুকতেই তার অন্ধ চোখটি ঘুরিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বাতাসে কি গন্ধ শুঁকলো কে জানে! বোধহয় যাকে সে চায়, আমি যে সে নই তা বুঝতে পেরে আবার সে নির্বিকার ভাবে মাথা ঘুরিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো। তখন জেসপারও আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে তার মায়ের পাশে শুয়ে পড়লো। এটাই হয়তো তাদের প্রতিদিনকার নিয়ম। ফার্থের মত এরাও জানে লাইব্রেরিতে বিকেলের আগে চুল্লি জ্বালানো হবে না। অনেকদিনের অভ্যাস বশেই তারা এঘরে এসে শুয়েছে।

জানালার কাছে যাবার আগে কেন জানি না আমার মনে হোল ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাব অজস্র রডোডেনড্রন ফুলের অপূর্ব রক্ত শোভা! জানালার সামনে গিয়ে দেখি, ঠিক তা-ই! রক্তের মত টকটকে লাল রঙের রডোডেনড্রন অজস্র ফুটে রয়েছে জানালার গা ঘেঁষে গাছগুলোর উদ্ধত শাখার বুকে বুকে! আসবার সময় যেমন দেখেছিলাম ম্যাণ্ডারলের বনপথের দু'ধারে, ঠিক তেমনটি এখানেও! রডোডেনড্রনের ঝোপের মাঝে এক জায়গায় একটুখানি ফাঁক ছোট্ট অঙ্গনের মত। সেখানে কচি সবুজ ঘাসের নরম কার্পেট বিছানো। তারই মাঝখানটিতে সুন্দর একটি পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে অনুপম ভঙ্গিমায়। গোলাপী রঙের রডোডেনড্রনের পটভূমি তার পেছনে।

ছোট্ট অঙ্গনখানিকে তাই মনে হচ্ছে যেন রঙ্গমঞ্চ, সেই সুন্দর মূর্তিখানি এখনি বুঝি প্রাণবন্ত হয়ে নেচে উঠবে, গান গাইবে। লাইব্রেরি ঘরের মত এঘরে সেই পুরানো স্নিগ্ধ গন্ধটি কিন্তু নেই। ম্যাণ্ডারলের অতীত দিনের কোন স্মৃতির এতটুকু চিহ্নও এঘরে স্থান পায়নি! ঘরখানিতে ঢুকেই মনে হবে সত্যি এটা কোন মেয়ের বসবার ঘর। আধুনিকতার ছোঁয়াচ ভরা এর চারিদিক। ঘরের প্রতিটি আসবাব যেন অতি যত্নে বাছাই করা হয়েছে, মনের মতন করে আপন রুচি অনুসারে ঘরখানিকে সাজাতে। কাব্যের ছন্দময় অপূর্ব সুষমার মতই যেন ঘরখানির পরিবেশ! চারিধারে ভাল করে আরও একবার তাকিয়ে দেখলাম, এই গৃহ সজ্জায় পুরানো ও আধুনিকতার এতটুকুও সংমিশ্রণ নেই। ম্যাণ্ডারলের পুরানো দিনের কোন অভিজ্ঞান নেই এখানে! উচ্ছল প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা ঘরখানির রন্ধ্র অনুরন্ধ্র। ম্যাণ্ডারলের অন্য যে ঘরগুলো বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয় তাদের মত এ ঘরখানি যুগযুগান্তের পুরানো স্মৃতি বুকে নিয়ে ম্যাণ্ডারলের প্রাচীন ঐশ্বর্যের কথা একবারও মনে করিয়ে দেয় না। রডোডেনড্রনের অপূর্ব দীপ্তির উজ্জ্বল আভায় ঘরখানি কী প্রদীপ্ত হয়ে আছে! লক্ষ্য করলাম শুধু বাইরেই নয়, ঘরের মধ্যেও তারা আসর জমিয়েছে। চুল্লির ওপরের তাকে তাদের লাল টকটকে জীবন্ত মুখগুলো যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপর সোনার মোমদানির পাশে বড় ফুলদানিতে তারা দীপ্ত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত তাদের রক্তিম আভায় আর সকাল বেলাকার সোনার রোদে ঝলমলে আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে। কোথাও আর অন্য ফুল নেই, শুধুই রক্তমুখী রডোডেনড্রনের অপরূপ মেলা!

আমি এবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। রূপে বর্ণে গন্ধে যে ঘর অমন সুন্দর করে সাজানো সেখানে কাজের সুবিধার দিকেও এত তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি রাখা হয়েছে ভেবে অবাক হয়ে গেলাম। লেখবার টেবিলটি যেমন মূল্যবান তেমনি সুন্দর। তার ছোট ছোট দেরাজের ওপর এক একটায় এক এক রকম লেখা রয়েছে। 'যে চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া হয়নি,' 'যে চিঠিপত্র রাখতে হবে,' 'গৃহস্থালি', 'জমিদারী সংক্রান্ত,' 'খাবার তালিকা', 'বিবিধ,' 'ঠিকানা,' ইত্যাদি কত কি লেখা রয়েছে। প্রত্যেকটি টিকিটে সেই অদ্ভুত বাঁকা হাতের লেখা! দেখেই আমি চমকে উঠলাম। কবিতার বইয়ের সেই পাতাটি পুড়িয়ে ফেলবার পর আর আমি এই লেখা দেখিনি, দেখবার কথা কল্পনাও করিনি! সহসা একটা দেরাজ টেনে খুলে ফেললাম। সেখানেও একটি চামড়ায় বাঁধানো বইয়ের মধ্যে সেই বাঁকা হাতের লেখা 'ম্যাণ্ডারলের অতিথিদের তালিকা'। দিন, মাস, দু'ভাগ করে কোন্ দিন ম্যাণ্ডারলেতে কোন্ অতিথি এসেছে, কি খেয়েছে, কতদিন থেকেছে তার এক বছরের সম্পূর্ণ বিবরণ সুন্দর করে বইটিতে লেখা রয়েছে।

আরেকটি দেরাজে ম্যাণ্ডারলের নামাঙ্কিত নোট বই, বাজে কাজের জন্য মোটা শাদা টুকরো কাগজ এবং হাতির দাঁতের মত শাদা ধবধবে ভিজিটিং কার্ড ছোট ছোট বাক্সে সাজানো রয়েছে। পাতলা কাগজ দিয়ে মোড়ানো সেই কার্ডগুলোর একখানি আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। তাতে ছাপার স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে 'মিসেস ডিউইণ্টার।' এককোণে ছোট করে লেখা 'ম্যাণ্ডারলে।' বাক্সের মধ্যে কার্ডটি রেখে দিয়ে দেরাজ বন্ধ করে দিলাম। হঠাৎ আমার মনে হোল আমি যেন এতক্ষণ অন্যায় কাজ করছিলাম। মনে হোল এ বাড়িতে আমি শুধু অতিথি হয়ে বেড়াতে এসেছি। বাড়ির কর্ত্রী আমাকে তার নিজের লেখবার টেবিলে বসে চিঠিপত্র লেখবার অনুমতি দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু আমি যেন চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে তার চিঠিপত্র দেখছি। যে কোন মুহূর্তে সে এই ঘরে ঢুকে দেখে ফেলবে আমি কি অন্যায়

করছি! এমন সময় হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। উঠে গিয়ে রিসিভারটা ধরলাম। কিন্তু আমার হাত থরথর করে কাঁপছিল।

'কে? কাকে চান?' আমি কোন রকমে প্রশ্ন করলাম। অনেকদূর থেকে মৃদু একটা গুঞ্জন ভেসে এলো। তারপর খুব অস্পষ্ট ও দ্রুত একটা স্বর শোনা গেল ওদিক থেকে।

'মিসেস ডি উইন্টার! আপনি কি মিসেস ডি উইন্টার কথা বলছেন?'

'আপনি ভুল করছেন, কারণ মিসেস ডি উইন্টার তো এক বছরের ওপর হোল মারা গেছেন।' নিজের অজানিতেই কথাটা বেরিয়ে এলো। ফোন হাতে করে আমি অপেক্ষা করছিলাম। ওদিককার স্বর আরও একটু জোরে যখন তার নাম বললো তখন আমার সমস্ত রক্ত এক নিমেষে মুখে উঠে এলো। আমার কথা আমি আর ফিরিয়ে নিতে পারবো না তা জানি। যে ভুল করে ফেলেছি, তা আর শোধরানো যায় না।

'আমি মিসেস ডানভারস। বাড়ির ফোনে আপনার সাথে কথা বলছি।' সে স্বর গম্ভীর ভাবে বলেছিল।

আমার ব্যবহার এতই নির্বোধের মত হয়েছে যে আমি তার চোখে আগের চাইতেও সমস্ত দিক দিয়ে আমার পদ মর্যাদার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে ধরা পড়ে গেলাম। আমি যে কত বোকা তার আর বুঝতে এতটুকুও বাকি রইলো না। থতমত খেয়ে বললাম, 'আমি দুঃখিত মিসেস ডানভারস! হঠাৎ ফোন আসায় খুব চমকে উঠেছিলাম। তাই কি যে বলছিলাম নিজেই জানি না। আমি বুঝতে পারিনি যে আমাকেই আপনি ডাকছিলেন।'

'আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করায় আমিও খুব দুঃখিত!' হঠাৎ আমার মনে হোল আমি যে টেবিলের ওপর সব কাগজ পত্র দেখছি তা বোধহয় সে দূর থেকেও বুঝতে পেরেছে। আবারও তার স্বর ভেসে এলো,

'আজকের দুপুরের জন্য যে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে তা আপনার মনমত হয়েছে কিনা জানবার জন্য ফোন করেছি।' 'আপনার যা খুশি ব্যবস্থা করুন। এবিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবার কোন দরকার নেই।' আমি বললাম।

'আমার মনে হয় আপনি একবার খাবার মেনুটা পড়ে দেখলে ভাল হয়। আপনার সামনেই ব্লটারের পাশে সেটা রয়েছে।' আমি টেবিলের ওপরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে অবশেষে কাগজের ছোট একটি টুকরো দেখতে পেলাম। খুব তাড়াতাড়ি একবার তাতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ফর্দ দেখে মনে হোল এ যেন এক বিরাট ভোজের বিপুল আয়োজন! এত রকমারি সব খাবারের নামও আমি জীবনে শুনিনি। 'হাঁ, মিসেস ডানভারস, সব ঠিক আছে।'

'যদি কোন পরিবর্তন করতে চান আমাকে জানাবেন। চাটনির জায়গাটা আমি খালি রেখেছি দেখবেন। আপনার পছন্দমত কোন চাটনি লিখে দেবেন। মিসেস ডি উইণ্টার এবিষয়ে বড় খুঁতখুঁতে ছিলেন। তাই আমি সর্বদা তাঁকে চাটনির কথা আগে জিজ্ঞেস করে নিতাম।'

'মিসেস ডি উইণ্টার যা খেতে ভালবাসতেন তাই দিন।'

'তাহলে আপনার নিজের কোন পছন্দ নেই?'

'না।'

'আর একটা কথা, এখানকার ডাক দুপুর বেলা যাবে। রবার্ট আপনার চিঠি নিতে আসবে, তখন টিকিটও লাগিয়ে দেবে। যদি কোন বিশেষ জরুরী চিঠি ডাকে দেবার থাকে তাহলে রবার্টকে ফোনে ডেকে পাঠাবেন। সে তখনি তা ডাকে দেবার ব্যবস্থা করে দেবে।'

'আচ্ছা'। আমি আরও কয়েক মুহূর্ত ফোন ধরে রইলাম। কিন্তু ওদিক থেকে আর কোন কথা শোনা গেলনা। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ওপর তাকালাম। সেখানকার প্রতিটি জিনিস যেন আমাকে

প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে এই যে আমি অলস ভাবে অকারণে বসে আছি, এটাও অন্যায়। আমার আগে এ আসনে যে বসতো, সে নিশ্চয় এতটুকু সময়ও অকারণ, অকাজে নষ্ট করতো না। আমি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি তার সেই কর্মব্যস্ত চেহারা!

সে আমার মত 'মিসেস ডানভারস, আপনি যা করবেন তাই হবে,' এসব বলতো না নিশ্চয়ই! চারিদিকের সব ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে সব শেষে হয়তো সেই বাঁকা হাতের দীপ্ত আখরে সে একের পর এক চিঠি লিখে চলেছে। তারপর সবশেষে তার নাম 'রেবেকা' লিখে সই করছে। রেবেকার 'র' বঙ্কিম গতিতে অন্য আখরগুলোর অনুসরণ করছে। আমি যেন সব চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি কি করবো? কোন কাজই তো আমার করবার নেই। মিসেস ডানভারস বলেছে আমার কোন জরুরী চিঠি থাকলে রবার্টকে ফোন করতে। না জানি রেবেকা দিনে কতগুলি জরুরী চিঠি লিখতো! কাকেই বা এত লিখতো! কিন্তু আমি চিঠি লিখবো কাকে? আমার যে কেউ নেই! একমাত্র মিসেস ভ্যানহপারের কাছে লিখতে পারি। কিন্তু যার সাথে জীবনে আর কোন দিন দেখা হবে না, যাকে আমার ভাল লাগে না, তাকেই চিঠি লিখতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। তবুও কাগজ কালি কলম নিয়ে সুরু করলাম, প্রিয় মিসেস ভ্যানহপার বলে। হয়তো তিনি নিরাপদে পৌঁছেছেন, তাঁর মেয়ে ও নাতনী ভাল আছে কিনা, নিউইয়র্কের জলবায়ু নিশ্চয়ই ভাল যাচ্ছে এ সব মামুলি কয়েকটি বুলি অতি কষ্টে লিখে চললাম।

সহসা লক্ষ্য করলাম আমার হাতের লেখা কত বিশ্রী! জীবনে এই প্রথম যেন বুঝতে পারলাম আমার লেখার মধ্যে না আছে কোন ব্যক্তিত্বের ছাপ, না আছে ছিঁটেফোঁটা সৌন্দর্য! বাজে স্কুলের অমনোযোগী ছাত্রীর কাঁচা হাতের শ্রীহীন হিজিবিজি লেখা যেন!

॥ ৯ ॥

হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বারটা বেজে গেছে। তাহলে নিশ্চয়ই বিয়েট্রিসরা এসে গেছে। কিন্তু ম্যাক্সিম তো এখনও ফেরেনি! ওই জানালা দিয়ে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো ভাবলাম। জানালার কাছে গিয়ে রডোডেনড্রনের পুষ্পিত শাখাগুলিকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই সেদিক থেকে শুনতে পেলাম কাদের গলার আওয়াজ। তারা তাহলে এদিক দিয়েই আসছে! সরে এসে তাড়াতাড়ি বড় ড্রয়িংরুমে ঢুকে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে চলতে লাগলাম। লম্বা শ্বেত পাথরের সেই বারান্দা দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলেছি। নিজের বোকামিতে নিজেই খুব অবাক হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি জানি এখন এক মুহূর্তের জন্যও তাদের মুখোমুখি হতে পারবো না। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে একটা বাঁক ঘুরে আরেকটি সিঁড়ির সামনে এসে পড়লাম। মনে হোল বাড়ির পেছন দিকে এসে পড়েছি। একটি পরিচারিকা একটা পাত্র হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আমাকে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, আচমকা যেন ভূত দেখেছে এমনি তার চোখের দৃষ্টি! আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম, সেও আমার দিকে তাকাতে তাকাতে নেমে গেল। ভেবেছিলাম এখনি পূব মহলে আমার শোবার ঘরে পৌঁছে যাব। সেখানে একা একা কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারবো। তারপর ঠিক খাবার সময় নিচে নেমে গেলেই চলবে। সিঁড়ির শেষে একটি দরজা দিয়ে ঢুকে আর একটি লম্বা বারান্দায় এসে পড়লাম। অনেকটা পূব মহলের বারান্দার মত হলেও

এই বারান্দাটি আরও প্রশস্ত, অন্ধকার। একটু দ্বিধা করে আবার বাঁ দিকে ঘুরলাম। সামনেই দেখতে পেলাম প্রশস্ত চাতাল এবং আর একটি সিঁড়ি। ওদিকটাও অন্ধকার, নির্জন। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু এখন কোন্ দিকে যাব কিছু বুঝতে না পেরে এই আঁধার ও নীরবতার মাঝে একাকী দাঁড়িয়ে থেকে আরও দিশাহারা হয়ে পড়লাম। মনে হোল বাড়ির সকলে যেন এবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। কয়েকটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খুলে যে ঘরখানিতে ঢুকলাম সেটাও বড় অন্ধকার। সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করেই বুঝতে পারলাম ঘরের আসবাব পত্রের ওপর শাদা আচ্ছাদন দেওয়া রয়েছে।

চারিদিকে কেমন একটা পুরানো গন্ধ। মনে হোল কেউ কোনদিন এঘরে বাস করেনি। ঘরের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত পুরু পর্দা টানানো আছে। দরজাটি আস্তে বন্ধ করে দিয়ে বারান্দার দিকে চললাম। একজায়গায় বারান্দার কার্নিস ঘেঁসে কুঞ্জলতা উঠেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম ম্যাণ্ডারলের সবুজ প্রাঙ্গনের চোখ জুড়ানো শ্যামলিমার পরেই দেখা যাচ্ছে বিক্ষুব্ধ সাগরের অন্তহীন নীলিমা! সাগরের উত্তাল ঢেউ বেলাভূমিতে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ঢেউয়ের শাদা ফেনাগুলি ঝিকমিক করছে। এখান থেকে সাগর এত কাছে আমি ভাবতেও পারিনি! এখানে দাঁড়িয়েই আমি ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। সাগরের বুক থেকে এক ঝলক নোনা হাওয়া এসে আমার চোখে মুখে তার পরশ বুলিয়ে দিল। সহসা এক টুকরো মেঘ সূর্যের ওপর তার ছায়া ফেললো। মুহূর্তের মধ্যে সাগরের রূপ গেল বদলে। উত্তাল সমুদ্র আরও পাগল হয়ে উঠলো। সাগরের নীল জল যেন এক নিমেষে কালোবরণ হয়ে গেল। প্রথম দিনের শান্ত সমুদ্র আর আজকের এই উত্তাল সমুদ্রে কতই না প্রভেদ!

হঠাৎ আমার পেছনে দরজা খোলার শব্দ হতেই ফিরে দেখি মিসেস ডানভারস দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কথা না বলে আমরা দু'জন দু'জনের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। আমাকে দেখে তার মুখের ভাব এত ভাবলেশহীন হয়ে গেল যে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তার সেই দৃষ্টিতে রাগ বা কৌতূহল, কোন্‌টা ফুটে উঠলো। সে কোন কথা না বললেও নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হোল। মনে হোল এখানে যেন অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি। আমার মুখ ভয়ে, ভাবনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'আমি পথ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছি। শোবার ঘরে যাচ্ছিলাম।'

'আপনার শোবার ঘরের ঠিক উল্টো দিকে এসে পড়েছেন। এদিকটা পশ্চিম মহল।'

'হাঁ, এখন তা বুঝতে পারছি।'

'এদিককার কোন ঘরে ঢুকেছিলেন ?'

'না। একটি ঘরের দরজা খুলেছিলাম। কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকিনি। ঘরটি খুব অন্ধকার ছিল। আপনিই বোধহয় এদিকটা বন্ধ করে রেখেছেন ?'

'আপনি ইচ্ছা করলে আমি সব ঘরগুলো খুলে দেব। ঘরগুলো সম্পূর্ণ সাজানোই রয়েছে। এদিকটা ব্যবহার করাও চলে।'

'না, না, তার কোন দরকার নেই।'

'এই মহলটা এখন ভাল করে দেখবেন কি ?'

'না আজ নয়। আমাকে এখনি নিচে যেতে হবে।' আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সেও আমার পাশে পাশে আসছে। আমি যেন কয়েদী, প্রহরীর মত সে আমার পাশে পাশে চলেছে। 'আপনার অবসর সময়ে আমাকে বললেই আমি আপনাকে এই মহলের সব কিছু

দেখিয়ে দেব।' তার এ ধরণের কথায় কেন জানিনা আমার বড় অসোয়াস্তি হতে লাগলো। মিসেস ডানভারস আবার বলে উঠলো, 'আমি ঘরের পর্দা সরিয়ে দেব তাহলে আপনি ভাল করে সব দেখতে পাবেন। আমাকে ফোন করে জানাবেন কখন আপনার সময় হবে।'

তারপর আমরা দু'জনে একত্রে অলিন্দে নেমে এলাম। বড় সিঁড়ির মুখে এসে পড়েছি। সে আবার বললো, 'অবাক হয়ে যাচ্ছি কি করে আপনি পথ ভুলে এদিকে এসে পড়লেন! পশ্চিম মহলের দরজা তো একেবারে অন্য রকম।'

'আমি এ পথে আসিনি।'

'তাহলে পেছনের পথ দিয়ে এসেছেন?'

'হাঁ।' আমি তার চোখের দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি হঠাৎ বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে চলে এসেছি কেন তার কারণ আমার মুখ থেকেই সে শুনতে চায় বুঝতে পারলাম। সহসা আমার মনে হোল আমাকে সে প্রথম থেকেই পশ্চিম মহলে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে কোথাও কোন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে।

'মিসেস লেসি আর মেজর লেসি কিছুক্ষণ হোল এসেছেন। বারটার পর অমি তাঁদের গাড়ির শব্দ শুনেছি।' সে আবার বলে উঠলো।

'ও। আমি তো তা জানি না।'

'ফার্থ নিশ্চয় তাঁদের বসবার ঘরে নিয়ে গেছে। এখন তো প্রায় সাড়ে বারটা হতে চললো। পথ চিনে এবার যেতে পারবেন তো?'

'হাঁ, পারবো।' আমি হলঘরের দিকে চলতে লাগলাম। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে আমি আবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি ডানভারস সেই বড় সিঁড়ির মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালো পোশাক পরা সেই নিশ্চল মূর্তিকে অবিকল একটি প্রহরীর মত মনে হচ্ছিল।

বসবার ঘরের সামনে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাঁদের কথার গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। ঘরে অনেকে আছে মনে হোল। হঠাৎ আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। এত লোকের সামনে কি করে গিয়ে দাঁড়াবো! দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই আরও ঘাবড়ে গেলাম। আমাকে দেখে সবাই নীরব হয়ে গেল। তারপর প্রথম ম্যাক্সিমই বলে উঠলো, 'এই যে, এসেছো? কোথায় লুকিয়ে ছিলে বল তো! আমরা তোমার জন্য এত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে এখনি চার ধারে লোক পাঠাতাম তোমাকে খুঁজে আনতে। এই যে বিয়েট্রিস, গাইলস, আর ইনি হলেন আমার এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক ক্রলে। একি, কুকুরটার ঘাড়ে পড়ছো যে!' নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি বিয়েট্রিসের দিকে তাকালাম। সে বেশ লম্বা এবং সুন্দর দেখতে। তার চোখ দু'টো আর চিবুক অনেকটা ম্যাক্সিমের মত। কিন্তু তাকে খুব সপ্রতিভ ও চালাক চতুর বলে মনে হোল না। সে এগিয়ে এসে আমার দু'হাত ধরলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ম্যাক্সিমের উদ্দেশ্যে বললো, 'যা ভেবেছিলাম এ যে দেখছি তার একেবারে উল্টো! তোমার বর্ণনার সাথেও তো এতটুকু মিল নেই!' তার কথায় সকলে হেসে উঠলো। আমিও হাসলাম। জানিনা সেই হাসির কি অর্থ। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম সে আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছিল! ম্যাক্সিমই বা তাকে আমার কথা কি বলেছে। ম্যাক্সিম এবার আমাকে হাত ধরে বিয়েট্রিসের স্বামীর কাছে এনে বললো, 'ইনি গাইলস।' ভদ্রলোক তাঁর সবল হাতের মুঠোয় আমার হাতখানি তুলে নিয়ে পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে হাসিভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্সিম বললো, 'ফ্র্যাঙ্ক ক্রলে।' তাকিয়ে দেখি দোহারা চেহারার সাধারণ একজন ভদ্রলোক। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিতে কেমন একটা নির্ভাবনার আভাস ফুটে উঠলো। আমাকে দেখে সে বুঝি স্বস্তির

নিশ্বাস ফেললো, তার চোখের নীরব ভাষায় সে কথাটাই মূর্ত হয়ে উঠলো। দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। বিয়েট্রিস আমার একান্ত কাছে সরে এসে বললো, 'ম্যাক্সিমের কাছে শুনলাম তোমরা মাত্র কাল এসেছো। আমি তা জানতাম না। জানলে কিন্তু এত শিগ্‌গীর তোমাদের বিরক্ত করতে আসতাম না। আচ্ছা, ম্যাণ্ডারলে তোমার কেমন লাগছে?' 'ম্যাণ্ডারলের সব জায়গা এখনও দেখিনি। তবে জায়গাটা খুব সুন্দর তা বুঝতে পেরেছি।' বিয়েট্রিস আমার আপাদ মস্তক ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু তার সেই দৃষ্টি ডানভারসের দৃষ্টির মত ঈর্ষাকাতর নয়। তার দৃষ্টিতে কৌতুহলের সাথে সহানুভূতিরও আভাস ছিল।

সে ম্যাক্সিমের বোন, তাই আমাকে সবদিক দিয়ে যাচাই করে নেবার অধিকার তার আছে। বিয়েট্রিস ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে এবার বললো, 'তোমার চেহারা এখন তো একটু ভালই মনে হচ্ছে। তোমার সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর নেই। এটা আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। এজন্য অবশ্য তোমাকেই আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত।' শেষের কথাটা সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো। ম্যাক্সিম যেন একটু বিরক্তিভরে উত্তর দিল, 'আমি সব সময়েই ভাল আছি। এ জীবনে কখনও আমার কিছু হয়নি। গাইলসের মত মোটা না হলেই তোমার চোখে আর সকলকে অসুস্থ মনে হয়।' 'সে কথা বললে কি হবে, কে না জানে মাত্র ছয় মাস আগেও তোমার শরীর কি রকম ভেঙ্গে গিয়েছিল! সে সময় তোমাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম আজও তা মনে পড়ে। তখন মনে হয়েছিল আর বুঝি কোনদিন তোমার শরীর সারবে না। আচ্ছা গাইলস, তুমিই বল তো, সে সময় ম্যাক্সিম আমাদের খুব ভাবিয়ে তোলে নি?' 'হাঁ, তা ঠিক। এখন তোমার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে ম্যাক্সিম। এটা সত্যি সুখের কথা। কলে কি বল?' গাইলস

হাসতে হাসতে বললেন। ম্যাক্সিমের মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম এ সব কথায় তার খুব রাগ হচ্ছে। কোন মতে সে নিজেকে সংযত করে রেখেছে। জানি না স্বাস্থ্য সম্পর্কে এরকম আলোচনা কি কারণে তার ভাল লাগছিল না। বিয়েট্রিস তা বুঝতে না পেরে এ ব্যাপারটাকেই এত বাড়িয়ে তুলছে দেখে বুঝতে পারলাম তার এতটা সূক্ষ্ম বোধশক্তি নেই। বিয়েট্রিস নেহাতই সহজ সরল মানুষ! কথার মোড় ফেরাবার জন্য আমি সলজ্জভাবে বলে ফেললাম, 'ম্যাক্সিমের গায়ের রঙ রোদে পুড়ে একেবারে তামাটে হয়ে গেছে। ভেনিসে সারাক্ষণ সে রোদে বসে থাকতো। তার ধারণা গায়ের রঙ তামাটে হলে তাকে ভাল দেখাবে।' আমার কথায় সবাই হেসে উঠলো। ক্রলে বললেন, 'আচ্ছা মিসেস ডি উইণ্টার, এ সময়টা ভেনিসের দৃশ্য আর আবহাওয়া নিশ্চয়ই খুব সুন্দর?'

'হাঁ, ভারি সুন্দর!'

এভাবে তার স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ থেকে আলাপ আলোচনা ক্রমে ক্রমে ইতালী, ভেনিস আর আবহাওয়া তথ্যে পৌঁছে বেশ সহজ গতিতে চলতে লাগলো। ক্রলের আলোচনার ধারা দেখে বুঝলাম সেও চায় না যে ম্যাক্সিমের স্বাস্থ্যের কথা আবার উঠুক। তাকে হঠাৎ আমার সত্যিকারের বন্ধু বলে মনে হোল। বিয়েট্রিস জেস্পারকে আদর করতে করতে বললো, 'জেসপারকে ব্যায়াম করানো দরকার। এই তো সবে দু'বছর বয়স, এরই মধ্যে কিরকম মোটা হয়ে যাচ্ছে। ওকে কি খেতে দিচ্ছ ম্যাক্সিম?'

'তোমার কুকুররা যা খায় জেস্পারও তাই খাচ্ছে। ওদের বিষয় তুমি আমার চাইতেও বেশি বোঝ তাই জানাতে চাও বুঝি?'

'না ভাই, তা নয়। কিন্তু দু'মাস তো এখানে ছিলে না। তাহলে তুমিই বা কি করে বলছো যে জেসপার কি খায়, কি করে সব জান? ফার্থ দিনের মধ্যে দু'বারও অন্তত জেসপারকে নিয়ে ফটকের সামনে যায়

বলে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক দিন ওকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় নি এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।'

'আমার তো মনে হয় তোমার আধমরা বোকা কুকুরগুলোর চেয়ে জেসপার দেখতে অনেক ভাল।'

'আমার লায়ন গেল ফেব্রুয়ারী মাসে দু' দুবার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল তা তো জান। কাজেই তোমার ওকথা একেবারে বাজে তা প্রমাণ হয়ে গেল।'

কথাবার্তার ধারা আবার কেমন যেন বাঁকা পথ ধরলো। ম্যাক্সিমের চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এরা ভাই বোন একসাথে হলেই কি কেবল ঝগড়ার স্বরে কথা বলে !

'আপনারা এখান থেকে কতদূরে থাকেন ?' আমি বিয়েট্রিসের পাশে বসে প্রশ্ন করলাম।

'এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। ওখানটা শিকারের ভারি উপযুক্ত জায়গা। তুমি আমাদের কাছে এসে কয়েক দিন থাক না ! গাইলস তোমাকে ঘোড়ায় করে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি তো শিকার করতে পারবো না। ছোট বেলায় ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলাম, তাও খুব সামান্য ! এখন ভুলে গিয়েছি।'

'আবার শেখ। এদেশে ঘোড়ায় না চড়তে জানলে চলতেই পারবে না। কি করে সময় কাটাবে ? ম্যাক্সিমের কাছে শুনলাম তুমি নাকি আঁকতে জান ? এটা খুব ভাল। কিন্তু তাতে তোমার কোন ব্যায়াম হবে না কিন্তু ! এ হোল গিয়ে বর্ষার দিনে আর কিছু করবার না থাকলে সময় কাটাবার ভাল উপায়।'

'আমরা তোমার মত অত বাইরে বাইরে থাকতে মোটেই ভালবাসিনা বুঝলে ?' ম্যাক্সিম বলে উঠলো।

'আমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলছি ? আমরা সবাই বেশ ভাল করে

জানি তুমি কত বড় কুনো! ম্যাণ্ডারলের বাগানের ওদিকে এক পাও তুমি বেড়াতে যাও না তা কি আর জানি না মনে কর?'

'আমি বেড়াতে খুব ভালবাসি! আমার মনে হয় ম্যাণ্ডারলের বনে বাগানে, সাগর বেলায় পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াতে কোনদিন আমার এতটুকুও ক্লান্তি আসবেনা। গরম পড়লে আমি সাগরে স্নানও করবো।'

'ও, তুমি বুঝি তাই ভাবছো! কিন্তু এখানে স্নান করার কথা আমি তো কোন দিন শুনিনি। এখানকার সাগর বড় গভীর।'

'তাতে আমি ভয় পাই না। সমুদ্রে স্নান করতে আমার বড় ভাল লাগে। কোন বিপদ ঘটবার আশঙ্কা না থাকলেই হোল।'

এবার আমার একথার কোন উত্তর দিল না কেউ। সেই মুহূর্তে আমিও অনুভব করতে পারলাম কি কথা বলে ফেলেছি! আমার বুক দুরুদুরু করে উঠলো। ভয়ে আশঙ্কায় মুখ চোখ গরম হয়ে উঠলো। কি করবো ভেবে না পেয়ে নিচু হয়ে জেসপারকে আদর করতে লাগলাম। একটু পরে নীরবতা ভেঙ্গে বিয়েট্রিস বললো, 'জেসপার সাঁতার কাটলে ওর চর্বি কিছুটা কমে যেতে পারে। কিন্তু মনে হয় সাগরে স্নান করতে ও ভয় পাবে। তাই না জেসপার? লক্ষ্মী জেসপার, আয় আয়'—বিয়েট্রিসও জেসপারের ওপর ঝুঁকে পড়ে আদর জানাচ্ছে। হঠাৎ ম্যাক্সিম বলে উঠলো, 'ওঃ, আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার দিচ্ছে না কেন?'

'এইমাত্র একটা বাজলো।' ক্রলে বললেন।

'এই ঘড়ি তো সব সময় আগে আগে চলে। ঠিক সময় কখনও দেয় না', বিয়েট্রিস বললো।

'ঘড়িটা অনেক দিন হোল ঠিক সময়ই দিচ্ছে।' ম্যাক্সিম জবাব দিল।

এমন সময় দরজা খুলে ফার্থ ঘরে ঢুকে বললো খাবার দেওয়া হয়েছে।

'আমি হাত ধুয়ে আসছি,' এই বলে গাইলস অন্য দিকে চলে গেলেন। আমরা আর সকলে উঠে ড্রয়িংরুমের মধ্য দিয়ে হল ঘরের দিকে যেতে

লাগলাম। আমি আর বিয়েট্রিস আগে আগে যাচ্ছিলাম হাত ধরাধরি করে।

'বুড়ো ফার্থ বড় ভাল লোক। তাকে বরাবর একরকম দেখছি। চেহারার এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। তাকে দেখলেই আমার ছেলেবেলার দিনগুলি যেন আবার ফিরে পাই।' একটু চুপ করে থেকে বিয়েট্রিস আবার বললো, 'কিছু মনে কোর না, একটা প্রশ্ন করবো তোমায়। আমি যা ধারণা করেছিলাম তুমি তার চেয়েও অনেক ছেলেমানুষ। ম্যাক্সিম তোমার বয়স যা বলেছে, আমার তো মনে হয় তোমার বয়স তার চেয়েও কম। আচ্ছা, তুমি কি তাকে খুব ভালবাস?' এই প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার বিস্ময়ভরা দৃষ্টি বোধহয় সে লক্ষ্য করলো: তাই একটু হেসে আমার হাতে চাপ দিয়ে আবার বললো, 'থাক, উত্তর দিতে হবে না। তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি। তোমাকে খুব বিরক্ত করছি, তাই না? কিছু মনে নিও না ভাই! আমরা দু'ভাই বোনে দেখা হলেই কেবল ঝগড়া করি। কিন্তু জান, আমি তাকে বড় ভালবাসি। তার পরিবর্তন হয়েছে বলে তোমার ওপর আমি সত্যি খুশি হয়েছি। গেল বছর তার জন্য আমরা বড় ভাবনায় পড়েছিলাম। তুমি নিশ্চয় সব ঘটনা জান?' আমরা তখন খাবার ঘরে এসে পড়েছি। বিয়েট্রিস আর কিছু বললো না। চেয়ারে বসে ন্যাপকিন খুলতে খুলতে ভাবছিলাম বিয়েট্রিস যদি জানতো যে আমি গত বছরের কোন ঘটনা, ম্যাণ্ডারলের কোন খবরই জানি না, ম্যাক্সিম আমাকে কিছু বলেনি, আমিও তার অতীত জীবনের কথা কখনও জানতে চাইনি, তাহলে না জানি আমাকে সে কি ভাববে!

আমাদের খাওয়া দাওয়া বেশ নির্বিঘ্নেই চলতে লাগলো। বিয়েট্রিস এবার ম্যাক্সিমের সাথে হাসি মুখে তার ঘোড়ার কথা, বাড়ির কথা ম্যাণ্ডারলের বিষয় নিয়ে কত কথা বলছে। ফ্র্যাঙ্ক ক্রলে আমার বাঁ পাশে

বসে খুব সহজ ভাবে আমার সাথে কথা বলছিল। এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো। গাইলস বিশেষ কোন কথা না বলে খাওয়ার দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন। কখনও কখনও আমার দিকে চেয়ে দু'একটা কথাও বলছিলেন।

'আগের রাঁধুনিই রেঁধেছে, না ম্যাক্সিম?' তিনি প্রশ্ন করলেন। খেতে খেতে আবার বললেন, 'আমি বী কে প্রায়ই বলি সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে ম্যাণ্ডারলেই একমাত্র জায়গা যেখানে মনের মত অপূর্ব রান্নার স্বাদ পাওয়া যাবেই।' ম্যাক্সিম বললো, 'রাঁধুনি মাঝে মাঝে বদল হয় সত্যি, কিন্তু রান্নার ধারা এখানে একই রকম। মিসেস ডানভারস সব জানে। সে-ই ওদের নির্দেশ দেয় কি ভাবে কি করতে হবে না হবে।'

'ভারি অদ্ভুত লোক এই ডানভারস! তুমি কি বল?' আমার দিকে তাকিয়ে গাইলস বললেন। আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। সহসা লক্ষ্য করলাম বিয়েট্রিস আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ম্যাক্সিমের সাথে কথা বলতে লাগলো।

'আচ্ছা, আপনি গলফ খেলা জানেন?' ক্রলে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

'না'। কথার মোড় ফিরে গেল বলে খুশি হলাম। যাক, মিসেস ডানভারসের প্রসঙ্গ তাহলে আর উঠবে না!

আমাদের খাওয়ার শেষ পর্ব চীজ, কফি সবই খাওয়া হয়ে গেল। এখন আমরা উঠবো কিনা বুঝতে পারলাম না। ম্যাক্সিমের দিকে তাকালাম। সে কিন্তু উঠবার জন্য কোন ইঙ্গিত করলো না। গাইলস কি একটা গল্প সুরু করলেন। সেই গল্পের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পারলেও নীরবে একমনে তাঁর সেই গল্প শুনে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে একটু হেসে মাথাও নাড়ছি। হঠাৎ অনুভব করলাম টেবিলের ওদিক থেকে ম্যাক্সিম

যেন কেমন ধারা অস্থির হয়ে উঠেছে। গাইলসের গল্প শেষ হলে আবার ম্যাক্সিমের দিকে তাকালাম। তার ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছে। দরজার দিকে মাথা নেড়ে আমাকে সে উঠবার জন্য ইশারা করলো। আমি তখনি উঠে পড়লাম, চেয়ার সরাতে গিয়ে টেবিলটায় ধাক্কা লেগে গাইলসের গ্লাস উল্টে গেল। আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে কি যে করবো ভেবে না পেয়ে ন্যাপকিনটা নেবার উপক্রম করতেই ম্যাক্সিম বলে উঠলো, 'ফার্থ সব ঠিক করে দেবে। তুমি আর ঝামেলা বাড়িও না। বী, ওকে বাগানে নিয়ে যাও তো। এখানকার অনেক কিছুই ও দেখেনি।' ম্যাক্সিমকে কেমন ক্লান্ত, বিরক্ত মনে হোল।

হঠাৎ মনে হোল ওরা যদি না আসতো তাহলেই ভাল হোত! আমাদের দিনটাকে ওরা নষ্ট করে দিয়ে গেল। নিজেকেও সহসা বড় ক্লান্ত মনে হোল। কিছু যেন আর ভাল লাগে না! ম্যাক্সিম কেন ওরকম বিরক্তির সুরে কথা বললো! গ্লাস উল্টিয়ে সকলের চোখে আমি আরও বেশি বোকা বনে গেলাম, সেজন্যই কি সে রাগ করেছে? অভিমান আর দুঃখে মনটা আরও ভারি হয়ে উঠলো।

আমি আর বিয়েট্রিস ম্যাণ্ডারলের প্রাঙ্গণের নরম সবুজ বুকের ওপর দিয়ে চলেছি। 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন? ইতালীতে আরও তিন চার মাস থেকে তারপর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এখানে এলেই ভাল করতে। তাতে ম্যাক্সিমের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হোত, তোমার পক্ষেও এখানকার জীবন অনেকটা সহজ, স্বাভাবিক হোত। প্রথম প্রথম এখানে তোমার খুবই অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়?'

'না, না, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যাণ্ডারলেকে ভালবেসে ফেলবো।' সে কোন উত্তর দিল না, আমরা প্রাঙ্গণের এদিক থেকে ওদিকে বেড়াতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আবার বললো, 'তোমার কথা আমায় বল, শুনি। মণ্টিকার্লোতে তুমি কি করছিলে?

এক আমেরিকান ভদ্রমহিলার সাথে ছিলে ম্যাক্সিমের কাছে শুনলাম।'
আমি মিসেস ভ্যানহপারের কথা তাকে বললাম। তাঁর কাছে আমি কি কাজ করতাম তাও বললাম। সে আমার কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়ছিল। আমার সব কথা বুঝি সে শুনতেও পায়নি। আমি চুপ করলে সে বললো, 'হাঁ, এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল। অবশ্য আমরা সবাই এতে খুশি হয়েছি, আশাকরি তুমিও সুখী হবে।'

অবাক হয়ে ভাবলাম সে কেন বললো যে সে আশা করে আমি সুখী হবো! কেন সে বললো না আমি সুখী হবো তা সে জানে, নিশ্চয় করেই জানে! বিয়েট্রিস সহজ সরল মানুষ! মনটি তার কত সুন্দর। আমি তাকে এরই মধ্যে বড় ভালবেসে ফেলেছি! কিন্তু তার কথার মধ্যে এই দ্বিধার ভাবটা আমার মনে কেমন একটা সন্দেহের ভাব জাগিয়ে তুললো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার হাত ধরে তখন সে বলছে, 'ম্যাক্সিম আমাকে লিখেছিল সে তোমাকে মণ্টিকার্লোয় খুঁজে পেয়েছে। লিখেছিল তুমি দেখতে সুন্দর, বয়সও খুব অল্প। অস্বীকার করবো না তখন আমি বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল ওসব সমাজের অতি আধুনিকা রঙীন একটি প্রজাপতিকেই বুঝি দেখবো! কিন্তু তোমাকে দেখে আমাদের সব ধারণা পালটে গেছে ভাই।' সে এবার হেসে উঠলো। আমিও হেসে ফেললাম। আমাকে দেখে সে খুশি হয়েছে কি হয়নি তা কিছু বললো না তো!

'বেচারা ম্যাক্সিম! তার সময় খুব খারাপ যাচ্ছিল। এখন তুমি তাকে সেই সব দিনের দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দিতে পারবে বলে আশা করছি। অবশ্য ম্যাণ্ডারলেকেও ম্যাক্সিম অদ্ভুত ভালবাসে।'

আমার একটি মন চাইছিল সে এ ভাবেই বলে চলুক ম্যাক্সিমের অতীত জীবনের কথা, ম্যাণ্ডারলের জীবন ধারার কথা এমনি সহজ ভাবে!

মনের আর একটা দিক কিন্তু ওসব কোন কথা শুনতে বা জানতে চায় না, ভয় পায়!

'আমরা দু'ভাই বোনে এক রকম নই তা বুঝতেই পারছো। আমাদের স্বভাব ও চালচলনে অনেক ব্যবধান। আমি বড় স্পষ্টবাদী। যা ভাববো মুখের ওপর বলে দেব। কোন কথা মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারি না। ম্যাক্সিম কিন্তু একেবারে অন্য রকম। খুব চাপা ও শান্ত প্রকৃতির। তার মনের খবর জানা এক রকম অসম্ভব। আমি একটুতেই হঠাৎ রেগে উঠি, তারপর কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সেই রাগ জল হয়ে যায়। আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু ম্যাক্সিম বছরে একবার কি দু'বার হয়তো রাগ করবে। তখন সে এক ভীষণ ব্যাপার! কিন্তু মনে হয় তোমার সাথে কোনদিন সে ওরকম রাগ করবে না। তুমি যা ছেলে মানুষ আর শান্ত প্রকৃতির মেয়ে! সত্যি, ভারি শান্ত মেয়ে তুমি!' একটু হেসে সে আমার হাতে চাপ দিল। 'শান্ত' শব্দটা শুনতেও কত ভাল লাগে। কত শান্তি যেন এই একটি শব্দের মধ্যে। ধীর, স্থির, শান্ত মূর্তিতে একমনে বোনার কাজ করে যাওয়া, কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, অনিশ্চয়তা নেই, সন্দেহ নেই — এমনি একটি চেহারা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো। কিন্তু সে তো আমি নই! আমার মত ভীরু, সংকুচিত, দিশাহারা মেয়ের জীবনে এই 'শান্ত' শব্দের কোন অর্থ নেই!

'কিছু মনে করবে না তো? তাহলে একটা কথা বলি। তোমার চুল এত সোজা কেন? কোঁকড়ানো করে নাও না! দেখি, কানের ওপাশে চুলগুলো একটু সরিয়ে দাও তো।' বিয়েট্রিস বললো। আমি তার কথা মত তাই করলাম। সে আমার দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'না, ভাল দেখাচ্ছে না তো! তোমাকে এরকম মানায় না দেখছি। তোমার চুলগুলো ঠিক যেন যোয়ান অব আর্কের

চুলের মত, তাই না? আচ্ছা, ম্যাক্সিম কি বলে? তোমাকে এরকম সোজা চুলে মানায় কি না সে বলেনি কিছু?'

'না। এ বিষয়ে কোনদিন সে কিছু বলেনি।'

'ও। তাহলে বোধ হয় তার এরকমই ভাল লাগে। আচ্ছা, লণ্ডন কি প্যারিস থেকে পোশাক করিয়ে আননি?'

'না, সময় ছিল না। ম্যাক্সিম তখন এখানে ফিরবার জন্য ব্যস্ত ছিল।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় পোশাক পরিচ্ছদের দিকে তোমার বিশেষ লক্ষ্য নেই।'

আমি আমার সাধারণ পোশাকের দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে বললাম, 'আমি সুন্দর পোশাক পরতে খুব ভালবাসি। কিন্তু এজন্য খরচ করবার মত সম্বল আমার কোনদিনই ছিল না।'

'আরও কিছুদিন লণ্ডনে থেকে কয়েকটি সুন্দর ও দামী পোশাক তোমাকে করিয়ে দেওয়া তার উচিত ছিল। না করিয়ে দিয়ে সে খুব অন্যায় করেছে এ আমি বলবোই। এটা তার স্বভাবও নয় কিন্তু। এসব ব্যাপারে তার যে খুব লক্ষ্য।'

'তাই নাকি! কিন্তু আমি কি পরি না পরি সেদিকে তো একদিনও সে লক্ষ্য করেনি। কিছু বলেও নি।'

'ও, তাহলে সে অনেক বদলে গেছে।' বিয়েট্রিস এবার আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালো। জেসপারকে শিস দিয়ে ডাকলো। তারপর ম্যাণ্ডারলের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা তাহলে পশ্চিম মহল ব্যবহার করছো না?'

'না। আমরা পূব মহলে আছি। পূব মহলকে নূতন করে সাজানো হয়েছে।'

'তাই বুঝি! আমি তা জানতাম না। কিন্তু কেন বলতো?'

'ম্যাক্সিমের তাই ইচ্ছে।'

এর উত্তরে আর কিছু না বলে সে আপন মনে শিস দিতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, 'ডানভারসকে তোমার কেমন লাগছে ?'

আমি নিচু হয়ে জেসপারকে আদর করতে করতে ক্ষীণস্বরে বললাম, 'তার সাথে আমার বেশি দেখা হয় না। কিন্তু তাকে সত্যি কেমন অদ্ভুত লাগে আমার। কেমন ভয়ও করে।' জেসপার তার বড় বড় সরল চোখ দু'টো তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তার নরম মাথার ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

'তাকে ভয় পেও না। সে যেন তোমার এই মনোভাব বুঝতে না পারে।' আমি চুপ করে রইলাম, বিয়েট্রিস বলে চলেছে, 'আচ্ছা, তোমার প্রতি তার ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ তো ?'

'না, তেমন নয়।'

'তা যাক গে। যতটুকু না রাখলে নয় তার বেশি সম্পর্ক রাখবে না তার সঙ্গে।'

'সে তো বাড়ির সব ব্যাপারেই দেখাশুনো করছে। ওসব বিষয়ে আমি কোনদিন কিছু বলবো না।'

'বললেও সে কিছু মনে করবে না।'

কাল সন্ধ্যেবেলায় ম্যাক্সিমও ঠিক এই কথাই বলেছিল। আশ্চর্য, ভাইবোনের একই রকম মতামত এ ব্যাপারে! আমার কিন্তু সর্বদাই মনে হয় আমি তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে গেলে সে কখনই তা সহ্য করবে না। বিয়েট্রিস আবার বললো, 'মনে হয় সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম তোমার অসুবিধা হবে। ডানভারস একটু হিংসুটে, তাই আমারও প্রথম থেকে এই আশঙ্কাই ছিল।'

'কেন সে আমাকে হিংসে করবে ? ম্যাক্সিম তো তাকে বিশেষ পছন্দ করে বলে মনে হয় না।' আমার স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

'নাঃ, তুমি একেবারে ছেলে মানুষ। সে ম্যাক্সিমের কথা ভাবছে না। সে তাকে সম্মান করে এই পর্যন্তই।' একটু হেসে সে আবার বলতে লাগলো, 'তুমি এখানে এসেছ বলেই সে তোমার ওপর বিরক্ত।'

'কেন? আমি কি করেছি তার?'

'আমি ভেবেছি তুমি জান। ম্যাক্সিম তোমাকে কিছুই বলেনি তাহলে?' আবার কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিয়েট্রিস বললো, 'রেবেকাকে সে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতো, অদ্ভুতভাবে ভক্তি করতো।'

'ও।'

আমরা দু'জনে কতক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর সে বলে উঠলো, 'এই যে ওরাও এসে গেছে। এসো, আমরা সবাই বাদাম গাছের তলায় বসি গিয়ে। দেখ, গাইলসকে ম্যাক্সিমের পাশে কি রকম মোটা দেখাচ্ছে! ফ্র্যাঙ্ক বুঝি এখনি চলে যাবে। জান, এই মানুষটি বড় সহজ, সরল আর শান্ত প্রকৃতির। এই যে, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছো বলতো? জগত সংসারের সকল সমস্যার সমাধান করে ফেললে বোধহয়?' প্রাণখোলা হাসি হেসে বিয়েট্রিস তাদের দিকে এগিয়ে গেল। গাইলস একটি গাছের ডাল জেসপারের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ক্রলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে এখনি যেতে হবে। মিসেস ডি উইণ্টার আজকের দিনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' 'আবার আসবেন,' একটু হেসে বললাম। ওরা দু'জনও এখন যাবে কিনা কে জানে! আমার মন চাইছে ওরাও এখন চলে যাক। ম্যাক্সিমের সাথে আমি আবার একলা থাকতে চাই। সে আর আমি, শুধু দু'জন!

আমরা এবার বাদাম গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। রবার্ট চেয়ার আর কম্বল এনে দিল। গাইলস লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে সুরু করলেন।

'আঃ! গাইলস, চুপ কর।' বিয়েট্রিস ধমকে উঠলো। একবার একটু চোখ খুলে গাইলস আবার চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে বললেন, 'আমি ঘুমুচ্ছি না তো।' এই ভদ্রলোককে আমার একান্তই সাধারণ বলে মনে হোল। বিয়েট্রিস কেন এঁকে বিয়ে করেছে ভেবে অবাক হয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই ভালবেসে বিয়ে করেনি! হয়তো বিয়েট্রিসও আমার সম্বন্ধে এ কথাই ভাবছে। মাঝে মাঝে সে আমার দিকে কেমন অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল। মনে হোল সেও বুঝি ভাবছে, ম্যাক্সিম এই মেয়েটির মধ্যে কি দেখলো? কিন্তু তবুও তার সেই দৃষ্টিতে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির ইঙ্গিতও ছিল! তখন তারা ভাই বোনে তাদের দিদিমার গল্প করছিল।

'তাঁকে একবার দেখে আসা দরকার, কি বল?' ম্যাক্সিম বিয়েট্রিসকে বলছিল।

'হাঁ। দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। আজকাল নাকি বেচারা কিছু খেতেও পারছেন না।' আমি ম্যাক্সিমের খুব কাছে বসে তাদের কথা শুনছিলাম। সে অন্য মনে আমার হাতের ওপর আস্তে আস্তে তার হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল! সহসা আমার মনে হোল ঠিক এমনি ভাবে আমিও তো জেসপারকে আদর করি! জেসপার যেমন আমার গা ঘেঁষে বসে থাকে আমিও ঠিক তেমনি তার একান্ত কাছটিতে বসে আছি। যখন ইচ্ছা হচ্ছে আনমনে সে আমাকে আদর করছে যেমনটি আমিও জেসপারকে করে থাকি। নিজেকে হঠাৎ কেন ওই কুকুরটার মতই নগণ্য, অসহায় মনে হচ্ছে! এ সব কি ভাবছি আমি!

বাতাস পড়ে গেছে। অলস, শান্ত অপরাহ্ন। শূন্য মনে বসে আছি সামনের দিকে দৃষ্টিকে মেলে দিয়ে। আঙিনার সবুজ, নরম ঘাসগুলোকে সমান করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। একটা স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি ঘাসের বুক থেকে। চেয়ে চেয়ে দেখছি একটা মৌমাছি গাইলসের মাথার

ওপর ভন্‌ভন্‌ করছে আর তিনি তাঁর টুপি দিয়ে সেটাকে তাড়া করছেন। জেসপার এসে আবার আমার পাশটিতে বসলো। পড়ন্তরোদের ঝাঁঝে তার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। বাড়ির জানালা গুলির কাঁচে রোদ ঝিকমিক করছে। একটা চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে এঁকে বেঁকে। প্রতিদিনকার নিয়ম মত এতক্ষণে হয়তো লাইব্রেরি ঘরে চুল্লি জ্বালানো হয়েছে। আঙ্গিনা পার হয়ে একটি থ্রাশ পাখি খাবার ঘরের জানালার বাইরে ম্যাগনোলিয়া গাছের ওপর গিয়ে বসলো। এখান থেকেই ম্যাগনোলিয়ার মৃদু মধুর সুবাস পাচ্ছি, চারিধার কী শান্ত স্থির! সাগরের মৃদু কল্লোলও অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বহুদূর থেকে ভেসে আসা গানের সুরের মতো! কিছুক্ষণ আগেকার অশান্ত সাগরও এখন ঝিমিয়ে পড়েছে বুঝি। ভ্রমরটা আবার আমাদের মাথার ওপর গুনগুনিয়ে উঠলো, হয়তো বাদাম ফুলের কুঁড়ির সাথে মিতালী পাতাবে বলে! এ ভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে থাকতে ভাবছিলাম ম্যাণ্ডারলের জীবনকে আমি আমার কল্পনার অনুভাবনায় এ ভাবেই বুঝি পেয়েছিলাম! এই সুন্দর মুহূর্তটিকে আমার অনুভবের মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দী করে যদি রাখতে পারতাম!

আমরা সবাই এখন কি একটা শান্তির ছোঁয়ায় তন্দ্রাবেশে বিভোর হয়ে আছি। কিন্তু ওই ভ্রমরটির মতই এমন সুন্দর, স্বপ্নময় পরিবেশ কোথায় যাবে মিলিয়ে বুঝি এখনই, এই মুহূর্তে। আসবে আগামী কাল, আরও একটি দিন, আরও মাস, আরও কত বছর। বছরের পর বছর আসবে! আমরাও কত বদলে যাব হয়তো, ঠিক এমন মন নিয়ে এমনভাবে আর কোনদিন কি এখানে বসবো! আমাদের মধ্যে কে কোথায় চলে যাবে। অনাগত, অনিশ্চিত ভবিষ্যত পড়ে আছে আমাদের জীবনের সামনে। যা চাইবো, যা ভাববো, কোনদিন হয়তো তা পাব না। এই যে এই পরম ক্ষণটিতে আমি আর ম্যাক্সিম বসে আছি পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে, অতীত বা ভবিষ্যত এখন লুপ্ত হয়ে গেছে আমাদের জীবন

থেকে। আমাদের এই বর্তমান কত মধুর, কত ভাবনাহীন! আমার মত করে ম্যাক্সিম এ সব ভাবছে না তাও জানি। তার কাছে এই মুহূর্তটির কিই বা মূল্য! তারা ভাইবোনে কত কি কথা বলে যাচ্ছিল। দুপুরে খাবার পর অন্য যে কোন দিনের গতানুগতিক একটি অপরাহ্নের মতই আজকের এই ক্ষণটি এসেছে তাদের জীবনে! তাই তারা আমার মতন করে এই মুহূর্তটিকে চিরতরে মনে রাখতে চায় না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা তো আমার মত ভীত, ত্রস্ত নয়!

'এখন আমাদের যাওয়া দরকার।' বিয়েট্রিস উঠে গায়ের ঘাস ঝাড়তে ঝাড়তে বললো। গাইলস তাঁর টুপির ধুলো ঝাড়তে লাগলেন, ম্যাক্সিম আলস্য ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি তার রঙ গেছে বদলে। সজল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।

'বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে।' ম্যাক্সিম বললো।

'বৃষ্টি আসবে নাকি?' গাইলস আপনমনে বললেন। বিয়েট্রিস চলতে চলতে বললো, 'দিনটা আজ বেশ কাটলো।'

আমরা সবাই গাড়ি চলার পথ দিয়ে তাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ ম্যাক্সিম বলে উঠলো, 'পূব মহলটা কেমন সাজানো হয়েছে দেখলে না তো!'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবছিলাম এই বাড়িতেই বিয়েট্রিস কত বছর কাটিয়েছে! আশ্চর্য মনে হয় কিন্তু। ছোট বেলায় তার নার্সের সাথে সাথে সে এই সিঁড়িগুলি দিয়েই নেচে নেচে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে, নেমেছে কতবার! এখানেই তো সে জন্মেছে, বড় হয়েছে! ম্যাণ্ডারলের সাথে আমার চাইতেও তার সম্পর্ক অনেক গভীর। না জানি তার মনের একান্তে এখানকার কতশত স্মৃতি জমে আছে! আজ তার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে মনে পড়ে কি ফেলে আসা সে সব

দিনের কথা, যখন ছোট্ট একটি ফুর্‌ফুরে মেয়ে ছিল সে! আজকের সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন ধারায় হারিয়ে যাওয়া তার সেই ছেলেবেলার হালকা দিনগুলি কি কখনও উঁকি মারে তার মনে! কে জানে! হঠাৎ দেখি আমরা পূব মহলে এসে পড়েছি। গাইলস দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাঃ ভারি সুন্দর তো! একেবারে রূপ বদলে গেছে যে! তাই না বী?'

'হাঁ সব কিছু নূতন দেখছি। আচ্ছা গাইলস, মনে পড়ে যেবার তোমার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল সেবার আমরা এ ঘরেই ছিলাম? তখন কিন্তু এত সুন্দর ছিল না ঘরটা। এখন ভারি সুন্দর হয়েছে ঘরখানি! সব সময় গোলাপ-বাগান দেখতে পাবে, কি মজা! হাঁ, তোমরা এগোও, আমি আসছি।' ম্যাক্সিম আর গাইলস নিচে নেমে গেল। বিয়েট্রিস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে মন দিল।

'এ সব ডানভারস বুঝি গুছিয়ে রেখেছে?'

'হাঁ।'

'হাঁ, এ সব বিষয়ে সে সব জানে। খুব দামী মনে হচ্ছে এই পাউডারের প্যাকেটটা। বাঃ ভারি সুন্দর ব্রাশ দু'টো তো! বিয়ের উপহার বুঝি?'

'ম্যাক্সিম দিয়েছে।'

'তাই নাকি? বেশ সুন্দর কিন্তু। তোমাকে আমাদেরও তো কিছু দেওয়া উচিত। কি চাও বল।'

'ও সব তোমায় ভাবতে হবে না।'

'তা কেন? তোমাদের বিয়েতে আমাদের না যেতে বললেও উপহার একটা আমি দেবই।'

'কিছু মনে কোরনা সেজন্য। ম্যাক্সিমের খুশিমত বিয়েটা বিদেশে হয়েছে বলেই তোমাদের যেতে বলা হয়ে ওঠেনি।'

'না, তা নয়। আসল কথা হোল'—কথার মাঝখানে সে হঠাৎ থেমে গেল। তার হাত থেকে ব্যাগটা মেঝেয় ফসকে পড়ে গেল।

'আঃ, ব্যাগটা বুঝি গেল। না, ঠিকই আছে দেখছি। ও হাঁ, কি যেন বলছিলাম তোমাকে? ভুলে যাচ্ছি—হাঁ, বিয়ের উপহারের কথা হচ্ছিল। তুমি তো মণিমুক্তোর অলংকার আবার পছন্দ কর না মনে হচ্ছে।' আমি কোন উত্তর দিলাম না। সে আবার বললো, 'তোমরা দু'জনেই একেবারে অন্য রকম।' ড্রেসিং টেবিল থেকে এবার সে উঠে দাঁড়ালো। 'এখানে এখন অতিথি অভ্যাগত কেউ আসবে নাকি? শুনেছ কিছু?'

'না। ম্যাক্সিম কিছু বলেনি তো।'

'তাকে বোঝা ভার। ভারি অদ্ভুত ছেলে!' একটু চুপ করে থেকে আমার হাতের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে সে বললো, 'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না, শিকার করতেও জান না ভেবে তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, ভাবনাও হচ্ছে। আচ্ছা, নৌকো বাইতে জান?'

'না।'

'যাক, এজন্য ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ।' সে এবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। 'ইচ্ছে হলেই আমাদের কাছে চলে যেও, কেমন?'

'নিশ্চয় যাব।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম তারা হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

'তাড়াতাড়ি চলে এসো বী।' গাইলস ব্যস্ত স্বরে বলে উঠলেন, 'দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে যে!' বিয়েট্রিস আমার হাত ধরে নিচু হয়ে আমার গালে আদর করে টোকা দিয়ে বললো, 'আচ্ছা আজ তাহলে আসি ভাই। তোমাকে অবান্তর কত কথা বলেছি। সব ভুলে যেও কিন্তু। আমার ওপর রাগ কোর না যেন।' কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আমার

চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো, 'আমি যা ভেবেছিলাম তুমি তার একেবারে উল্টো!' তারপর গাড়ির দিকে যেতে যেতে আবার ফিস-ফিসিয়ে বললো, 'সত্যি, তুমি রেবেকার সম্পূর্ণ বিপরীত।'

তারা গাড়িতে উঠে বসলো। আমরা দু'জনে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

মেঘের আড়ালে সূর্য তখন মুখ লুকিয়েছে। একটু একটু বৃষ্টিও পড়ছে! রবার্ট দৌড়ে এসে চেয়ারগুলো তুলছে।

॥ ১০ ॥

গাড়ি চলার পথটি দিয়ে তাদের গাড়ি এক লহমায় উধাও হয়ে গেল। তারপর ম্যাক্সিম আমার হাত ধরে বললো, 'যাক, বাঁচা গেল। শিগগীর একটা কোট পরে এসো। বৃষ্টি হোক, আমি এখন একটু বেড়াতে চাই। এ ভাবে বসে থাকা আর ভাল লাগছে না।' তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাকে খুব ক্লান্ত, বিবর্ণ দেখাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবলাম তার নিজের বোন ও বোনের স্বামীর সাথে সময় কাটিয়ে কেন সে এত ক্লান্তি বোধ করছে!

'ওপরে গিয়ে কোট নিয়ে আসছি।' 'ফুল ঘরে অনেকগুলো বর্ষাতি আছে, তারই একটা নিয়ে এসো। এখন ওপরে গেলে অনেক দেরি হবে আসতে। অন্তত আধঘণ্টা সময় তো লাগবেই।' একটু থেমে আবার সে জোরে বলে উঠলো, 'রবার্ট, ফুলঘর থেকে মিসেস ডি উইণ্টারের জন্য একটা বর্ষাতি নিয়ে এসো তো তাড়াতাড়ি—'

তারপর সে পথের ওপর গিয়ে জেসপারকে ডাকতে লাগলো, 'জেসপার আয়, আয়। বেড়াতে যাচ্ছি আমরা।' জেসপার কোথা থেকে তখনি ছুটে এলো আনন্দে, লেজ নেড়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে।

'আঃ চুপ কর! রবার্ট এতক্ষণ কি করছে?' রবার্ট একটি বর্ষাতি নিয়ে দৌড়ে এলো! আমিও তাড়াতাড়ি সেটার মধ্যে নিজেকে গলিয়ে দিলাম। বর্ষাতিটা খুব বড় ও লম্বা। কিন্তু তখন আর সেটা বদলাবার সময় নেই। আঙ্গিনা পেরিয়ে আমরা বনের দিকে এগোলাম। জেসপার আমাদের সামনে সামনে চলতে লাগলো।

'বিয়েট্রিস খুব ভাল মেয়ে। তবে মাঝে মাঝে আবোল তাবোল কথা বলা তার স্বভাব।' ম্যাক্সিম বললো।

বিয়েট্রিস কোন্ কথাটা আবোল তাবোল বলেছে বুঝতে পারলাম না। সে প্রশ্নও তাকে করবো না। হয়তো তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিয়েট্রিসের মতামত তাকে রাগিয়ে দিয়েছিল। ম্যাক্সিম আবার বললো, 'তাকে তোমার কেমন লাগলো?'

'খুব ভাল লেগেছে। আমার সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে।'

'খাবার পর বাইরে এসে সে তোমাকে কি বলেছে?'

'তেমন কিছু নয়। আমিই তখন বেশি কথা বলেছি। আমি তাকে মিসেস ভ্যানহপারের কথা, তোমার আমার প্রথম দেখা হওয়ার কথা বলছিলাম। সে শুধু বলেছে আমার সম্বন্ধে সে যা ভেবেছিল আমি নাকি তার উল্টো।'

'কি ভেবেছিল সে?'

'আরও চালাক চতুর, আরও কায়দা দুরস্ত একটি অতি আধুনিকা মেয়েকে দেখবে ভেবেছিল। তার ভাষায় বর্তমান সমাজের অতি আধুনিকা একটি রঙীন প্রজাপতি।'

ম্যাক্সিম এবার কোন কথা বললো না। নিচু হয়ে জেসপারের দিকে একটি ডাল ছুঁড়ে দিল। তারপর কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠলো, 'বী মাঝে মাঝে একেবারে বোকার মত কথা বলে।'

এবার আমরা ম্যাণ্ডারলের বনের মধ্যে ঢুকছি। গাছগুলি গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিক আঁধার। গাছের তলায় স্তরে স্তরে জমানো ঝরা পাতার সুগন্ধ-ঘন আস্তরণের ওপর দিয়ে আমরা চলেছি। এদিক ওদিকে কত পরগাছার নূতন সবুজ মাথা উঁকি দিচ্ছে, ব্লুবেলের নূতন পল্লবে কুঁড়িরা ফুটি ফুটি করছে। জেসপার আর ডাকছে না, মাটিতে নাক দিয়ে কি শুঁকে শুঁকে সে চলেছে। আমি ম্যাক্সিমের একান্ত কাছ ঘেঁষে তার হাতখানি ধরলাম।

'আচ্ছা আমার চুল তোমার ভাল লাগে?' সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

'তোমার চুল! নিশ্চয় ভাল লাগে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'এমনি।'

'এমনিই! আশ্চর্য তো!'

বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় আমরা এসে গেছি। দু'টো পথ দু'দিকে চলে গেছে। জেসপার ডান দিকের পথ দিয়ে চললো।

'ও পথে নয় জেসপার। চলে আয়' কুকুরটা একটু থেমে লেজ নাড়তে নাড়তে আমাদের দিকে তাকালো, কিন্তু ফিরে এলো না।

'জেসপার ও পথে যাচ্ছে কেন?'

'বোধ হয় এটাই ওর অভ্যেস। এই জেসপার, এ দিকে আয়।' আমরা বাঁ দিকের পথ দিয়ে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ফিরে দেখি জেসপার আমাদের পেছন পেছন আসছে।

'এই পথ আমাদের উপত্যকার দিকে নিয়ে যাবে, যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। এখনি এজেলিয়ার গন্ধ পাবে। বৃষ্টি পড়লেও

তার গন্ধ ঠিক ভেসে আসবেই।' এবার তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। আগের বিরক্তিভাব আর নেই। ম্যাক্সিমের এই সহজ রূপ আমি বুঝতে পারি, বড় ভালও বাসি। এবার সে ফ্র্যাঙ্ক ক্রলের কথা বলতে লাগলো। ক্রলে কত ভাল ও কাজের লোক, ম্যাণ্ডারলেকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ক্রলে তার সত্যিকারের বন্ধু।

আবার যেন আমরা ইতালী, ভেনিসের জীবন ফিরে পেয়েছি। তার চোখের সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর নেই। খুশি মনে সে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। আমিও হেসে হেসে তার কথায় সায় দিচ্ছি। কিন্তু আমার মন তখন অবাক হয়ে একটা কথাই শুধু ভাবছিল। বিয়েট্রিসদের উপস্থিতি কেন তাকে অত ক্লান্ত করে তুলেছিল! বিয়েট্রিস তার মেজাজের কথাও বলছিল। বছরে একবার কি দু'বার নাকি ম্যাক্সিম তার মেজাজ হারিয়ে ফেলে। তখন সে এক ভীষণ ব্যাপার। বিয়েট্রিস তাকে জানে, সে তার বোন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তো অন্যরকম। ম্যাক্সিমের অপ্রসন্নতা, রাগ আমিও তো কতবার দেখেছি। কিন্তু বিয়েট্রিস যে ইঙ্গিত করেছে তার পরিচয় তো একদিনও পাইনি আজ অবধি। ম্যাক্সিম হঠাৎ বলে উঠলো, 'ঐ যে, ওদিকে তাকিয়ে দেখ!'

তাকিয়ে দেখি আমরা একটা পাহাড়ের সামনে ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট্ট একটি ঝরণা তর্‌তর্ করে নেমে গেছে। তারই পাশ ঘেঁষে ক্ষীণ পথ-রেখা উপত্যকার দিকে নেমে এসেছে। এখানকার গাছগুলো জড়াজড়ি করে ঘন অরণ্যের সৃষ্টি করেনি, দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষীণ পথ-রেখাটির দু'পাশ দিয়ে এজেলিয়া আর রডোডেনড্রন গাছেরা সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ম্যাণ্ডারলের গাড়ি চলার পথের দু'ধারে যে রকম বিশালকায় রক্তমুখী রডোডেনড্রন দেখেছি এগুলো তো তেমনটি নয়। শাদা ও স্বর্ণাভ রঙের এজেলিয়া আর রডোডেনড্রন ফুলেরা যেন সৌন্দর্য ও লাবণ্যের পূর্ণ প্রতীক হয়ে ঝিরঝিরে

এই বৃষ্টির স্নেহ-স্পর্শে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার বাতাস তাদের মদির, মধুর সুবাসে মাতাল হয়ে আছে যেন। আমার মনে হোল এই সুগন্ধ ঝরণার জল, বৃষ্টির জল আর আমাদের পায়ের তলার কোমল সবুজ দুর্বাদলের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে!

চারিদিক নিস্তব্ধ, নিথর। ঝরণার কুলু কুলু সুর, বৃষ্টির টুপটাপ মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ম্যাক্সিম শান্ত, নিচু স্বরে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে, সেও বুঝি এমন নিরালা, সুন্দর পরিবেশের এই প্রশান্তি নষ্ট করতে চায় না।

'একেই আমরা হ্যাপিভ্যালি বলি।' আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি ফুলগুলির সুন্দর, শুভ্র মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। ম্যাক্সিম নিচু হয়ে মাটির বুক থেকে একটি ঝরা পাপড়ি তুলে নিয়ে আমার হাতে দিল। পাপড়িটা ছেঁড়া বিবর্ণ। কিন্তু হাতের মুঠোয় নিয়ে সেটাকে একটু ঘষতেই তীব্র মদির সুগন্ধ আমার নাকে গেল। কাছেই কোথায় কোকিল গান গেয়ে উঠলো। তার মিষ্টি মধুর তান ঝরণার কুলুকুলু সুরের সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর ম্যাণ্ডারলের অরণ্য থেকে তারই কোন সাথী তার সুরের সাথে সুর মিলালো। এতক্ষণকার নিথর নিঝুম পরিবেশ এক নিমেষে তাদের মিষ্টি মধুর সুর লহরীতে ভরে উঠলো। আমরা উপত্যকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এজেলিয়ার মদির গন্ধও আমাদের অনুসরণ করে চললো। এ যেন কোন রূপকথার রাজ্যে আমরা চলে এসেছি! কী এক মধুর স্বপ্ন দিয়ে, মায়া দিয়ে ঘেরা চারিধার! কোন জায়গা এত অপূর্ব হতে পারে আমি তা কল্পনাতেও ভাবিনি কোন দিন! আকাশ তখন মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। ঝরণা ধারার একটা সুর বৃষ্টির জল আর পাখির গানের সুরের সঙ্গে মিলে প্রাণ মাতানো এক সুরজালের সৃষ্টি করেছে আকাশে বাতাসে।……

চলতে চলতে পথের ছ'ধারে এজেলিয়ার নত পল্লব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি। এজেলিয়ার ভিজে নরম পাপড়ির বুক থেকে আমার হাতে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো টুপটাপ করে। আমার পায়ের তলায় কত ঝরা পাপড়ি সেই মদির গন্ধ বুকে নিয়ে ভিজে নরম ঘাসের সবুজ বিছানায় শুয়ে আছে। আমি তার হাত আরও শক্ত করে ধরেছি। একটিও কথা না বলে আমরা চলেছি। হ্যাপিভ্যালির মায়ামন্ত্র আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই জায়গাটিই হোল ম্যাণ্ডারলের অন্তস্তল, যে ম্যাণ্ডারলেকে আমি জানবো, ভালবাসতে শিখবো। এখানে আসবার প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতা, সেই গভীর অরণ্য, দৈত্যের মতন উদ্ধত রক্তিম রডোডেনড্রনের স্মৃতি যেন অস্পষ্ট হয়ে এলো! প্রাসাদোপম সেই বাড়িটি, বিরাট হলঘর, পশ্চিম মহলের অসোয়াস্তিকর সেই নীরবতা—সবই যেন কেমন ম্লান হয়ে এলো আমার স্মরণে। সেখানে যেন আমার অনধিকার প্রবেশ, সেখানকার কোন কিছুতেই নেই আমার এতটুকুও সত্ব; কিন্তু এখানে তা নয়! এখানে আমার অবাধ অধিকার!

আমরা পথের শেষে এসে পড়েছি। আমাদের মাথার ওপর ফুলগুলি তোরণের সৃষ্টি করেছে। তাই মাথা নিচু করে যেতে লাগলাম। তারপর যখন আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার চুল থেকে বৃষ্টির জলের ফোঁটা ঝাড়ছিলাম তখন তাকিয়ে দেখি সেই সুন্দর উপত্যকা কখন আমাদের পেছনে চলে গেছে। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি উপসাগরের কোলে, সাগরের ঢেউ যেখানে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে কি এক অব্যক্ত আকুলতায়। ম্যাক্সিম আমার চোখে মুখে বিস্ময়ের আভাস দেখে একটু হাসলো। তারপর বললো, 'খুব আশ্চর্য, নয়? সত্যি, এরকম কেউ আশা করে না। পরিবর্তনটা এত আকস্মিক যে চমকে উঠতে হয়!' একটি নুড়ি তুলে সে বেলাভূমির দিকে ছুঁড়ে মারলো। জেসপার সেদিক পানে ছুটে গেল। তার লম্বা, কালো কান ছ'টো বাতাসের ঝাপটায়

ঝটপট করতে লাগলো পাখির ডানার মতন। আমার এতক্ষণকার স্বপ্ন-কুহেলি ভেঙ্গে গেল এক নিমেষে! আবার আমরা বাস্তবে ফিরে এসেছি। সাগরের বালুচরে দু'জনে দাঁড়িয়ে সাগর জলে কত নুড়ি ছুঁড়লাম। সাগরের একেবারে কাছটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। উপসাগরের কোল ঘেঁষে সাগর-জল খেলা করছে। ছোট ছোট টিলার পাথরের গায়ে ঢেউ এসে কেবলই ধাক্কা দিচ্ছে। আমরা দু'জনে ভেসে যাওয়া একটা কাঠের গুঁড়িকে টেনে এনে সাগর বেলায় ফেললাম। বাতাসে উড়ে আসা চুল চোখের ওপর থেকে সরিয়ে ম্যাক্সিম ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলো আমার দিকে চেয়ে।

সহসা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি জেসপার নেই। দু'জনে কত ডাকলাম। কিন্তু কোথায় সে! আমি উপসাগরের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালাম।

'না, ওদিকে গেলে দেখতে পেতাম। ভয় পেওনা, ওটা সাগরে পড়ে যায়নি। জেসপার, জেসপার, কোথায় গেলি? আয়, আয়।'

'হয়তো আবার হ্যাপিভ্যালির দিকে গেছে।'

'একটু আগেও তো একটা মড়া গাং চিলের আশে পাশে গন্ধ শুঁকছিল!' আমরা আবার উপত্যকার দিকে এগোতে লাগলাম। 'জেসপার, জেসপার,' ম্যাক্সিম কত ডাকাডাকি করলো। একটু পরে বেলাভূমির ডান দিকের টিলার ওপার থেকে জেসপারের অস্পষ্ট স্বর ভেসে এলো।

'শুনছ? ওই পথে উঠে গেছে।'

যেদিক থেকে জেসপারের ডাক ভেসে এলো সেদিকে যাবার জন্য আমিও সেই পিছল টিলার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম।

'ফিরে এসো। কুকুরটা নিজেই ফিরে আসতে পারবে।' ম্যাক্সিম বিরক্তিভরে বলে উঠলো। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'হয়তো পড়ে গেছে। বেচারাকে নিয়ে আসি।' জেসপার আবার চীৎকার করে উঠলো।

'ঐ শোন। আমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা, সাগরের ঢেউ ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না তো ?'

ম্যাক্সিম এবার রাগত স্বরে বলে উঠলো, 'ওর কিছু হয়নি। পথ চিনে বেশ ফিরে আসতে পারবে। তুমি চলে এসো।' আমি তার কথা না শোনবার ভান করে পাহাড়ের অসমান পথ বেয়ে একটু একটু করে উঠে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় এক একটি পাথর পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। আমি সেই ভিজে পাহাড়ের অসমতল গা দিয়ে পড়তে পড়তে হোচট খেতে খেতে উঠছি। জেসপারকে এখানে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া নিষ্ঠুর মনের পরিচয়। তাই ম্যাক্সিমের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। এখনি আবার সাগরে বান আসবে। আরও খানিকটা উঠে একটা প্রকাণ্ড শিলার পেছনে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম ওদিককার মত এখানেও সাগরের আর একটি বাঁক আরও বড়, আরও গোলাকার। সেই বাঁকের মুখে আড়াআড়ি ভাবে পাথরের বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তার ওদিকে একটা স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে। কোন নৌকো নেই, কেবল একটা বয়া বাঁধা রয়েছে। এখানকার বালুচর যেন সহসা খুব খাড়া থেকে ঢালু হয়ে সাগরের দিকে নেমে গেছে। বালুচরে সাগরের শেষ সীমায় যেখানটায় রাজ্যের যত আগাছা বেড়ে উঠেছে তারই ডান পাশ দিয়ে ম্যাণ্ডারলের অরণ্য এগিয়ে এসে টিলাগুলিকে দখল করে নিয়েছে। সেই অরণ্যের শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা, নিচু কুটির, অনেকটা হাউস বোটের মত। পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে তরতর করে নেমে এলাম। সাগর বেলায় একটি লোক দাঁড়িয়েছিল, বোধহয় জেলে। জেসপার তারই চারপাশে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করছিল। লোকটির কিন্তু তাতে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তখন নিচু হয়ে বালু খুঁড়ছিল।

'জেসপার, জেসপার এদিকে এসো।' জেসপার লেজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে একবার তাকালো, কিন্তু এলো না। একটানা ঘেউ ঘেউ করে চললো। পেছন ফিরে একবার তাকালাম ম্যাক্সিম আসছে কিনা দেখতে। না, তাকে দেখতে পেলাম না। তারপর লোকটির দিকে এগিয়ে গেলাম। পায়ের শব্দে সে আমার দিকে ফিরে তাকালো। তার ছোট ছোট সরল চোখ দু'টিতে কেমন যেন নির্বোধ দৃষ্টি! মুখখানি লাল, ভিজে ভিজে। আমাকে দেখে সে হাসলো। দু'চোখে কৌতূহল ভরে আমাকে সে দেখছিল। মুখে কিন্তু হাসির রেশটুকু লেগেই আছে।

'আমি এখানে ঝিনুক খুঁজছি। সকাল থেকে খুঁজছি। কিন্তু একটাও পেলাম না।'

'ও। একটাও ঝিনুক পাওনি! তাহলে তো ভারি দুঃখের কথা।'

'হাঁ। এখানে ঝিনুক নেই।'

'জেসপার, চলে এসো।' জেসপারের মেজাজ তখন খুব গরম। বোধ হয় সাগরের পাগলা হাওয়া তাকে অকারণ ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। আমার কাছে না এসে সে বোকার মত চেঁচাতে চেঁচাতে বালুচরের এদিক থেকে ওদিকে ছুটাছুটি করছে। বুঝলাম এখন সে আমার কোন কথা শুনবে না। লোকটি আবার একমনে বালু খুঁড়ে চলেছে। আমি তার দিকে চেয়ে বললাম, 'তোমার কাছে একটু দড়ি আছে?'

'এখানে ঝিনুক নেই। সেই সকাল থেকেই তো খুঁড়ছি।' সে মাথা নেড়ে আপন মনে বিড় বিড় করে বললো। তার নিষ্প্রভ, নীল চোখ দু'টো একবার হাত দিয়ে মুছে নিল।

'কুকুরটাকে বাঁধবার জন্য একটা কিছু চাই। ওটা যেতে চায় না যে।' আমি আবার বললাম।

'এ্যা?' সে আবার সেই ফোঁকলা নির্বোধ হাসি হাসলো। তারপর একটু ঝুঁকে বললো, 'কুকুরটাকে আমি চিনি। ঐ বাড়ি থেকে আসে।'

'হাঁ। ওকে এখন আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'আপনার কুকুর নয় ওটা।'

'মিঃ ডি উইণ্টারের কুকুর। ওকে এখন বাড়ি নিয়ে যাব।' আবার সে আনমনা হয়ে গেছে। আমি জেসপারকে ডাকতে লাগলাম। তখন সে হাওয়ায় উড়ে যাওয়া একটি পালকের পেছন পেছন ছুটছিল। বোট হাউসে হয়তো একটু দড়ি পেতে পারি এই ভেবে সেদিকে চললাম। কুটিরের কাছে গিয়ে দেখলাম এককালে তার সামনে বেশ সুন্দর বাগান ছিল তা আজও বোঝা যায়। কিন্তু এখন শুধুই বড় বড় ঘাসের জঙ্গল, তাও কাঁটা গাছে ভরা। কুটিরের জানালাগুলি সব বন্ধ। দরজায় নিশ্চয় তালা দেওয়া আছে। একরকম নিরাশ হয়েই দরজার কড়া নাড়া চাড়া করতে করতে তালাটা খুলে গেল। দরজাটা এত নিচু যে মাথা নুইয়ে ভেতরে ঢুকতে হোল।

ভেবেছিলাম ঘরটা নিশ্চয় নৌকোর সব সাজ সরঞ্জাম রাখবার গুদাম। রাজ্যের নোংরা আর ধুলোয় বোধহয় গিসগিস করছে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। একটু আধটু ধুলো থাকলেও ঘরখানি আসবাব পত্রে বেশ সাজানো গুছানো। এককোণে একটি ডেস্ক, টেবিল, কয়েকটি চেয়ার। আর একদিকে বিছানার মত একটি সোফা দেওয়ালের গা ঘেঁষে রয়েছে। তাকে কয়েকটি পেয়ালা পিরিজ চামচে গ্লাস রয়েছে। বই সাজানো রয়েছে যে আলমারিটির মধ্যে তারই ওপরে জাহাজের ছোট ছোট মডেল দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম ভাবলাম নিশ্চয় সেই লোকটি এখানে থাকে। কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম অনেক দিন এখানে কেউ বাস করে না। মরচে ধরা চুল্লি দেখেই বোঝা যায় কতকাল সেখানে আগুন ধরানো হয়নি। ধুলোময় মেঝেয় অনেককাল কারও পায়ের স্পর্শ পড়েনি। চায়না পেয়ালা, পিরিচে দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় স্যাঁতসেঁতে দাগ ধরে গেছে, কেমন একটা পুরানো সোঁদা গন্ধ ঘরের চারিদিকে। জাহাজের

মডেলগুলোয় মাকড়সারা জাল বুনেছে। ঘরের ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা কেমন একটানা ফাঁপা শব্দ করছিল। সোফার গদি ইঁদুরে ছিঁড়ে রেখেছে। চারিদিক স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা। আবছা অন্ধকার আর কেমন একটা থমথমে পরিবেশে আমার আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে ভাল লাগলো না। বৃষ্টির সেই বিশ্রী একঘেয়ে শব্দে আমার গা ছম ছম করে উঠলো। মরচে ধরা চুল্লির ঝাঁজড়ির মধ্যে টুপটাপ বৃষ্টির জল পড়ছে। একটু দড়ির জন্য এদিক ওদিক তাকালাম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। ঘরের শেষ প্রান্তে আর একটি দরজা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু অজানা ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। দরজা খুললেই বুঝি এমন কিছু দেখতে পাব যা আমার ক্ষতি করবে, আতঙ্কে আঁৎকে উঠবো! তবুও জোর করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। এ-ঘরটা সত্যি একটা গুদাম, নৌকোর যাবতীয় জিনিস পত্তরে বোঝাই। একটি তাকে সুতলির বল দেখতে পেলাম। মরচে ধরা একটা ছুরিও সেখানে ছিল। সেই ছুরি দিয়ে খানিকটা সুতলি কেটে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি কুটির ছেড়ে চলে এলাম। সেই লোকটি তখন আর বালু খুঁড়ছে না। সে আমাকে লক্ষ্য করছিল। জেসপার তার পাশে বসে।

'জেসপার আয়, আয়।' আমি নিচু হয়ে তাকে ধরলাম। এবার সে আর ছুটে পালালো না।

'আমি ওখানে দড়ি পেয়েছি।' লোকটির দিকে চেয়ে বললাম। সে কোন উত্তর দিল না। জেসপারের গলায় সেই সুতলি ঢিলে করে বাঁধলাম। 'আচ্ছা, তাহলে চলি', জেসপারকে টানতে টানতে তার দিকে চেয়ে বললাম। এবার সে মাথা নাড়লো। ছোট ছোট চোখ দু'টির সরল দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আপনি ওদিকে গিয়েছিলেন।'

'হাঁ।'

'তিনি তো এখন আর ওখানে যান না।'

'না।'

'তিনি সাগরে চলে গেছেন, তাই না? আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।'

'না, আর ফিরে আসবেন না।'

'আমি তো কিছু বলিনি। বলেছি?'

'না, কিছু তো বলনি। তুমি কিছু ভেবোনা।'

সে এবার আপন মনে কি বিড় বিড় করতে করতে আবার নিচু হয়ে বালু খুঁড়তে লাগলো। আমি জেসপারকে নিয়ে টিলার দিকে যেতে লাগলাম। টিলার ওপারে পৌছে দেখি ম্যাক্সিম পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'জেসপার আসতে চাইছিল না। তাই ওকে বাঁধবার জন্য দড়ি খুঁজতে হোল।' সহসা সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাণ্ডারলের অরণ্যের দিকে চলতে লাগলো।

'আমার আসতে এত দেরি হোল বলে রাগ কোরনা। জেসপারের জন্য এমন হোল। ও সাগরপারে একটি লোককে দেখে চীৎকার করছিল। কে সে?'

'তার নাম বেন। গরীব গোবেচারা মানুষ। তার বাবা ম্যাণ্ডারলের দারোয়ান ছিল। দড়ি পেলে কোথায়?'

'সাগর পারের কুটিরে।'

'দরজা খোলা ছিল?'

'হাঁ। ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। পাশের ছোট ঘরে সুতলি পেয়েছি।'

'ও।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'দরজা তো বন্ধ থাকবার

কথা। কেন খোলা ছিল'?' আমি কোন উত্তর দিলাম না। এ বিষয়ে আমার বলবার কিইবা আছে!

'দরজা খোলা আছে সে কথা কি বেন তোমাকে বলেছে?'

'না। আমি তাকে যা জিজ্ঞেস করেছি কিছুই সে বুঝতে পারেনি মনে হোল।'

'হাঁ, মাঝে মাঝে সে কেমন হয়ে যায়। আবার ইচ্ছে করলে বেশ চালাকের মতও কথা বলতে পারে। হয়তো দিনের মধ্যে কতবার সে ঐ কুটিরে যায়।'

'আমার তা মনে হয় না। ঘরের ভেতরটা একেবারে পরিত্যক্ত মনে হোল। চারিদিকে ধুলো। মনে হয় বই, চেয়ার, সোফা সবই ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে। ইঁদুরে সব খেয়ে ফেলছে।' ম্যাক্সিম আর কোন কথা না বলে হঠাৎ তার চলার গতি অসম্ভব বাড়িয়ে দিল।

এদিকটায় গাছগুলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে ঘন অন্ধকার ছায়া তাদের চারিদিকে বিছিয়ে। পথের দু'ধারে আর এজেলিয়ার সমারোহ নেই। গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টপটপ করে ঝরে পড়ছে। তারই কয়েক ফোঁটা আমার মাথায় পড়ে ঘাড় দিয়ে বেয়ে বেয়ে নামলো আমার বুকে। আমি কেঁপে উঠলাম। যেন কার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে আমার শরীর শিউরে উঠলো!

'জেসপার, তাড়াতাড়ি চলে আয়। ওটাকে তুমি টেনে আনতে পারছো না? বিয়েট্রিস ঠিকই বলেছে। কুকুরটার বড্ড চর্বি হয়ে যাচ্ছে।'

'কেন এত তাড়াতাড়ি চলেছ? আমরা তোমার সাথে সমান তালে চলতে পারছি না।'

'আমার কথা শুনে ওদিকে না গেলে এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে যেতাম। জেসপার তার পথ চেনে। কেন তুমি ওর পেছন পেছন গেলে?'

'আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঢেউয়ের ধাক্কায় বুঝিবা ও পড়ে গেছে।'

'সে আশঙ্কা থাকলে আমি কি ওকে ফেলে চলে আসতাম? তোমাকে বারবার বললাম ওদিকে যেওনা, যেওনা। তবু তুমি গেলে। এখন আবার অভিযোগ করছো!'

'না, আমি অভিযোগ করছি না। লোহার পা থাকলেও কেউ তোমার সাথে এখন চলতে পারবে না। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার সাথে আসবে।'

'বজ্জাত কুকুরটার পেছনে দৌড়ে কেন আমি হয়রাণ হবো?'

'আমার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেও তো কম হয়রাণ হওনি। ওটা তোমার একটা ছল মাত্র।'

'কি বললে? ছল! আমি ছল করবো কেন?'

'ওঃ! জানি না। এসব কথা এখন বন্ধ কর।' ক্লান্তভাবে বলে উঠলাম।

'না। তুমিই কথাটা তুলেছ। কেন তুমি বললে ওদিকে না যাবার জন্য ওটা শুধু আমার একটা ছল?'

'আমার সাথে ওদিকে তুমি যেতে চাও নি তাই।'

'কেন একথা ভাবলে?'

'আমি তা কেমন করে জানবো! আমি কি মানুষের মনের কথা জানতে পারি? আমি অনুভব করতে পেরেছি তুমি ওদিকে যেতে চাও না। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম।'

'আমার মুখে তুমি কি দেখেছিলে?'

'আগেই বলেছি সে কথা। তুমি যেতে চাওনা সেই অনিচ্ছাই তোমার মুখে ফুটে উঠেছিল। ওঃ, আর নয় এসব কথা। আর আমার ভাল লাগছে না।'

'তর্কে হেরে গেলে সব মেয়েই এরকম বলে। আচ্ছা বেশ, ওদিকে যেতে চাইনি তাই না হয় সত্যি। তাহলে তুমি খুশি হলে তো? হাঁ, আমি ওই অভিশপ্ত কুটিরের ধারে কাছেও যেতে চাইনা। আমার মত তোমার অবস্থা হলে তুমিও যেতে চাইতে না। যাওয়ার চিন্তাও করতে না। শুনলে তো? এবার তোমার কৌতূহল মিটেছে আশা করি।'

তার মুখ এক নিমেষে ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর মত ম্লানিমা নেমেছে! আবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যাকুল দৃষ্টি ফিরে এলো। আমার চেনা ম্যাক্সিম, আমার প্রিয় ম্যাক্সিম কোথায় গেল হারিয়ে! ভয় পেয়ে, আমি তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'কি হোল? শোন, শোন।'

'কেন? কি হয়েছে?' রুক্ষ স্বরে সে বলে উঠলো।

'ওভাবে কেন তাকাচ্ছ? না, না, তোমার এই দৃষ্টি আমি সইতে পারি না। লক্ষ্মীটি আমার, ভুলে যাও ওসব কথা। আর কোন দিন তোমার সাথে তর্ক করবো না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আবার আগের মত হও। শোন—'

ম্যাক্সিম আমার দিকে না তাকিয়েই আপন মনে বলতে লাগলো, 'আমাদের বাইরে থাকাই উচিত ছিল। ম্যাণ্ডারলে ফিরে আসা উচিত হয়নি। ওঃ! কেন আমি আবার এখানে এলাম!' এবার একরকম ছুটতে ছুটতেই সে চলতে লাগলো পাগলের মত। আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে জেসপারকে টেনে নিয়ে তার সাথে সাথে দৌড়ে চলেছি। আমার চোখে জল এলো বলে।

অবশেষে আমরা সেই বনপথের শেষ প্রান্তে দু'পথের মোহনায় এসে পড়লাম। হ্যাপিভ্যালির দিকে যে পথটি চলে গেছে সেটাকে ওই দেখা যাচ্ছে। জেসপার যে পথে ওদিকে গিয়েছিল আমরা সে পথ ধরেই ফিরে

এসেছি। জেসপার কেন ওদিকে গিয়েছিল এখন বুঝতে পারলাম। ওদিকে বেড়াতে যাওয়া বোধ হয় তার অনেক কালের অভ্যাস।

ম্যাণ্ডারলের প্রাঙ্গণ পার হয়ে আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। একটি কথাও কেউ বললাম না। ম্যাক্সিমের মুখ তখনও ভাবলেশহীন, পাথরের মত কঠিন। সে সোজা হলঘরের মধ্য দিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলো। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। ফার্থ তখন হলঘরে ছিল। 'এখনি চা দাও,' বলে সে লাইব্রেরি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। আমি তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম যাতে আমার চোখের জল ফার্থের সামনেই না বেরিয়ে পড়ে। সে দেখলে ভাববে আমরা দু'জনে বুঝি ঝগড়া করেছি। ফার্থ কাছে এসে আমার বর্ষাতিটা খুলতে সাহায্য করলো। আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

'এই যে আপনার রুমাল।' মেঝে থেকে রুমালটা তুলে সে আমাকে দিল। আমি এখন ওপরে শোবার ঘরে যাব কি লাইব্রেরিতে যাব ভেবে পেলাম না। ফার্থ বর্ষাতি নিয়ে ফুল ঘরের দিকে চলে গেল। আমি সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ফার্থ আবার ফিরে এসে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল বুঝতে পারলাম।

'এখন লাইব্রেরিতে আগুন আছে', সে বললো।

'আচ্ছা। আমি সেখানেই যাচ্ছি।' খুব আস্তে আস্তে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলাম। ম্যাক্সিম তার চেয়ারে বসে ছিল। জেসপার তার পায়ের কাছে বসে। জেসপারের মা তার বাস্কেটে শুয়ে আছে। ম্যাক্সিমের হাতের এক পাশে টেবিলের ওপর পত্রিকা পড়ে আছে। কিন্তু সে তা পড়ছে না। আমি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আমার ওপর রাগ করে থেকো না।' সে দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানি তুলে ধরলো। ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'না। আমি তোমার ওপর রাগ করি নি।'

'হাঁ, করেছো। আমি তোমাকে ব্যথা দিয়েছি, অসুখী করেছি। তোমার এই চেহারা আর সহ্য করতে পারছি না। বিশ্বাস কর আমি তোমাকে ভালবাসি, বড় ভালবাসি।'

'সত্যি! সত্যি ভালবাস?' এবার সে তার ব্যাকুল হাতের আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে নিল তার প্রশস্ত বুকে। তার কালো চোখে ভীত ব্যথা-কাতর শিশুর মত অবোধ দৃষ্টি ফুটে উঠলো।

'কি হয়েছে তোমার? কেন অমন করে চাইছ?' সে কোন উত্তর দেবার আগেই দরজা খোলার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে সরে এলাম। কার্থ রবার্টকে সঙ্গে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে। আগের দিনের মত সমারোহ করেই আমাদের সামনে চা, খাবার সাজিয়ে দেওয়া হোল। জেসপার আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে তাকাচ্ছে। চার পাঁচ মিনিট পর আমরা আবার দু'জনে একা হলাম। ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে দেখি আবার সহজ স্বাভাবিক ভাব ফিরে এসেছে তার চোখে মুখে। স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে সে বললো, 'বী-র কথা মনে পড়ছে। আমি ওকে খুব ভালবাসি। কিন্তু একসঙ্গে হলেই দু'জনে ঝগড়া না করে পারি না। আমাকে রাগাতে ও মজা পায়। খুব কাছে ওরা থাকে না এটাও একটা ভাগ্য, কি বল? তাহলে তো রাতদিন আমাদের ঝগড়া লেগে থাকতো। ও, হাঁ, তোমাকে নিয়ে দিদিমাকে একদিন দেখে আসতে হবে।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো আমার চোখে চোখ রেখে, 'আমাকে ক্ষমা করেছ তো?'

চা খেতে খেতে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো। তার সেই হাসিই আমার পুরস্কার। সে আমার ওপর আবার খুশি হয়েছে। আজকের সকল তিক্ততার শেষ হয়েছে। আর আমরা ও সব বিষয়ে কোন কথা তুলবো না। কিন্তু আমার খেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ নিজেকে বড় ক্লান্ত, অসহায়

মনে হোল। সমস্ত দিনটা বৃথা কেটে গেল কতকগুলি তিক্ত স্মৃতির ভারে মনটাকে কালো করে দিয়ে।

ম্যাক্সিম একমনে কাগজ পড়ছে। হাত মুছবার জন্য আমি পকেট থেকে রুমাল বের করলাম। লেস দেওয়া ছোট্ট একখানি রুমাল বের হলো। একি! এ তো আমার রুমাল নয়! মনে পড়লো হলঘরের মেঝে থেকে ফার্থ এইটিই আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। তাহলে এটা বর্ষাতির পকেট থেকেই মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। দু'এক জায়গায় পোকায় কেটেছে। বর্ষাতির পকেটে বোধ হয় বহুদিন হোল রুমালটি পড়ে আছে। এক কোণে নামের প্রথম অক্ষর লেখা রয়েছে লম্বা, বাঁকা 'র'—তার পাশে লেস দিয়ে ছোট্ট করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা 'ডি উইণ্টার'। রুমালের এককোণে গোলাপী একটু দাগ লেগে রয়েছে। লিপষ্টিকের দাগ। রুমালটি দিয়ে তার ঠোঁট মুছে পকেটে রেখে দিয়েছিল। হঠাৎ অনুভব করলাম কেমন একটা চেনা সুবাস পাচ্ছি রুমালটি থেকে।

চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করলাম এই গন্ধ আমি কোথায় পেয়েছিলাম। এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু তবুও নামটা মনে করতে পারছি না কেন! আজই বিকেলে যেন এই তীব্র মধুর গন্ধের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছে।

সাহসা মনে পড়লো এই অস্পষ্ট সুবাস হ্যাপিভ্যালির সেই এজেলিয়ার ছেঁড়া পাপড়ির মদির সুগন্ধ।

॥ ১১ ॥

আজ সাতদিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলছে। সাগরপারে যেতে না পারলেও ম্যাণ্ডারলের অলিন্দ থেকে, আঙ্গিনা থেকে সাগর দেখতে পেতাম। কখনও তার শান্ত অচঞ্চল রূপ, আবার কখনও বা কী ভয়ংকর! এতদূর থেকেও আমি কল্পনা করতাম উত্তাল সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ গর্জন করতে করতে সেই পাহাড়ের বুকে আছড়ে আছড়ে পড়ছে আর বিপুল বেগে বেলাভূমির দিকে ছুটে আসছে! সমুদ্রের কল্লোল একটানা একটা সুরের মত মনে হোত, যে সুর কোন দিনই বুঝি থামবে না। গাঙচিলের দল মাঝে মাঝে বাড়ির ওপরে গোল হয়ে ঘুরে কী বিকট চীৎকারই না করতো! ডানা ঝটপট করতে করতে তাদের ডানা থেকে কত পালক ঝরে ঝরে পড়তো এদিক ওদিক।

অনেকে সাগরের গর্জন সইতে পারে না কেন তার কারণ এখন বুঝেছি। এই একঘেয়ে অশ্রান্ত গর্জনের মধ্যে কখনও কেমন এক করুণ সুর বেজে ওঠে। মনে হয় কেউ বুঝি কাঁদছে, কেবলি কাঁদছে! আবার কখনও সাগরের উত্তাল উদ্দামতায় একের পর এক ঢেউয়ের প্রবল মাতামাতি মানুষকে সশংকিত করে তোলে।

আমার শোবার ঘর পূব মহলে এজন্য আমি সত্যিই খুশি। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই সুন্দর গোলাপেরা আমার দিকে চেয়ে হেসে ওঠে! সেদিকে চেয়ে চেয়ে আমার মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে ঘুম যখন আর আসতে চায় না, নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াই। গভীর রাতের নিঃসীম নীরবতায় গোলাপের নিঃশ্বাস বুকে ভরে নিয়ে হিমেল বাতাস এসে আমার ক্লান্ত চোখে মুখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। কিন্তু

সাগরের অশ্রান্ত ডাক আমার কানে গেলেই মনে পড়তো সেই দিনকার সেই পরিত্যক্ত কুটিরের অবাঞ্ছিত স্মৃতি! সেই দিনের কথা ভাবতে চাইনা কিন্তু সাগরের দিকে তাকালে সে সব কথা মনে পড়বেই। চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠতো সেই কুটিরের প্রতিটি জিনিসের ছবি একের পর এক। কুটিরের ছাদে বৃষ্টির সেই একটানা ফাঁপা টুপটাপ শব্দ! ছোট ছোট নীলাভ চোখে অবোধ চাহনি, বিপন্ন, অসহায় ভঙ্গিতে গোবেচারা বেন—তার কথাও আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু ওসব ভাবলে আমার মন এক নিমেষে বিকল হয়ে যায়। এক এক সময় অবাক হয়ে ভাবি সেদিনকার স্মৃতি কেন আমাকে এত অশান্ত করে তোলে! নিজের অজানিতেই বুঝি বা আমার মনের অতল গহনে একটা অদম্য কৌতূহল, আকুল জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে! যে কথা আমাকে জানতে নেই তাই জানবার জন্য যেন শিশুর মত অবুঝ হয়ে উঠছে আমার মন। সেদিন সেখান থেকে ফিরবার পথে তার সেই বিবর্ণ মুখ, শূন্যদৃষ্টি আজও কি ভুলতে পারি! তার কথাগুলোও আমার মনে চিরকাল বিঁধে থাকবে কাঁটার মতন। 'ওঃ! কেন আমি এখানে ফিরে এলাম?' তার সেই আর্তস্বর, রুদ্ধ বেদনার সেই ব্যাকুল আবেগ আজও আমাকে পাগল করে দেয়। তার নিষেধ না শুনে সেদিন আমি উপসাগরের দিকে গিয়েছিলাম বলেই না যত অনর্থ ঘটেছিল! ম্যাণ্ডারলের অতীত জীবনের রুদ্ধ দুয়ারে সেদিন আমিই বুঝি প্রথম আঘাত দিয়েছিলাম।

ম্যাক্সিম আবার সহজ স্বাভাবিক হয়েছে। সমস্ত দিন রাত্রির জন্য আমাদের দু'জনের জীবন এক হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও দু'জনের মধ্যে কী এক অব্যক্ত ব্যবধানের সেতু গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে সেদিনের সে ঘটনার পর থেকে। এক জায়গায় যেন সে বড় একা, যেখানে আমি তার কাছে যেতে পারছি না। সব সময় আমার ভয় হয় এই বুঝি এমন কোন কাজ করে ফেলবো, এমন কোন কথা

বলে ফেলবো যার জন্য তার চোখে ফিরে আসবে আবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল দৃষ্টি! সাগরের কথা বললেই হয়তো নৌকো দুর্ঘটনার প্রসঙ্গও এসে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আমি তার সামনে কোনদিন সাগরের উল্লেখও করিনি।

একদিন ফ্র্যাঙ্ক আমাদের সঙ্গে খাবার সময় ম্যাণ্ডারলে থেকে তিন চার মাইল দূরে কেরিথ উপসাগরে নৌকো বাওয়া প্রতিযোগিতার কথা তুললো। আমি তখন ভয়ে মরি! দুর্ভাবনায় ভাল করে তাদের দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। খাবার প্লেটের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে, ভাবতে লাগলাম এই আলোচনার গতি না জানি কোন দিকে যায়! ম্যাক্সিম বেশ সহজভাবেই ফ্র্যাঙ্কের সাথে আলাপ করে চলেছে। আমি চেয়ার থেকে উঠে খাবারের তাকের দিকে গেলাম আরও একটু চিজ নেব বলে। আর চিজ খেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তাদের কাছ থেকে একটু দূরে যাবার জন্য আমাকে এই ছল করতে হোল। তাদের কথা যাতে শুনতে না পাই সেজন্য আপন মনে গুণগুণ করে একটা গানের কলির সুর ভাঁজছিলাম। আমার আশঙ্কা অবশ্য সেদিন ভুলই হোল। কিছুই ঘটলো না। কিন্তু তবুও এরকম অবস্থায় দুশ্চিন্তায় আমার বুক শুকিয়ে উঠতো। অনেক চেষ্টা করেও আমার এই দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

অতিথি, অভ্যাগত কেউ আসলে লজ্জা ও ভয়ে আমি একেবারে বোবা হয়ে যেতাম। তারা যতক্ষণ থাকতো আমার কেবলই মনে হোত এই বুঝি তারা কি বলতে কি বলে ফেলে। গাড়ি আসার শব্দ শুনলে, কলিং বেল বেজে উঠলে সব প্রথমেই আমার ইচ্ছে হোত এখনি ছুটে চলে যাই আমার নিরালা শোবার ঘরে, লুকিয়ে থাকি। কিন্তু তাতেও কি রেহাই ছিল! তারপরেই আসতো রূপোর ট্রেতে সুন্দর একখানি পরিচয় পত্র। 'আচ্ছা এখনই যাচ্ছি' বলে নিচে নেমে যেতাম লাইব্রেরি

ঘরে অথবা ঠাণ্ডা, প্রাণহীন ড্রয়িং রুমে, যেখানে বসে আছেন অপরিচিত কোন ভদ্রমহিলা অথবা কোন দম্পতি।

'নমস্কার। ভাল আছেন তো? উনি বোধ হয় বাগানে আছেন। ফ্রার্থ তাঁকে ডাকতে গেছে।' কোন মতে বলতাম।

'আমরা আপনাকে দেখতেই এসেছি', তারপর একটুখানি হাসি, দু'একটা কথার বিনিময় চলতো। তারপর আবার নীরবতা নেমে আসতো। ঘরের চারিদিকে তারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখতো।

'ম্যাণ্ডারলে আগের মতই সুন্দর আছে। আপনার কেমন লাগছে জায়গাটা?' তাদের প্রশ্নের উত্তরে কি বলবো ভেবে না পেয়ে মেয়ের মত থতমত খেয়ে 'হাঁ' 'না' করে উত্তর দিয়ে যেতাম। তারপর ম্যাক্সিম এসে পড়লে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। তখন মুখে একটু কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে চুপ করে বসে তাদের কথা শুনতাম। আমি যাদের চিনি না, জানি না তাদের কথা, ম্যাণ্ডারলের কথা কত কি তারা ম্যাক্সিমের সাথে আলোচনা করতো। মাঝে মাঝে কেমন অবাক হয়ে তারা আমার দিকে তাকাতো। বসে বসে কল্পনা করতাম তারপর হয়তো তারা নিজেরা বলাবলি করবে, 'ওমা, কেমন ধারা নির্জীব মেয়ে! একটি কথাও তো গুছিয়ে বলতে পারে না!' তারপর যে কথা সব প্রথম বিয়েট্রিসের মুখে শুনেছি, যে কথা প্রতিটি লোকের চোখের নীরব ভাষায় স্পষ্ট লেখা দেখেছি সেই কথাটি হয়তো তারাও বলবে 'এ যে রেবেকার একেবারে বিপরীত! তাঁর সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না।'

সামাজিক ভদ্রতা রক্ষার জন্য ম্যাক্সিম আমার সাথে যেতে না পারলে আমাকে একাই দু'এক জায়গায় যেতে হয়েছে। কিন্তু দু'একটা কথা বলার পর চুপ করে ভাবতে হয়েছে এরপর কোন্ কথা বলবো। তারা হয়তো বলেছে, 'আচ্ছা মিসেস ডি উইণ্টার আগের মত আনন্দ-উৎসবের

আয়োজন করবেন না ?' আমি তার জবাবে বলেছি, 'তা তো জানি না। মিঃ ডি উইন্টার এবিষয়ে আমাকে কিছু বলেন নি।' 'আগে কিন্তু এখানে একটা না একটা অনুষ্ঠান লেগেই থাকতো। সব সময় অতিথি অভ্যাগতে ম্যাণ্ডারলে কী জমজমাট ছিল।' অগত্যা আমিও বলতাম, 'হাঁ, শুনেছি সে সব কথা।' তারপর আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর ফিসফিসিয়ে কেউ হয়তো বলতো, 'জানেন তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁকে ভালবাসতো! অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর।'

'হাঁ, জানি।' এরকম উত্তর না দিয়েও কোন উপায় ছিল না। তারপর হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতাম, 'এখন আমাকে যেতে হবে। চারটে বেজে গেছে।'

'চা খাবেন না ? সোয়া চারটেয় আমরা চা খাব।'

'না। ধন্যবাদ। তাঁকে বলে এসেছি'—কথাটা শেষ না করেই উঠে পড়তাম।

একদিন ক্যাথিড্রালের বিসপের বাড়িতে গেলে তাঁর স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্বামী কি আবার ম্যাণ্ডারলের ফ্যান্সি ড্রেস বলের প্রবর্তন করবেন ? ওঃ, কী অপূর্ব অনুষ্ঠানটি! আমি আজও ভুলতে পারি না সেই উৎসবের মধুর স্মৃতি!' এবিষয়ে আমি যেন সবই জানি এভাবে একটু হেসে আমাকে বলতে হোল, 'আমরা এখনও কিছু স্থির করিনি! অনেক দিক ভেবে দেখতে হবে।'

'হাঁ, তা ঠিক। কিন্তু একেবারে বন্ধ না হলেই হোল। মিঃ ডি উইন্টারকে এব্যাপারে আপনি উৎসাহ দেবেন। গেল বছর থেকে ম্যাণ্ডারলের সব উৎসব বন্ধ আছে। দু'বছর আগেকার কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে। কী বিরাট আয়োজন! নাচ, গান, হাসি ও কলরবে ম্যাণ্ডারলে সেদিন কী মেতে উঠেছিল! কত নিপুণভাবে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।'

বসবার ঘরের টেবিলের ছোট ছোট দেরাজে সেই আমন্ত্রণ-লিপিগুলির কথা হঠাৎ আমার মনে পড়লো। কল্পনায় ভেসে উঠলো একটি মেয়ের ছবি, বসবার ঘরের চেয়ারে বসে সে ম্যাণ্ডারলের উৎসবে আমন্ত্রিতদের তালিকা করে চলেছে সুন্দর ধবধবে শাদা কাগজে তার অদ্ভুত বাঁকা, লম্বা আখরের কালো সবল আঁচড়ে! বিসপ-পত্নী আবার বললেন, 'একবার গরম কালে গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দিনটি ছিল ভারি সুন্দর। গোলাপ-বাগানে ছোট ছোট টেবিলের ওপর চা, খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। চারিধারে ছিল কত রঙ-বেরঙের ফুলের বাহার! একেবারে নূতন পরিকল্পনা! সত্যি, তাঁর কত গুণ ছিল! বুদ্ধিও ছিল অতুলনীয়!' শেষের কথাটা বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। কিছু না ভেবে যে কথাটি অতর্কিতে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে তারই জন্য হয়তো তাঁর মুখ একটু লাল হয়ে উঠলো। সেই অপ্রস্তুত ভাব থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য আমিও বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলাম, 'আমি জানি রেবেকা সবদিক দিয়েই অতুলনীয় ছিল!' নিজেই ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কেমন করে শেষ পর্যন্ত তার নামটি বলে ফেললাম। কিন্তু বলে ফেলে বেশ স্বস্তি পেলাম মনে। অসহ্য বেদনার পর যেন একটু আরাম হোল।

তারপর বিসপ-পত্নী একের পর এক কত কথা বললেন তার বিষয়ে। আর আমি সমস্ত মন ঢেলে তা শুনতে লাগলাম, কারও কোন গোপন কথা আড়ি পেতে শোনবার আকুল আগ্রহ নিয়ে!

'আপনি তাহলে তাঁকে দেখেন নি?' তাঁর এই প্রশ্নে আমি মাথা নাড়লে তিনি একটু চুপ করে থেকে হয়তো ভেবে নিলেন আর কোন কথা বলা উচিত হবে কিনা। তারপর বললেন, 'আমরাও তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোন দিন জানতাম না। এখানে এসেছি মাত্র চার বছর হোল। তিনি আমাদের ম্যাণ্ডারলের সমস্ত উৎসবে আমন্ত্রণ করেছেন।

সত্যি, কি রূপে, কি গুণে তিনি ছিলেন অনন্যা! অদ্ভুত প্রাণ প্রাচুর্য ছিল তাঁর।'

'হাঁ। এতগুণের সমাবেশ সাধারণত একজনের মধ্যে দেখা যায় না।' হাতের দস্তানা নাড়া চাড়া করতে করতে খুব সহজভাবে বললাম।

'আজও আমার মনে পড়ে তাঁর অপরূপ চেহারাখানি। নাচের আসরে তিনি যখন নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানাতে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শাদা ধবধবে গায়ের রঙের ওপর মেঘবরণ এক গোছা চুলের রাশি, পরনে ছিল অপূর্ব শুভ্র পোশাক। কী চমৎকারই না তখন মানিয়েছিল তাঁকে!'

'তিনি নাকি নিজেই বাড়ির সব কাজ দেখাশুনো করতেন। তাতেও তো কত বুদ্ধি বিবেচনার দরকার। আমি কিন্তু ওসব দায়িত্ব হাউস কিপারের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।' একটু হেসে বললাম। কত সহজ ভাবেই না তাঁর সাথে রেবেকার বিষয় আলোচনা করে চলেছি। আশ্চর্য!

'তাতে আর কি হয়েছে! সবাই সব কিছু করবার ক্ষমতা রাখে না। ওসব কাজ একদিন আপনিও করতে পারবেন। এখন তো আপনি একেবারে ছেলে মানুষ! শুনেছি আপনার নাকি আঁকবার সখ আছে?'

'একটু আধটু আঁকি মাঝে মাঝে।'

'তা, এটাও একটা মস্ত গুণ। সকলেই কি আর আঁকতে পারে! এই অভ্যাসটি ছাড়বেন না যেন। এখানে আঁকবার কত সুন্দর জিনিসই না আছে!'

'তা সত্যি।'

'কি কি খেলা আপনার ভাল লাগে? ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করেন তো?'

'না। ওসব আমি কোনটাই পারি না। পায়ে হেঁটে বেড়াতেই ভালবাসি।' ক্ষীণ স্বরে বললাম। 'পায়ে হেঁটে বেড়ানোই অবশ্য সব

চেয়ে ভাল ব্যায়াম। আমরা দু'জনেও খুব হেঁটে বেড়াই!' বিসপ-পত্নী হাসি মুখে বললেন। তারপর বলে চললেন বিসপ এবং তাঁর পায়ে হেঁটে বেড়াবার রকমারি কত কাহিনী। নীরবে শুনে যেতে লাগলাম, একবার একটু মাথা নেড়ে, কখনও বা একটু হেসে। তাঁর গল্প বলা শেষ হয়ে গেলে আবার নীরবতা নেমে এলো। তাঁকে অকারণ ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে আমিও উঠে পড়লাম।

'আপনার সাথে আলাপ করে খুব খুশি হলাম। একদিন আমাদের ওখানে দু'জনে যাবেন।'

'নিশ্চয় যাব। মিঃ ডি উইণ্টারকে আমার কথা বলবেন আর বল নাচের কথাটাও মনে করিয়ে দিতে ভুলবেন না যেন।'

'আচ্ছা।' গাড়িতে উঠে এককোণে বসে আমি বুড়ো আঙ্গুলের নখ কাটতে কাটতে ভাবছি ফ্যান্সিড্রেসবলের সময় নাচ, গান, হাসিতে অগুন্তি অতিথি অভ্যাগতের আনন্দ-কলরবে সুন্দর ম্যাণ্ডারলে না জানি আরও কত অপরূপ, প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠতো! আমি যেন কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিম সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে নিমন্ত্রিতদের সম্বর্দ্ধনা জানাবে বলে। তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘাঙ্গী তন্বী একজনা, যার শ্বেতপাথরের মত শাদা মুখখানি ঘিরে কালো কুচকুচে এক রাশ চুলের সমারোহ! সকলের সুখ সুবিধা আরামের দিকে যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যার ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্য কখনও কোন কারণে এতটুকুও ম্লান হবার নয়! যখন সে নাচবে তখন বুঝি এঞ্জেলিয়ার মদির সুবাস ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে তার মহামূল্যবান অঙ্গাবরণ হতে!

'এবার থেকে নিশ্চয়ই ম্যাণ্ডারলের উৎসব আনন্দের আয়োজন করা হবে মিসেস ডি উইণ্টার?' আমার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গিয়ে শুনতে পেলাম আর এক ভদ্রমহিলার কৌতূহলী কর্কশ কণ্ঠস্বর। তাকিয়ে দেখি আমার আপাদমস্তক তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন। তাঁর সেই

অদ্ভুত দৃষ্টির সামনে আমি আরও সংকুচিত হয়ে পড়লাম। আমি এদের একজনকেও দেখতে চাই না, এদের সাথে আলাপ করতে চাইনা। কিন্তু আমাকে দেখবার অদম্য কৌতুহল নিয়েই তারা আসতো। আমার চাহনি, আমার ব্যবহার, হাবভাব, আমার চেহারার সমালোচনা করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফিরে গিয়ে হয়তো তারা বলাবলি করতো 'তাঁর মত নয়।' রেবেকার সাথে আমার তুলনা করতে পারবে বলেই তারা আমায় দেখতে আসতো। আমাকে তারা অভদ্র, অশিক্ষিত ভাবলেও আমি আর কোথাও যাবনা। তারা বলবে আমার আভিজাত্য নেই, বংশ মর্যাদা নেই। বলবে, 'এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! দেখতে হবে তো তার কি পরিচয়!' অবজ্ঞার হাসি হেসে আর একজন বলবে আবার 'ওমা, জান না বুঝি? মন্টিকার্লো না কোথা থেকে মিঃ ডি উইণ্টার তাকে খুঁজে বের করেছেন। তার এক কপর্দকও ছিল না। কোন্ এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার অধীনে সামান্য কি কাজ করতো।' ব্যঙ্গভরা তীক্ষ্ণ হাসির দমকে তারা ভেঙ্গে পড়বে। 'কী আশ্চয! পুরুষদের কাণ্ড কারখানা বোঝা ভার, তাই না? আর কেউ নয়, ম্যাক্সিম ডি উইণ্টার যিনি নাকি অত খুঁত খুঁতে ছিলেন তাঁরই শেষকালে এমন রুচি! রেবেকার পর কেমন করে তাঁর অমন পছন্দ হোল! আশ্চর্য!' বলুক, তারা যা খুশি বলে যাক। আমি এসব কথায় ক্ষুণ্ণ হবো না আর। তাদের কথা গ্রাহ্য করবো না।

গাড়ি চলার মসৃণ পথ দিয়ে গাড়ি এবার ছুটে চলেছে। বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সেই পথ দিয়ে কে একজন এদিকে আসছে। একটু পরে বুঝতে পারলাম ফ্র্যাঙ্ক আসছে। গাড়ির শব্দ শুনে সেও থেমে গেছে। আমাকে দেখে সে বেশ খুশি হয়েছে মনে হোল।

ফ্র্যাঙ্ককে প্রথম দিন থেকেই আমার ভাল লেগেছে। আমার মতই সাধারণ সে। তাই বোধ হয় আমাদের দু'জনের দু'জনকে ভাল

লেগেছে। গর্ব করবার মত, বলবার মত কিছু যে নেই আমাদের দু'জনেরই জীবনে!

সোফারকে বললাম, 'আমি মিঃ ক্রলের সাথে হেঁটে যাব।' সে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ফ্র্যাঙ্ক একটু হেসে প্রশ্ন করলো 'বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

'হাঁ, ফ্র্যাঙ্ক।' ম্যাক্সিম তাকে ফ্র্যাঙ্ক বলে ডাকে আমিও তাই ডাকলাম, সে কিন্তু আমাকে মিসেস ডি উইন্টার ছাড়া আর কোন নামেই কোনদিন ডাকবে না। এটাই তার স্বভাব। এক এক সময় মনে হয় আমাদের দু'জনকে কোন জনমানব শূন্য দ্বীপে রেখে এলে এবং সেখানে আমাদের দু'জনকে বাকি জীবন এক সঙ্গে কাটাতে হলেও আমি তার কাছে মিসেস ডি উইন্টারই থাকবো! তার চরিত্রের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রথমদিন থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম।

'বিসপের বাড়ি গিয়েছিলাম। তার স্ত্রীর সাথে আলাপ হোল। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুব হেঁটে বেড়াতে ভালবাসেন। একবার তাঁরা পেনিনিতে এক দিনে কুড়ি মাইল হেঁটেছিলেন।'

'আমি ওই জায়গাটা চিনি না। লোকে বলে খুব নাকি সুন্দর জায়গা। আমার এক কাকা সেখানে থাকেন।' এভাবে নিরাপদ, প্রচলিত কথা বলাই তার রীতি।

'বিসপ-পত্নী জানতে চেয়েছেন আমরা ম্যাণ্ডারলের ফ্যান্সিড্রেস-বলের প্রবর্তন করবো কিনা। তিনি শেষবারের নাচে এসেছিলেন এবং খুব আনন্দও পেয়েছিলেন। আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক, আমি তো এবিষয়ে কিছুই জানি না।' উত্তর দেবার আগে সে একটু দ্বিধা করলো। তাকে যেন হঠাৎ চিন্তিত মনে হোল। একটু পরে সে বললো, 'ও, হাঁ। ম্যাণ্ডারলের এই নাচের আয়োজন একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতই ছিল। এখানকার প্রত্যেকে সেই উৎসবে আসতো। লণ্ডন থেকেও কত লোক আসতো।'

'তাহলে তার ব্যবস্থা করতেও তো অনেক সময় আর পরিশ্রমের দরকার হোত ?'

'হাঁ।'

'রেবেকাই কি সব ব্যবস্থা করতো ?' বেশ সহজভাবে বলে ফেললাম কথাটা। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি তখন পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ফ্র্যাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে বললো, 'আমাদের সকলকেই পরিশ্রম করতে হোত।' ফ্র্যাঙ্ক বেশ লাজুক ও চাপা প্রকৃতির। এদিক দিয়েও তার সাথে আমার মিল রয়েছে। সহসা আমার একটা অদ্ভুত কথা মনে হোল। সে কোনদিন রেবেকার প্রেমে পড়েছিল নাকি! হতেও তো পারে।...

'আবার সেই আয়োজন হলে আমি তো কোন সাহায্যই করতে পারবো না। আমার যে কোন গুণই নেই!'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। শুধু নিজের সাজটা মন দিয়ে করলেই চলবে।' সে হেসে বললো।

'আমার মনে হয় তাও আমি ভাল করে পারবো না।'

'নিশ্চয় পারবেন, আমি বলছি।' তার এই কথায় তাকে আমার আরও ভাল লাগলো।

'ওকে এবিষয়ে আপনিই বলবেন তো ?' প্রশ্ন করলাম।

'কেন আপনিই বলুন না।'

'না। আমি তা পারবো না।'

তারপর আমরা দু'জনেই চুপ করে পথ চলতে লাগলাম। রেবেকার কথা একবার সহজভাবে বলতে পেরেছি বলেই আরও বলবার আগ্রহ আমাকে নেশার মত পেয়ে বসলো। আর আমার কোন সঙ্কোচ নেই। তাই দু'এক মিনিট পর একরকম নিজের অজানিতেই আমার মুখ দিয়ে

বেরিয়ে গেল, 'বেলাভূমির যেদিকে বাঁধ আছে একদিন সেদিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জেসপার সেখানে একটি লোককে দেখে চীৎকার করছিল।'

'বোধ হয় বেনের কথা বলছেন।' বেশ সহজ ভাবে সে বললো, 'সে প্রায় সব সময়েই ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। বেন খুব গোবেচারা নিরীহ লোক। তাকে দেখে ভয় পাবেন না।'

'না, আমি তো ভয় পাইনি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে ফেললাম, 'সেখানকার সব জিনিস-পত্র তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেসপারকে বাঁধবার জন্য দড়ি খুঁজতে সেই কুটিরের ভেতরে গিয়েছিলাম। ওসব যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি কেন?' আমি জানতাম সে তখনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে না। জুতোর ফিতে বাঁধবার ছল করে সে এবার নিচু হোল। একটু পরে বললো, 'কিছু করবার দরকার হলে ম্যাক্সিম আমায় বলতো।'

'সবই কি রেবেকার জিনিস?'

'হাঁ।'

'আচ্ছা, সে বুঝি কুটিরটি ব্যবহার করতো? বেশ সাজানো গোছানো ঘরখানি। দূর থেকে ভেবেছিলাম বুঝি বা ওটা একটা বোট হাউস।'

'আগে তাই ছিল।' তার গলার স্বর আবার কেমন বাঁধ বাঁধ শোনালো। কেমন যেন অসহজ ভাব।

'তারপর তারপর সে আসবাব পত্র দিয়ে মনের মত করে ঘরখানিকে সাজিয়ে নিয়েছিল।' ফ্র্যাঙ্ক তাকে 'সে' বললো কেন? ভেবেছিলাম নিশ্চয় রেবেকা অথবা মিসেস ডি উইণ্টার বলবে।

'ঐ কুটিরে সে প্রায়ই যেত?'

'হাঁ। চাঁদিনী রাতে পিকনিক আরও কতকি একের পর এক আনন্দ উৎসব লেগেই থাকতো।'

একটু হেসে বলে উঠলাম, 'চাঁদিনী রাতে পিকনিক! বাঃ, বেশ মজা তো! আপনি একবারও গিয়েছিলেন?'

'একবার কি দু'বার।'

স্পষ্ট বুঝতে পারছি এসব আলোচনা চালাতে তার বেশ অনিচ্ছা। কিন্তু আমি না বুঝবার ভান করে বলে চললাম, 'সেখানে একটি বয়া বাঁধা রয়েছে কেন?'

'নৌকো নঙ্গর করবার জন্য।'

'কার নৌকো?'

'তার।'

একটা অদ্ভুত উত্তেজনা এবার আমাকে পেয়ে বসলো। সে এসব বিষয়ে কোন কথা বলতে না চাইলেও এখন আমাকে প্রশ্ন চালিয়ে যেতে হবে। ফেরবার আর কোন উপায় নেই।

'সেই নৌকোর কি হোল? ডুবে যাওয়ার সময় সেই নৌকোতেই কি সে ছিল?'

'হাঁ। উল্টে গিয়ে নৌকো ডুবে যায়। ঢেউয়ের আঘাতে সে নৌকো থেকে ছিট্‌কে পরে গিয়েছিল।' খুব শান্ত স্বরে সে বললো।

'নৌকোটা কত বড় ছিল?'

'প্রায় তিন টনের নৌকো। একটা ছোট কেবিনও ছিল তার মধ্যে।'

'কেমন করে উল্টে গেল?'

'বোধহয় ঝড়ে পড়েছিল।'

সেই উত্তাল সাগরের ভয়াল রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মনটাও প্রশ্নাকুল হয়ে উঠলো। ঝড় কি সেদিন আচমকাই উঠেছিল! পাহাড়ের ওপর আলো-ঘর থেকে কোন বিপদ সংকেত কি দেওয়া হয়নি!

'তাকে উদ্ধার করবার জন্য কেউ তার কাছে যেতে পারেনি?'

'দুর্ঘটনার কথা কেউ জানতো না। সে যে সাগরে গেছে তাও জানতো না।'

এবার আমি তার দিক থেকে সাবধানে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, আমার চোখে মুখে যে অপার বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তা যাতে সে না দেখতে পায় তারই জন্য। এতদিন ভেবেছি সমুদ্রে নৌকো বাওয়ার প্রতিযোগিতায় বুঝি তার নৌকো ডুবে গিয়েছিল। সে যে একেবারে একেলা নৌকো করে সাগরে গিয়েছিল একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! তাই আবার বললাম, 'বাড়ির আর সকলে নিশ্চয় জানতো যে সে গেছে?'

'না। ওরকম একা একা সে প্রায়ই চলে যেত। গভীর রাতে সাগর থেকে ফিরে সে সেই কুটিরেই ঘুমিয়ে পড়তো।'

'ভয় করতো না?'

'ভয়! না, ভয় বলে কোন কিছু সে জানতো না।'

'কিন্তু ওরকম একেলা যাওয়ায় ম্যাক্সিম কিছু মনে করতো না?'

একটু চুপ করে থেকে সে বললো, 'জানি না।'

'নৌকো ডুববার পর সাঁতার দিয়ে পারে আসবার সময় বোধহয় সে সাগরে তলিয়ে গেছে?'

'হাঁ।'

কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম আঁধার রাতের গভীর সাগরের বুকে দারুণ ঘূর্ণির মুখে পড়ে ছোট্ট নৌকোটি কেমন দুলে দুলে উঠেছিল! তারপর বুঝি সহসা প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় নৌকো উল্টে সে ছিট্‌কে পড়ে গেল! ওঃ! কী মর্মান্তিক দুর্ঘটনা!

'কতক্ষণ পর তাকে পাওয়া গিয়েছিল?'

'প্রায় দু'মাস পর।'

দু'মাস! আমি ভেবেছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই বুঝি ডুবে যাওয়া লোকের সন্ধান মেলে।

'কোথায় পাওয়া গেল?'

'চ্যানেল থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এজকোম্বের কাছে।'

'দু'মাস পর কি করে তাকে চেনা গেল?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে এক একটি কথার মাঝে সে থেমে থেমে যাচ্ছে। তাকে কত সন্তর্পণে প্রতিটি কথা ওজন করে বলতে হচ্ছে। আমার মনে সহসা আবার সেই ভাবনাটি উঁকি দিল। হয়তো তাকে সে ভালবাসতো বলেই তার কথা বলতে এত কষ্ট হচ্ছে তাব!

'ম্যাক্সিম তাঁকে সনাক্ত করতে গিয়েছিল।'

ভাবলাম আর প্রশ্ন করবো না। হঠাৎ কেমন অসুস্থ বোধ করলাম। নিজের ওপর বিরক্তি এবং ঘৃণাও হোল কম নয়। কাউকে বেদম প্রহার করবার দৃশ্যযেন কৌতূহলী, নির্বিকার দর্শকের মত দেখছি আমি।

আপন কৌতূহল মেটাবার জন্য অবুঝের মত যা খুশি প্রশ্ন করে যাচ্ছি তাকে। ফ্র্যাঙ্ক আমাকে নিশ্চয় ঘৃণা করবে এজন্য। তার চোখে না জানি কত ছোট হয়ে গেলাম! তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'সে সব দিনের কথা মনে করতে আপনাদের ভাল লাগেনা, তা বুঝি। আমি শুধু ভাবছিলাম ওই কুটিরের মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো কোনরকমে রক্ষা করা যায় কিনা।' সে এবার কোন উত্তর দিল না। আমি আবার বড় অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল শুধুমাত্র কুটিরের কথা ভেবেই আমি তাকে এতগুলো প্রশ্ন করিনি। আমাদের দু'জনের মধ্যে অজানিতেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল! তাকে আমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলেই পেয়েছিলাম। বোধহয় নিজ হাতেই সেই মধুর সম্পর্ক আজ নষ্ট করে দিলাম। আর সে আমাকে আগের মত বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে না পারলে সে দোষ সম্পূর্ণ আমার।

'ওঃ! পথ যে আর ফুরোয় না। এখানে গাছগুলি জড়াজড়ি করে কী নিবিড় অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে! তাই বোধহয় পথটাকে অকারণ

দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে!' আমি বলে উঠলাম। তার ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারলাম সে তখনও আমার কাছ থেকে আরও প্রশ্ন শোনবার আশঙ্কায় সাবধান হয়ে আছে। সত্যি আমাদের দু'জনের মধ্যে কেমন একটা অসহজভাব গড়ে উঠেছে।

নিজেকে যদি আরও ঘৃণার কালিমায় ডুবাতে হয় তবুও এই অবস্থার প্রতিকার আমাকে করতেই হবে! অন্য কোন উপায় নেই দেখে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পারছি। আপনাকে কেন আজ এত প্রশ্ন করলাম তার কারণ বোধহয় বুঝতে পারছেন না। হয়তো ভাবছেন কৌতূহল মেটাবার জন্যই আমি অভদ্রভাবে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছি। বিশ্বাস করুন, তা নয়। ম্যাণ্ডারলের জীবনে মাঝে মাঝে আমাকে বড় বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার জীবন এখানকার পরিবেশের উপযুক্ত হবার মত করে গড়ে ওঠেনি। এখানকার সকলেই আমার দিকে অবাক হয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। আমি জানি তাদের সেই দৃষ্টির অর্থ তারা ভাবে ম্যাক্সিম কেন একে বিয়ে করলো! কি দেখলো সে এই অতি সাধারণ নগণ্য গ্রাম্য মেয়েটির মধ্যে! আমিও তখন অবাক হয়ে ভাবি, আমার মনেও দ্বিধা জাগে, কেমন একটা অশান্তি বোধ করি এই ভেবে কেন আমি তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হলাম! আমি তো তাঁর উপযুক্ত নই। আমরা নিশ্চয় সুখী হবো না। এখানকার সবাই আমাকে দেখে ভাবছে সেই একই ভাবনা,' রেবেকার চেয়ে আমি কত অন্যরকম।' আমার মনের ব্যথা অবারিত করে দিয়ে আমি এবার নীরব হলাম। এর প্রতিক্রিয়া এখন যাই হোক, অস্পষ্টতার সকল আবরণ নিজ হাতেই ঘুচিয়ে দিলাম। সে আমার দিকে ফিরে তাকালো। তার মুখে দুশ্চিন্তা মাখানো বিষাদের ছায়া পড়েছে।

'মিসেস ডি উইণ্টার, দয়া করে এসব ভাববেন না। আমার নিজের

কথা বলছি, ম্যাক্সিম আপনাকে বিয়ে করায় আমি যে কী খুশি হয়েছি ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবো না। তার জীবন এবার বদলে যাবে। আমি জানি আপনি তাকে সুখী করতে পারবেন। আপনার মত মেয়েকে বিয়ে করা সত্যি খুব ভাগ্যের কথা। আপনার মত সহজ, সুন্দর মেয়ে সবদিক দিয়েই ম্যাণ্ডারলের উপযুক্ত। এখানে আপনার বিরুদ্ধ সমালোচনা যদি কেউ করে থাকে তাহলে তারা খুব অন্যায় করেছে। আমি তো কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে শুনলে এমন ব্যবস্থাই করবো যাতে আর কোনদিন তারা তা উচ্চারণ করতে না পারে।'

'সেটা আপনার উদার মনের পরিচয়। কিন্তু জানি এখানে আমি কত বেমানান। আমি সামাজিক নই, লোকের সাথে কিরকম ব্যবহার করতে হয় তাও জানি না। সব সময়ে মনে হয় আমার মত চেষ্টা করে তাকে কিছু করতে হোত না! আভিজাত্য এবং বংশ মর্যাদার গুণে তার কাছে সব কাজই না জানি কত সহজ মনে হোত। আর আমি! আমার আত্মবিশ্বাস নেই, আভিজাত্য নেই, রূপ নেই, বুদ্ধি নেই—কোন গুণের বালাই নেই। কিন্তু তার রূপ ও গুণ দুই-ই ছিল। আমার অভাব আমি তো ভুলতে পারি না।' সে কোন কথা বললো না। তাকে আবার বড় চিন্তিত, বিষণ্ণ মনে হোল। একটু পরে বললো, 'অনুরোধ করছি এমন করে বলবেন না!'

'যা সত্যি তা-ই বলছি।'

'আপনার যে গুণ আছে তার মূল্য অনেক। আমি অবিবাহিত, মেয়েদের কথা বিশেষ জানিও না। কিন্তু তবুও বলছি আপনার মধ্যে আমি যে সহজ সরলতা, শালীনতা, বিনয় এবং মনের নির্মল মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছি তার মূল্য যে কোন পুরুষের কাছে, যে কোন স্বামীর কাছে অক্ষয় সম্পদ। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য এবং চাতুর্য একত্র হলেও তার কাছে তুচ্ছ।' তাকে এবার একটু উত্তেজিত মনে হোল।

আমার যে সব গুণের কথা সে বললো রেবেকারও নিশ্চয় সে সব গুণ ছিল। তার অদ্ভুত জনপ্রিয়তা দেখেই তা বোঝা যায়। তবু কেন সে এমন করে আমাকে এসব বললো বুঝতে না পেরে অবাক হলাম। আবার সে বলে উঠলো, 'আমার মনে হয় আপনি এসব ভাবেন জানলে ম্যাক্সিম খুব ব্যথা পাবে মনে, চিন্তিতও হবে।'

'আপনি কি তাঁকে বলবেন?'

'না। আমি তাকে খুব ভাল করে জানি মিসেস ডি উইণ্টার। আপনি অতীতের কথা ভেবে এত কষ্ট পাচ্ছেন জানলে সে খুব আঘাত পাবে। বিশ্বাস করুন আমায়, এখন সে বেশ সুখে আছে। তার শরীরও ভাল হয়েছে। মিসেস লেসি সেদিন বলেছিলেন ম্যাক্সিম গেল বছর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। অবশ্য ম্যাক্সিমের সামনে সে কথা বলা তাঁর উচিত হয়নি। তাই বলছি আপনিই তাকে বদলে দিয়েছেন। আপনার অল্প বয়স, সহজ সুন্দর মন তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছে। ম্যাণ্ডারলের অতীতের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। সেসব কথা নিঃশেষে ভুলে যান, এই আমার একান্ত অনুরোধ মিসেস ডি উইণ্টার। ভুলে যান, যেমন করে ম্যাক্সিম এবং আমরা সবাই ভুলে গেছি। সে সব দিনের চিন্তাও ম্যাক্সিমের কাছে মৃত্যুর সমান। অতীতকে নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য আপনার সাহায্যই তার একান্ত প্রয়োজন। আপনিই তা পারবেন।' সহসা আমার মনে হোল খুব সত্য কথাই সে বলেছে। ফ্র্যাঙ্ক আমার বন্ধু, সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি নিজের দীনতায় আপন স্বার্থ চিন্তায় এতক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরছিলাম। আর কারও কথা চিন্তা করিনি। এ যে আমার কত বড় অন্যায় ফ্র্যাঙ্ক তা আমাকে বুঝিয়ে দিল।

'আপনাকে সব কথা অনেক আগেই আমার বলা উচিত ছিল।'

'হাঁ। তাহলে অকারণ ভাবনায় এত কষ্ট পেতেন না।'

'এখন আমার মন হালকা হয়ে গেছে। কোন ভাবনা আর নেই। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন আপনাকে চিরদিন আমি আমার বন্ধু ভাবে পাবতো ?'

'নিশ্চয় !'

ছায়াঘন পথ পেরিয়ে আমরা ফাঁকা পথের আলোয় এসে পড়েছি। রডোডেনড্রনেরা হেলে দুলে আমাদের গায়ের ওপর পড়ছে। এবার তাদের বিদায়ের পালা। কয়েক দিনের মাঝেই তাদের পাপড়ি পথের বুকে ঝরে ঝরে পড়বে। মালিরা এসে পরিষ্কার করে দেবে ঝরা পাপড়ির যত জঞ্জাল। তাদের যৌবন যে ক্ষণকালের !

'আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করবো। ঠিক জবাব দেবেন কথা দিন।' আমি বললাম। আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললো, 'এমন কোন প্রশ্ন করবেন নাতো যার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব !'

'না। সে রকম প্রশ্ন নয়।'

'বেশ, জিজ্ঞেস করুন।'

পথের শেষ হয়েছে। ম্যাণ্ডারলে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার চিরকালের অতুলনীয় শোভা আর সৌন্দর্য নিয়ে। জানালার কাচে রোদের টুকরো ঝিকিমিকি করছে। লাইব্রেরি ঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে এঁকে বেঁকে ! নখ কাটতে কাটতে ফ্র্যাঙ্কের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললাম 'রেবেকা কি খুব সুন্দরী ছিল ?' ফ্র্যাঙ্ক একমুহূর্ত চুপ করে রইলো। আমি তার মুখ দেখতে পেলাম না। সে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে বললো, 'হাঁ। জীবনে ওরকম সুন্দরী আমি আর দেখিনি !'

আমরা দু'জনে এবার হলঘরের মধ্যে এসে গেছি। আমি চায়ের জন্য ঘণ্টা বাজালাম।

॥ ১২ ॥

আজকাল মিসেস ডানভারসকে বেশি দেখতে পাই না। বসবার ঘরে সকাল বেলায় ফোন করে আমাকে খাবারের মেনু জানাতে সে একদিনও ভোলে না। ক্ল্যারিস বলে একটি মেয়েকে সে আমার কাজ করবার জন্য ঠিক করে দিয়েছে। ম্যাণ্ডারলের এক কর্মচারির মেয়ে, ব্যবহারও ভারি মিষ্টি। এর আগে আর কোথাও কাজ করেনি বলে মেয়েটি খুব সরল, সাধারণ। প্রথম থেকেই তাকে আমার ভাল লেগেছে। আমার মনে হয় বাড়ির মধ্যে একমাত্র সে-ই আমাকে সমীহ করে, বাড়ির কর্ত্রী বলে ভাবে। তার কাছে সত্যি আমি 'মিসেস ডি উইণ্টার'! আমার সম্বন্ধে অন্যদের বিরুদ্ধ সমালোচনা তাকে এতটুকুও স্পর্শ করতে পারেনি। ম্যাণ্ডারলে থেকে পনের মাইল দূরে সে তার মাসিমার কাছে প্রতিপালিত হয়েছে বলে এখানে সে আমারই মত আগন্তুক। তাই তার কাছে আমার এতটুকুও সঙ্কোচ ছিল না। কোন দ্বিধা না করে তাকে যে কোন কাজ করবার নির্দেশ দিতে পারতাম। কিন্তু এলিস ছিল একেবারে অন্য ধরণের মেয়ে, ম্যাণ্ডারলের অন্য সবার মতই বড় আত্ম-সচেতন। তখন আমি আমার সেমিজ এবং রাত্রির পোশাক লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেই রিফু করে নিয়েছি কিন্তু কোনদিন তাকে বলতে পারিনি। একবার আমার সেমিজ হাতে নিয়ে তার সাধারণ কাপড় আর সরু লেস পরীক্ষা করে সে দেখছিল, তখন তার মুখের ভাব যে রকম হয়েছিল আমি তা জীবনেও ভুলতে পারবোনা। অমন সাধারণ পোশাক দেখে সে খুব আঘাত পেয়েছিল বোধহয়। মনে হোল তার নিজেরই মর্যাদা বুঝি ক্ষুণ্ণ হোল। আমি কোনদিনও আমার পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশি ভাবিনি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে কাপড় ও লেস বেশি

দামের কি কম দামের হোল তা একবারও মনে হোত না। কিন্তু সেদিন এলিসের মুখের সেই বিচিত্র ভাব আমাকে যেন একটা শিক্ষা দিল। সেদিনই লণ্ডনের এক দোকানে চিঠি লিখে পোশাকের ক্যাটালগ চেয়ে পাঠালাম। কিন্তু অর্ডার দেবার আগেই এলিসের জায়গায় ক্ল্যারিস এলো। তখন ভাবলাম অত দাম দিয়ে পোশাক কিনে আর কি হবে। সেই ক্যাটালগ কোথায় কোন্ দেরাজে অবহেলায় পড়ে রইলো কে জানে!

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি এলিস কি আমার সেমিজের কথা অন্য পরিচারিকাদের কাছেও বলেছে! না জানি তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে কত কি ব্যঙ্গোক্তি করেছে! ক্ল্যারিস আবার এত সাধারণ যে সে কোনদিনই দামী আর সস্তা জিনিসের তারতম্য বুঝতে পারবে না। ডানভারস আমার কথা ভেবেই হয়তো আমার কাজে তাকে বহাল করেছে। সে ঠিক বুঝেছে ক্ল্যারিসের মত গেঁয়ো মেয়েই আমার উপযুক্ত।

আমার ওপর ডানভারসের রাগের আসল কারণ জানবার পর থেকে তার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব অনেক সহজ হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি ব্যক্তিগত ভাবে আমার ওপর তার কোন রাগ নেই, আমি যে জায়গায় এসেছি তারই জন্য তার যত আক্রোশ। রেবেকার জায়গায় আমি না হয়ে অন্য যে কেউ এলে সে এমনি অসন্তোষ প্রকাশ করতো তার ওপর। বিয়েট্রিস সেদিন বলেছিল, 'তুমি জান না, রেবেকাকে সে অন্ধের মত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।' কথাটা শুনে প্রথম কেমন যেন আঘাত পেয়েছিলাম। ঠিক ওই কথা শোনবার জন্য আমার মন বুঝি তৈরী ছিল না। কিন্তু তারপর অনেক চিন্তার পর এটাই একান্ত স্বাভাবিক ভেবে তার সম্বন্ধে আমার ভয় কমে যেতে লাগলো। ভয়ের পরিবর্তে তার ওপর আমার করুণা হতে লাগলো। তার মনের অবস্থা অনুভব করে তার জন্য দুঃখও হোল। ভাবতাম আমাকে মিসেস ডি উইণ্টার ডাকতে শুনলে নিশ্চয়ই তার মনটা ব্যথায় গুমড়ে

ওঠে। রোজ সকালে আমি ফোন তুলে যখন তাকে ডেকে বলি, 'হাঁ, মিসেস ডানভারস,' সে তখন নিশ্চয় আর একটি স্বর শোনবার আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে। ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস তার স্পর্শের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই মাঝে আমাকে দেখে দেখে যার কথা তার মনে পড়ে সে তো আমি নই! আমি তো রেবেকাকে দেখিনি। তবু কেন ফিরে ফিরে আমারও কেবল মনে পড়ে তারই কথা! ডানভারস জানে সে কি ভাবে কথা বলতো, কি ভাবে হাঁটতো। তার প্রতিটি ভাবভঙ্গি তার কত পরিচিত। তার চোখের রঙ, তার হাসি, তার চুলের গঠন, সবই তার চেনা। আমি তো তার কিছুই জানি না। এসব কথা কোনদিন কাউকে জিজ্ঞেসও করিনি, তবু এক এক সময় আমারই মনে হয়, আমি অনুভব করি ডানভারসের কাছে সে যেমন প্রাণবন্ত আমার কাছেও বুঝি তাই।

ফ্র্যাঙ্ক আমাকে বলেছে ম্যাণ্ডারলের অতীতকে ভুলে যেতে। আমিও তো ভুলতেই চাই। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ককে তো বসবার ঘরে বসে প্রতিদিন আমার মত তার কলম নিয়ে লিখতে হয় না, তারই বাঁকা লেখা সব সময় চোখের ওপর দেখতে হয় না। ভুলতে পারা যে কত অসম্ভব তা সে বুঝতে পারতো যদি আমারই মত তাকে রেবেকার প্রতিটি জিনিস দেখতে হোত, স্পর্শ করতে হোত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে! লাইব্রেরি ঘরে আমার পায়ের শব্দ শুনে জেসপারের মা যখন তার বাস্কেট থেকে একটু উঠে মাথা উঁচু করে আগ্রহভরে তাকিয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকে তখনি আবার নির্বিকার ভাবে শুয়ে পড়ে সে যাকে দেখতে চায় তাকে না দেখতে পেয়ে, আমার তখনকার মনের অবস্থা ফ্র্যাঙ্ক কি করে বুঝবে! এ যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু অনুভব করি। রেবেকার কথা ভাবতে আমিও তো চাইনি! আমি চেয়েছি সুখী হতে, ম্যাক্সিমকে সুখী করতে। আমাদের দু'জনের একক জীবনকে সব দিক দিয়ে সুন্দর, সার্থক করার

স্বপ্নই আমি দেখেছি। আমার জীবনে এ ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু এখন যে আমার সকল ভাবনা জুড়ে সে রয়েছে, কি করে আমার মন থেকে তাকে দূর করবো জানি না। ম্যাণ্ডারলে এখন তো আমারই বাড়ি। কিন্তু রেবেকার স্মৃতি জড়ানো প্রতিটি জিনিস অনুক্ষণ আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমিই বুঝি এখানে দু'দিনের অতিথি!

একদিন সকাল বেলায় বাগান থেকে একরাশ লিলাক তুলে এনে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে ফার্থকে বললাম, 'একটা লম্বা ফুলদানি দাও তো, লিলাকগুলো রাখবো।'

'ড্রয়িংরুমের শ্বেত পাথরের ফুলদানিটি বরাবর লিলাকের জন্য ব্যবহার করা হয়।'

'ও। কিন্তু সেটা আবার ভেঙ্গে যাবে না তো?'

'মিসেস ডি উইণ্টার ওটাই ব্যবহার করতেন।'

'ও।'

তারপর সেই শ্বেত পাথরের ফুলদানিটি জল ভরে সে আমার কাছে নিয়ে এলো। আমি একটি একটি করে লিলাক গুচ্ছ তাতে সাজিয়ে রাখলাম। ভোরবেলাকার মৃদুমন্দ বাতাসের সাথে তাদের স্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে পড়লো ঘরের চারিদিকে। হঠাৎ আমার মন বলে উঠলো রেবেকাও এই রকম করতো। আমার মত সেও এমনি করে এই শুভ্র ফুলদানিতে লিলাক গুচ্ছ একটি একটি করে সাজিয়ে রেখেছে।

'ফার্থ, টেবিল থেকে ঐ বইয়ের তাকটি সরিয়ে জানালার ওপর রাখলে ফুলদানিটা ওখানে রাখতে পারি।'

'মিসেস ডি উইণ্টার ফুলদানিটি সর্বদা সোফার পিছনে বড় টেবিলটির ওপরে রাখতেন।'

'ও, আচ্ছা।' ফুলদানিটি হাতে করে আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। ফার্থের দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ ভাবহীন, নির্বিকার। আমি ছোট

টেবিলটির ওপর ওটা রাখতে বললে ফার্থ আমার নির্দেশমতই কাজ করতো তা জানি। কিন্তু তবুও আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা, ওখানেই রাখা যাক।' শ্বেত পাথরের ফুলদানিটি ম্যাণ্ডারলের এতকালের নিয়ম রক্ষা করে সোফার পেছনে বড় টেবিলের ওপরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

একদিন সকালে রবার্ট আমার কাছে একটা বিরাট পার্শেল নিয়ে এলো। আমি তখন বসবার ঘরে বসে অন্যদিনের মত সেদিনকার খাবারের তালিকায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। পার্শেলটি দেখে ছেলেমানুষের মত আনন্দে মন নেচে উঠলো। উত্তেজনায় খুব তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলে দেখি চারটে বই, অঙ্কন বিদ্যার ইতিহাসের চার অধ্যায়। তার সাথে একটুকরো কাগজে লেখা রয়েছে, 'আশাকরি এই উপহার তোমার মনমত হবে।' বইগুলোর প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে, 'বিয়েট্রিসের প্রীতি-উপহার।'

আমার কল্পনায় ভেসে উঠলো বিয়েট্রিসের বই কেনবার সময়কার ব্যস্ত সমস্ত চেহারাখানি। আমি যেন এখানে বসেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে। সত্যি বিয়েট্রিস কত ভাল। আমি আঁকতে ভালবাসি বলে সে নিজে কষ্ট করে বই কিনতে দোকানে গেছে ভাবতেই তার প্রতি আমার মন ভালবাসায় ভরে উঠলো।

বইগুলো কোথায় রাখবো তাই ভাবতে লাগলাম। এই ঘরে তো এখন আমার একচ্ছত্র অধিকার, তাই যেমন খুশি এগুলো আমি এখানে রাখতে পারি ভেবে ডেস্কের ওপর তাকে বইগুলি রেখে দিলাম। কিন্তু সেখানে জায়গা এত অল্প ছিল যে তারা একটির গায়ে আরেকটি ঘেঁষাঘেঁষি করে টলায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ কি করে ধাক্কা লেগে একটা বই পড়ে গেল। ডেস্কের ওপর একটা চীনা কিউপিড আর দু'একটা মোমদানি ছাড়া আর কিছু ছিল না। বইখানি সেই কিউপিডের ওপর পড়ে গেলে সেটা মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কেউ আবার দেখে ফেললো কিনা দেখবার জন্য

অপরাধী শিশুর মত দরজার দিকে তাকালাম। সেই ভাঙা টুকরো-গুলো আস্তে আস্তে মেঝে থেকে তুলে একখানি খামে ভরে ডেস্কের দেরাজের পেছনে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর বই কয়টি ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরিতে বইয়ের শেলফে রেখে দিলাম। ম্যাক্সিম তখন লাইব্রেরিতেই ছিল। বিয়েট্রিস বই উপহার পাঠিয়েছে শুনে সে তো হেসেই অস্থির।

'বী পাঠিয়েছে! ভারি আশ্চর্য তো! তাহলে তোমার বাহাদুরি আছে বলতে হবে। কারণ সে তো কখনও কোন বইয়ের পাতা ওল্টায় না বলেই জানি।'

'আচ্ছা, আমাকে তার কেমন লেগেছে সে কথা তোমায় কিছু বলে নি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কবে? সেদিন? কই, না-তো!'

'আমি ভেবেছি চিঠিতে অন্তত তার মতামত তোমায় জানিয়েছে।'

'আমাদের পরিবারে কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটলে, খুব প্রয়োজন না হলে আমরা দু' ভাইবোনে কখনও চিঠিপত্র লেখালেখি করি না। চিঠি লেখা মানে সময়ের অপব্যয়।' বুঝলাম আমার ম্যাণ্ডারলে আসা তেমন কোন বিশেষ ঘটনার পর্যায়ে পড়ে না। আমার কথা লিখবার মত কিইবা আছে! কিন্তু আমি যদি বিয়েট্রিস হতাম আর আমার যদি একটি ভাই থাকতো তাহলে সে ভাই বিয়ে করলে তার বৌকে আমার কেমন লাগলো সে কথা কি ভাইকে দু' এক কলম লিখে জানাতাম না! অবশ্য তাকে ভাল না লাগলে, অনুপযুক্ত মনে হলে কিছু না লিখে এরকম নির্বিকার থাকাটাই একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিয়েট্রিস উপহার দেবার জন্য এত কষ্ট করে নিজে লণ্ডনে গিয়ে বই কিনেছে বলেই আমার মনে কেমন একটু ক্ষীণ আশা জেগেছিল আমাকে হয়তো বা তার একটু ভাল লাগলেও লাগতে পারে।

পরের দিন খাওয়ার পর লাইব্রেরিতে কফি এনে ফার্থ ম্যাক্সিমের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে সে বললো, 'স্যার একটা কথা বলবো।' ম্যাক্সিম খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো।

'হাঁ, বল। কি ব্যাপার ফার্থ?' ফার্থের গম্ভীর থমথমে মুখখানা দেখে ম্যাক্সিমের বেশ ভাবনা হয়েছে বুঝলাম। আমি তো ভাবলাম বুঝি বা তার স্ত্রীই মারা গেছে!

'মিসেস ডানভারস আর রবার্টের মধ্যে একটু অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে স্যার। রবার্ট খুব দমে গেছে।'

'ওঃ ভগবান! এ-ই তোমার কথা!' ম্যাক্সিম একটা মুখভঙ্গি করে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

'হাঁ স্যার। রবার্টের বিরুদ্ধে মিসেস ডানভারসের অভিযোগ সে বসবার ঘর থেকে কি একটা দামী জিনিস নাকি সরিয়েছে। রোজ সকালে রবার্ট ফুল নিয়ে এসে সেই ঘরে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে। মিসেস ডানভারস আজ গিয়ে দেখেন সেই জিনিসটি ঘরে নেই। কালও সেটা সেখানে ছিল। তার ধারণা রবার্ট সেটা লুকিয়েছে অথবা ভেঙ্গে ফেলেছে। রবার্ট বলছে সে কিছুই জানে না। সে প্রায় কেঁদে ফেলেছে, স্যার। লক্ষ্য করে থাকবেন লাঞ্চের সময় সে কিরকম আনমনা হয়ে ছিল।'

'তাইতো! এখন বুঝতে পারছি, প্লেট না দিয়েই কেন সে আমাকে কাটলেট দিতে যাচ্ছিল! সে না ভাঙ্গলে অন্য কেউ ভেঙ্গেছে হয়তো।'

'কিন্তু আজ সকালে রবার্টই প্রথম ফুল নিয়ে ও ঘরে গেছে। আমাদের দু'জনের পক্ষেই ব্যাপারটা বড় লজ্জার।'

'তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, মিসেস ডানভারসকে ডেকে নিয়ে এসো। ও হাঁ, কোন্ জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে না?'

'চীনা কিউপিড, সেটা লেখবার টেবিলের উপর ছিল।'

'ও।'

ফার্থ চলে গেল। ম্যাক্সিম আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'কী কাণ্ড! ওই কিউপিডের কিই বা মূল্য! কিন্তু মজা দেখ, এরা কি ব্যাপার করে তুলেছে। আমার কাছে কেন এরা এসব ব্যাপার নিয়ে আসে তাও বুঝি না। এসব কিন্তু তোমারই কাজ।'

আমার মুখচোখ তখন আগুনের হল্‌কায় লাল টকটকে হয়ে গেছে মনে হোল। তবুও কোন রকমে বলে ফেললাম, 'তোমাকে আগেই বলবো ভেবেছিলাম কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি কাল আমিই কিউপিডটা ভেঙ্গে ফেলেছি।'

'সে কি! তুমি ভেঙ্গেছ! তাহলে ফার্থের সামনেই বললে না কেন?'

'সে আমাকে কি ভাবতো?'

'এখন যে মিসেস ডানভারস আর ফার্থের সামনে সব খুলে বলতে হবে।'

'না, না লক্ষীটি তুমিই তাদের বল। আমি ওপরে যাচ্ছি।'

'তা হয় না। ওরা ভাববে তুমি ওদের ভয় করছো।'

'সত্যিই আমার বড় ভয় হচ্ছে। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু....'

এমন সময় দরজা খুলে ডানভারস আর ফার্থ ঘরে ঢুকলো। আমি ভয়ে ভয়ে ম্যাক্সিমের দিকে তাকালাম। ম্যাক্সিম একটু বিরক্ত হলেও সমস্ত ব্যাপারটায় বেশ আমোদ পেয়েছে মনে হোল। সে একটু হেসে বলে উঠলো, 'ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভুল হয়েছে মিসেস ডানভারস। মিসেস ডি উইণ্টারই ওটা ভেঙ্গে ফেলেছেন। কিন্তু সেকথা জানাতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।'

তারা দু'জনে আমার দিকে তাকালো। আমি অপরাধীর মত ডানভারসের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণস্বরে বললাম, 'এজন্য আমি খুব দুঃখিত। আমি ভাবতেই পারিনি যে রবার্ট এজন্য বিপদে পড়বে।'

'ওটাকে কি আবার জোড়া লাগিয়ে ঠিক করা যাবে?' ডানভারস আমাকে প্রশ্ন করলো। তার মুখ চোখ দেখে মনে হল জিনিসটা আমি ভেঙেছি শুনে সে এতটুকুও আশ্চর্য হয়নি। তার কঙ্কালের মত মুখ থেকে কালো চোখ দু'টি আমারই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সহসা অনুভব করলাম সে প্রথম থেকেই জানতো আমিই জিনিসটা ভেঙেছি। সত্যি কথা স্বীকার করবার মত সাহস আমার আছে কি নেই তা জানবার জন্যে সে ইচ্ছে করেই রবার্টের ওপর দোষ দিয়েছে।

'না, ও আর জোড়া লাগবে না। ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

'টুকরোগুলো কি করলে?' ম্যাক্সিম এবার জিজ্ঞেস করলো। এ যেন ঠিক বন্দী আসামীর মত জেরার পর জেরার উত্তর দেওয়া!

'একটা খামের মধ্যে পুরে রেখে দিয়েছি।'

'তারপর সেই খামটা কি করেছো?' সিগারেট ধরাতে ধরাতে ম্যাক্সিম আবার প্রশ্ন করলো। তার স্বরে কৌতুকের আভাস। সে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে।

'লেখবার টেবিলের দেরাজের পেছনে রেখে দিয়েছি।'

'মিসেস ডি উইন্টার ভেবেছিলেন ব্যাপারটা তুমি জানতে পারলে বুঝিবা তাঁকে জেলেই দেবে।' ম্যাক্সিম ডানভারসের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললো। তারপর ফার্থের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা ফার্থ, রবার্টকে বল এবার চোখের জল মুছে ফেলতে।'

ফার্থ চলে গেলে ডানভারস তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে সে বললো, 'রবার্টের কাছে এজন্য আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু তার ওপর সন্দেহ হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক। মিসেস ডি উইন্টার এটা ভাঙতে পারেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। ভবিষ্যতে

এরকম কিছু ঘটলে আশাকরি উনি আমাকে সময়মত জানাবেন। তা হলে আর এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হবে না।'

'তা ঠিক। আমি তো ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি কেন উনি কালকেই তোমাকে বললেন না একথা।' ম্যাক্সিম বললো।

'হয়তো মিসেস ডি উইণ্টার জানেন না জিনিসটা কত দামী।'

'সে কথা আমারও মনে হয়েছে। তাই টুকরোগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।' ক্ষীণস্বরে আমি বলে উঠলাম।

'ও, তাই বুঝি যত্ন করে একেবারে দেরাজের পেছনে সেগুলো লুকিয়ে রেখেছ যাতে কেউ আর খুঁজে না পায়!' কাঁধ বেঁকিয়ে ম্যাক্সিম এবার জোরে হেসে উঠলো।

'বসবার ঘরে কোনদিন কিছু ভাঙ্গেনি। গেল বছর থেকে আমি নিজেই সে ঘরের ধুলো ঝাড়ছি। মিসেস ডি উইণ্টার বেঁচে থাকতে আমরা দু'জনে মিলে ওঘরের সব আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখতাম।'

'যা হবার হয়ে গেছে। কি আর হবে। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।' ম্যাক্সিমও এবার বেশ গম্ভীর স্বরে আদেশের সুরে বলে উঠলো।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ম্যাক্সিম কাগজ পড়তে লাগলো।

একটু পরে নীরবতা ভেঙ্গে তার দিকে ফিরে বললাম, 'শোন, সত্যি আমি খুব লজ্জিত এজন্য। আমার অসাবধানতার জন্যই ওটা ভেঙ্গেছে, কি করে যে পড়ে গেল বুঝতে পারলাম না।'

'কি ছেলেমানুষি হচ্ছে বলতো! ব্যাপারটা যে কিছুই নয়।'

'আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মিসেস ডানভারস নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রেগে গেছে।'

'সে রাগ করবে কেন? কি বলছো পাগলের মত! জিনিসটা তো তার নয়!'

'কিন্তু ওঘরের প্রতিটি জিনিস তার কত প্রিয়। তাছাড়া এর আগে কোনদিন কিছু ভাঙ্গেনি। আমিই প্রথম ভাঙ্গলাম।'

'বেচারা রবার্ট না ভেঙ্গে তুমি যে ভেঙ্গেছ একদিক দিয়ে তা ভালই হয়েছে।'

'কিন্তু মিসেস ডানভারস এজন্য কখনও আমায় ক্ষমা করবে না।'

'আঃ, তার কথা ভেবে কেন এত মন খারাপ করছো? তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তাকে তোমার এত ভয় কেন?'

'না, ঠিক ভয় নয়। আমার মনের ভাব আমি বোঝাতে পারছি না।'

'ওটা ভেঙ্গে যাবার পর তাকে ডেকে যদি জানিয়ে দিতে তাহলে সে কিছুই ভাবতো না। কিন্তু তা না করে তুমি টুকরোগুলো খামে পুরে দেরাজের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে। এ যে একেবারে ছেলেমানুষি; অনভিজ্ঞ নূতন কোন পরিচারিকার মত কাজ। বাড়ির কর্ত্রীর মত তো নয়!'

'তুমি ঠিকই বলেছ। অনেক দিক দিয়ে ক্ল্যারিসের সাথেই আমার মিল রয়েছে। আমরা যেন একই পর্যায়ের। হয় তো এজন্যই সে আমায় ভালবাসে। একদিন তার মা আমায় কি বলেছে জান? ক্ল্যারিস আমার কাছে থেকে খুশি হয়েছে কিনা প্রশ্ন করলে তার মা বলেছিল, 'হাঁ, মিসেস ডি উইণ্টার, ক্ল্যারি খুব সুখে আছে। আপনার কথা ও বলে, 'উনি বাড়ির কর্ত্রীর মত নন, আমাদেরই একজন যেন, একেবারে বন্ধুর মত।' কিন্তু কই, বিসপের স্ত্রী তো কোনদিন বলেন নি যে আমাকে তাঁদের একজনের মত মনে হয়!'

'তোমার এই পুরানো পোশাক পরে তাঁর ওখানে গেলে কোনদিনই তিনি সেকথা বলবেন না।' ম্যাক্সিম একটু হেসে বললো।

'পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে মানুষকে যারা বিচার করে তাদের কথা আমি ভাবিনা।'

'কিন্তু সেদিন তুমি যে ভাবে সংকুচিত হয়ে তাঁর কথার 'হাঁ' 'না' করে জবাব দিয়ে যাচ্ছিলে চেয়ারের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে, তাতেই তিনি খুব অবাক হয়েছেন বোধহয়।'

'কি করবো, লজ্জা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে আমি তো কত চেষ্টা করছি।'

'না, তোমাকে সে চেষ্টা করতে হবে না আর।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারি মাঝে মাঝে আমার ব্যবহার কত অশোভন হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও আমি সামাজিক হতে পারছি না। তোমার তো চিরকালের অভ্যাস কিন্তু আমি যে এরকম আবহাওয়ায় বড় হইনি!'

'তাতে কি এসে যায়? তুমি কি ভাবছো এসব শুষ্ক সামাজিকতা আমি পছন্দ করি? আমারও খুব খারাপ আর একঘেয়ে লাগে। কিন্তু সমাজে থাকতে হলে না করেও উপায় নেই।'

'আমি তো একঘেয়েমির কথা বলছি না। আমি যে এসব আদব-কায়দা, আচার ব্যবহার একেবারেই জানি না। সবাই আমার দিকে এমন অবাক হয়ে তাকায়, মনে হয় আমি যেন একটা দর্শনীয় জিনিস!'

'তাতে যদি তারা একটু আনন্দ পায় তো পাক না।'

'কিন্তু আমি কেন তাদের সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে আনন্দের খোরাক জোগাবো?'

'কারণ ম্যাণ্ডারলের জীবন-যাত্রা চিরদিন এখানকার সকলের মনে কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছে।'

'কিন্তু আমি তাদের নিরাশ করেছি।' ম্যাক্সিম এবার কোন কথা না বলে কাগজ পড়তে লাগলো। আমি আবার বললাম, 'আমার মনে হয় তুমি জানতে আমার মত নির্জীব, অনভিজ্ঞ, অতি সাধারণ মেয়ে এখানকার

জীবন ধারায় কোনদিন এতটুকুও আলোড়ন জাগাতে পারবেনা। তাই বুঝি আমাকে তুমি বিয়ে করেছো!'

ম্যাক্সিম কাগজটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

'কি বলছো?' তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। গলার স্বরও কেমন কর্কশ, কঠিন!

'কি হোল? অমন করে তাকাচ্ছ কেন?' ভয়ে ভয়ে বললাম।

'কেন বললে ওকথা?'

'এমনিই বলেছি। ওভাবে আমার দিকে তাকিও না! কি করেছি আমি?' অভিমানে, দুঃখে আমার কান্না পেল।

'কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'তাহলে ও কথা বললে কেন?'

'কেন বলেছি জানি না। মনে হোল তাই বললাম। আমি লাজুক, অসামাজিক একথা তো তুমিও জান। লোকের সামনে যেতে আমার ভাল লাগেনা। তাদের সমালোচনায় আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তাই রাগ করে ওকথা বলে ফেলেছি। আর কিছু ভেবে বলিনি। বিশ্বাস কর লক্ষীটি!'

'ওকথা বলা তোমার উচিত হয়নি।'

'তা বুঝতে পারছি। সত্যি খুব অন্যায় হয়েছে।'

দু'হাত পকেটে পুরে ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে সে আমার দিকে কেমন শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর আনমনে খুব আস্তে আস্তে বললো, 'তোমাকে বিয়ে করে আমি খুব স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছি।' একি বলছে সে! আমার সমস্ত শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

'কি বলছো তুমি !'

'ঠিকই বলছি। আমিই তোমার উপযুক্ত নই। তোমার আমার মাঝে অনেক বছরের ব্যবধান! আমাকে বিয়ে না করে তোমারই সমবয়সী কাউকে বিয়ে করলে তুমি সত্যিকারের সুখী হতে। জীবনের অর্ধেক যার কেটে গেছে তাকে বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ।'

'না, না, এরকম করে আর বোল না। বয়সের পার্থক্যে কি এসে যায়। আমরা তো সুখী হয়েছি।'

'আমার তা মনে হয় না।'

আমি এবার ছুটে তার একান্ত কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে আকুল হয়ে বললাম, 'কেন তুমি এসব বলছো! তুমি তো জান আমি তোমায় কত ভালবাসি। আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। তুমিই আমার স-ব!'

আমার কথায় কান না দিয়ে সে বলে যেতে লাগলো, 'না, না, আমারই সব দোষ। আমি তোমাকে বিয়ের জন্য জোর করেছি। ভাববার জন্য এতটুকু সময়ও দিইনি।'

'আমি তো ভাবতে চাইনি। আমি যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকেই চেয়েছিলাম। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না আমার মনের কথা। মানুষের জীবনে যখন ভালবাসা আসে'—বাইরের দিকে তাকিয়ে আমার কথার মাঝখানেই সে বলে উঠলো, 'তুমি কি সুখী হয়েছ? এক এক সময় আমার সন্দেহ হয়। তুমি দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছ, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ, আমি সুখী হয়েছি। সত্যি সুখী হয়েছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি জিনিসকে ভালবাসি। বিশ্বাস কর।'

আনমনে সে আমার চোখে মুখে কপালে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো। 'তোমার জন্য সত্যি আমার কষ্ট হয়। এখানে তোমার জন্য

আনন্দের কোন আয়োজন নেই। আমার মত লোকের সাথে বাস করা সত্যি বড় মুস্কিল।'

'না, না, তা নয়। আমার কাছে তোমার সঙ্গ কত সুখের তুমি কি করে বুঝবে তা? বিয়ের আগে আমার মনে হোত স্বামী না জানি কী ভয়ের বস্তু। কত সমীহ করে হয়তো চলতে হবে তাকে! তোমাকে পেয়ে আমার সে ভয় কেটে গেছে।'

'সত্যি!' এবার একটু হেসে সে বললো। আমিও তার এই হাসির সুযোগ নিয়ে হেসে তার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে চুমু দিলাম।

'আমরা সত্যি কত সুখী হয়েছি, তাই না গো? আমরা কোন ভুল করিনি।'

'তোমার যদি তা মনে হয় তবে তা-ই।'

'না, তুমিও তাই ভাববে। কেন ভাববে না! সত্যি কি আমরা সুখী হইনি? তুমি সুখী হওনি? বল'—

সে কোন উত্তর দিল না। আমি তার হাত দু'খানি ধরে রইলাম। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সহসা আমার চোখ দু'টি জ্বালা করে উঠলো। ওঃ! একি হোল আমাদের! এ যেন আমাদের সত্যিকারের জীবন নয়! রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে দু'জনে যেন অভিনয় করছি! এখনই বুঝি যবনিকা পড়বে। তার হাত ছেড়ে দিয়ে আমি আবার জানালার ধারে গিয়ে বসলাম।

'কি, কথা বলছো না যে!' তার দিকে চেয়ে বললাম। এবার আমার কাছে এসে সেদিনকার মত সে আজও আমার মুখখানি দু'হাতে তুলে ধরলো তার চোখের দিকে। 'কি বলবো? আমি নিজেই এর উত্তর জানিনা। তুমি যদি বল আমরা সুখী হয়েছি তাহলে তাই। আমি কিছু জানি না, তোমার কথাই বিশ্বাস করছি।' আমাকে জড়িয়ে

ধরে একটু আদর করে সে ঘরের ওধারে চলে গেল। আমি দু'হাত কোলে রেখে চুপ করে বসে রইলাম। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনটা আমার হঠাৎ আবার কেমন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে গেল, 'আমাকেই তোমার ভাল লাগে না। তাই ওসব বলছো। সত্যি, আমি ম্যাণ্ডারলের উপযুক্ত নই।'

'আবার আবোল তাবোল বলছো! লক্ষ্মীটি আর নয় এ সব কথা।' অনুরোধের স্বরে সে বলে উঠলো।

'সেই কিউপিডটা ভেঙেছি বলেই তো যত অনর্থের সৃষ্টি হোল।'

'আঃ! আবার সেই কিউপিড! তুমি কি সত্যি ভাবছো যে ওটা ভেঙে যাওয়ায় আমি খুব দুঃখিত!'

'আচ্ছা ওটা কি খুব দামী?'

'কে জানে। হতেও পারে!'

'বসবার ঘরের সব জিনিসই বুঝি দামী?'

'তাই তো মনে হয়।'

'সবচেয়ে মূল্যবান আর সুন্দর জিনিসগুলো কেন ও ঘরে রাখা হয়েছে?'

"ঠিক জানি না। হয়তো সুন্দর দেখাবে বলে!'

'ওগুলো কি ওখানে বরাবর আছে? তোমার মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন থেকে?'

'না। এ ঘরে ও ঘরে সব ছড়ানো ছিল।'

'তাহলে এভাবে কবে থেকে সাজানো হয়েছে?'

'আমার বিয়ের পর থেকে।'

'কিউপিডটা তখন থেকেই ছিল?'

'বোধহয়।'

'ওটাকে এমনই কোথাও খুঁজে পাওয়া গেছে বুঝি?'

'না। খুব সম্ভব ওটা আমাদের বিয়ের উপহার।'

আমি এবার তার দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে নখ ঘষতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পর তার দিকে তাকিয়ে দেখি পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হোল সে তখন রেবেকার কথাই ভাবছে। হয়তো সে মনে করবার চেষ্টা করছিল কিউপিডটা কে উপহার দিয়েছিল! উপহারটি পেয়ে সেদিন রেবেকা কি রকম খুশি হয়েছিল সেই মধুর স্মৃতিও বুঝি তার মনে জাগলো!

'কি ভাবছো?' আমার স্বর খুব শান্ত, স্থির শোনালো। আমার মনের সে সময়কার অস্থিরতা, তিক্ততা কিছুই তাতে প্রকাশ পেল না। সে আবারও একটা সিগারেট ধরালো। খাওয়ার পর এটা নিয়ে বোধহয় পঁচিশটা সিগারেট খাওয়া হোল!

'তেমন কিছু নয়। কেন?'

'না। এমনি। তোমাকে আবার খুব গম্ভীর মনে হচ্ছে। যেন অনেক দূরে চলে গেছ!'

'ভাবছিলাম ওভালে মিডল্ সেক্সের সাথে খেলবার জন্য এবার সারেকে মনোনীত করা হয়েছে কিনা।'

সে এবার চেয়ারে বসে পড়ে কাগজটা খুলে ধরলো। আমি জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জেসপার কোথা থেকে ছুটে এসে আমার কোলে চড়ে বসলো।

॥ ১৩ ॥

জুনের শেষদিকে ম্যাক্সিম দু'দিনের জন্য লণ্ডন গেল। সে যাবে জেনেই আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। ম্যাণ্ডারলের পথের বাঁকে তার গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে গেলে কেন জানিনা মনে হোল এই বুঝি আমাদের শেষ দেখা। কি এক অজানা আশঙ্কায় মনটা গেল ছেয়ে। হয়তো বা তার কোন দুর্ঘটনা ঘটবে, অকারণ এই দুশ্চিন্তার ভারে প্রতি মুহূর্তটিকে মনে হতে লাগলো যেন এক একটি যুগ! ...

বিকেল বেলা একখানি বই কোলে নিয়ে বাদাম গাছের তলায় শূন্য মনে বসে রইলাম। হঠাৎ রবার্টকে এদিকে আসতে দেখে আমার মন আরও উতলা হয়ে উঠলো। রবার্ট বললো, 'ক্লাব থেকে ফোন এসেছে মিঃ ডি উইন্টার নিরাপদে পৌঁছেছেন।' খবরটা শুনে মনটা একনিমেষে হালকা হয়ে গেল। সহসা আমার অসহ্য ক্ষুধার অনুভব হোল। রবার্ট বাড়ির মধ্যে চলে গেলে চুপি চুপি খাবার ঘরে ঢুকে বিস্কুট আর একটি আপেল নিয়ে আবার বাগানে এলাম। খুব সন্তর্পণে খেতে খেতে ভীত চকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম কেউ আবার আমাকে এ অবস্থায় দেখে ফেললো না তো! খাওয়া শেষ হলে খুশি মনে চুপচাপ বসে রইলাম। অবাধ স্বাধীনতার অদ্ভুত এক অনুভূতি আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! ছেলেবেলাকার শনিবারের ছুটির অনু-ভূতির মতই আজকের এই অনুভব! কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, যেমন খুশি তেমনি চলা। ম্যাণ্ডারলে আসার পর এমন অনাবিল স্বাধীনতার স্বাদ আর পাইনি তো কোনদিন! ম্যাক্সিম এখানে নেই বলেই কি আজ নিজেকে এত স্বাধীন মনে হচ্ছে! আশ্চর্য! আমি তো

তার যাওয়া চাইনি, তবে কেন ছেলেমানুষের মত মনটা আজ আনন্দে নেচে উঠছে!

দিনটা আজ কি সুন্দর! চুপ করে বসে না থেকে এখন আনন্দে ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। জেসপারকে ডেকে হ্যাপি ভ্যালির দিকে চললাম। যেতে যেতে দেখি পথের বুকে শৈবালের আস্তরণে এজেলিয়ার পাপড়ির দল পড়ছে ঝরে ঝরে। ব্লুবেলরা তখনও একেবারে ফিকে হয়ে যায়নি। ছোট ছোট আগাছার ঝোপ ঘন হয়ে এখানে ওখানে বেড়ে উঠেছে। লম্বা ঘাসের সবুজ নরম বিছানায় হাত দু'খানি মাথার নিচে দিয়ে আমি সোজা হয়ে শুয়ে পড়লাম এখানকার এই অপরূপ সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখে প্রাণভরে অনুভব করবো বলে। জেসপার আমার পাশে বসে রইলো। কাছেই কোন্ গাছের ওপর থেকে পায়রাদের মৃদু বকবকম্ শুনতে পেলাম। শান্ত এই পরিবেশের মাঝে কেমন এক নিবিড় শান্তির স্পর্শ পাচ্ছি। একা থাকার এমন মাধুর্য জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম। প্রকৃতির এই নির্জন কোলে শুয়ে শুয়ে আমি যে তার বিজন রূপ-লীলা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছি ম্যাক্সিম আমার পাশে থাকলে এমনটি কি সম্ভব হোত! তার পাশে বসে তারই দিকে চেয়ে থাকতাম, সে কি ভাবছে তাই বুঝবার চেষ্টা করতাম। তাকে কেন্দ্র করেই আমার সকল ভাবনা মুখর হয়ে উঠতো। সে আজ আমার পাশে নেই বলেই তো এমন নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনায় শুয়ে আছি। একেলা থাকারও এত সুখ! কিন্তু তাকে বেশিক্ষণ না দেখে থাকাও যে অসম্ভব। সে যে আমার জীবন, আমার সর্বস্ব। তাকে পেয়েছি বলেই তো আজ পৃথিবী আমার চোখে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে এমন ভরপুর!

ভাবনার জাল গুটিয়ে আমি উঠে পড়লাম মাটির কোমল স্পর্শের মায়া কাটিয়ে। এবার সাগরের দিকে চলেছি। সাগরের একান্ত কাছটিতে

এসে দেখি তখন তার শান্ত অচঞ্চল রূপ। এমন শান্ত রূপ দেখে তার ভয়ংকর প্রলয়ের মূর্তি কল্পনাও করা যায় না। সাগর-জল পাহাড়ের কোলে যেখানটিতে খেলা করছে বেলা শেষের পড়ন্ত রোদের সোনালি টুকরো ঝিকিমিকি করছে সেখানে। জেসপার একবার আমার দিকে তাকিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলো। 'ও পথে নয় জেসপার।' আমার কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ও উঠে গেল। আমিও তার পেছনে পেছনে উঠতে লাগলাম। ম্যাক্সিম আজ সাথে নেই, তবে আর ভাবনা কিসের!

ওদিকে গিয়ে দেখি শান্ত সাগরের এই বাঁকটির চেহারাও আজ অন্যরকম। সেই ছোট্ট পোতাশ্রয়ে হয়তো এখন তিনফুটের বেশি জল নেই। বয়াটা সেদিনকার মতই বাঁধা আছে। সেদিন লক্ষ্য করিনি কিন্তু আজ দেখলাম বয়াটি শাদা আর সবুজে রঙ করা। বৃষ্টির জলে রঙের বাহার আগের মত আর নেই। আরও এগিয়ে গিয়ে জেটির পাথরের গাঁথনী দেওয়া রেলিংএর ওপর উঠে দাঁড়ালাম। জেসপারও দৌড়ে আমার আগে আগে যেতে লাগলো। সেই গাঁথনীর দেওয়ালে এক জায়গায় একটা রিং এর সাথে লোহার সিঁড়ি লাগানো রয়েছে। সিঁড়িটা সাগরের মধ্যে চলে গেছে। বুঝলাম এ জায়গাতেই কোন ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা থাকতো, তাতে উঠবার জন্য এই সিঁড়ির আয়োজন। প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে বয়াটি বাঁধা ছিল। উপসাগর ছাড়িয়ে নৌকোটি হয়তো সাগরের মধ্যে অনেক দূর চলে যেত। আমি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একখানি নৌকো কেমন হাওয়ার তালে দুলে দুলে সাগরের বুকে ভেসে চলেছে খেলনার মত! সাগরের জল কখনও বা নৌকোর ওপরেই চল্‌কে চল্‌কে উঠছে। নৌকোর আরোহিণী তার চোখ-মুখ চুল থেকে ঢেউয়ের কণিকা মুছে মুছে ফেলছে। ফ্র্যাঙ্কের কাছে শুনেছি ছোট্ট একটি কেবিনও ছিল তার মধ্যে। জেসপার তখন লোহার সিঁড়িটা শুকছিল। তার

দিকে চেয়ে বললাম, 'চলে এসো জেসপার। তোমার পেছন পেছন আর দৌড়তে পারি না।'

আবার বেলা ভূমির দিকে ফিরে এলাম। বনের প্রান্তে সেই কুটিরটি ঐ যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিনকার মত ওটাকে আজ পরিত্যক্ত, অলুক্ষণে মনে হচ্ছে না। আমি ধীরে ধীরে ওদিকেই চলেছি। যেতে যেতে ভাবছিলাম তারা ওখানে চাঁদিনী রাতে পিকনিক করেছে, কত আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছে। লণ্ডন থেকে কত অতিথি অভ্যাগত হয়তো আসতো এখানে। তারপর তারা নৌকো করে সাগর-বিহার করতো! আনন্দ-কলরবে মুখর সেই কুটির-প্রাঙ্গণ আজ পরিত্যক্ত, শূন্য! কাঁটা গাছে আর আগাছায় বাগানটা গেছে ভরে। বাগানের ছোট্ট দরজাটি ঠেলে কুটিরের দোর গোড়ায় এসে গেছি। দরজা ভেজানো ছিল। সেদিন তো আমি দরজাটা বন্ধ করেই গিয়েছিলাম। জেসপার হঠাৎ গোঁ গোঁ করতে লাগলো। আবছা অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখলাম ভেতরে কোন পরিবর্তন হয়নি। সেদিনকার মতই সব অগোছালো। মডেল নৌকোগুলোর মধ্যে তেমনি মাকড়সার জালের ঠাস বুননি। ওদিককার ঘরের দরজাটিও খোলা। ও ঘরে কি একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হোল। জেসপার এবার ভীষণভাবে চাৎকার করতে করতে ওদিকে ছুটে গেল। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। নিচু হয়ে জেসপারের কলার ধরে উঁকি মেরে দেখি কে যেন এককোণে দেওয়াল ঘেঁষে বসে আছে। তার জড়োসড়ো ভাব দেখে বোঝা গেল সে আমার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি সে বেন! সে তখন নৌকোর পালগুলোর আড়ালে লুকাবার চেষ্টা করছিল।

'একি! কি করছো এখানে?'

সে বোকার মত পিটপিট করে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'কিছু করছি না তো।'

'আঃ জেসপার, চুপ কর না!' জেসপারকে থমকে উঠে আবার বেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কেন এসেছ বেন?' সে কোন উত্তর না দিয়ে তার অবোধ দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরলো। 'এখান থেকে চলে এসো বেন। মিঃ ডি উইন্টার জানতে পারলে রাগ করবেন। এখানে কেউ আসে তিনি তা পছন্দ করেন না।' ডান-হাতের ওপিঠ দিয়ে নাক ঘষতে ঘষতে সে এবার উঠে দাঁড়ালো। তার আরেকটি হাত পেছন দিকে। আমি বললাম 'তোমার হাতে কি আছে?' সে শিশুর মত তখনি তার হাতখানি আমায় খুলে দেখালো। তার হাতের মুঠোয় মাছ ধরার একটি বঁরশি ছিল। 'এই জিনিসটা কি এখানকার?' সে মাথা নাড়লো। 'শোন, ইচ্ছে হলে ওটা তুমি নিতে পার। কিন্তু আর কোনদিন এরকম কোর না, কেমন? অন্যের জিনিস নেওয়া কি ভাল?' সে কোন উত্তর না দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। আমি এবার বেশ জোড় গলায় বললাম, 'চলে এসো বেন।' আমি আর এই কুটিরের মধ্যে থাকতে চাই না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। বেনও আমার পেছন পেছন বেরিয়ে এলো। জেসপার তখন আর চীৎকার করছিল না। সেও বেনের পায়ের কাছে গিয়ে কি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বেরিয়ে এলো। কুটিরের দরজা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে বেনের দিকে ফিরে বললাম, 'এবার বাড়ি যাও বেন।' সে তখন সেই বঁরশিটা একটা মূল্যবান সম্পদের মত বুকের কাছে ধরে আছে।

'আপনি আমাকে পাগলা গারদে দেবেন নাতো?' তাকিয়ে দেখলাম সে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার বড় বড় চোখ দু'টো থেকে অব্যক্ত এক অনুনয়ের সুর ঝরে পড়ছে।

'না, কখনই না।'

'আমি তো কিছু দোষ করিনি। কাউকে কিছু বলিওনি। আমি

পাগলা গারদে যেতে চাই না।' তার নোংরা গাল বেয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়লো।

'কিছু ভেবো না বেন। কেউ তোমায় পাগলা গারদে দেবে না। কিন্তু আর কোনদিন ঐ কুটিরে যেও না, কেমন?' আমি এবার মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগলাম। বেন পেছন পেছন এসে আমার হাত ধরলো। 'এই যে, ওখানে আপনার জন্য একটা জিনিস রেখেছি।' বোকার মত হেসে সে আঙুল দিয়ে বেলাভূমির দিকে দেখালো। আমি তার সাথে সেদিকে গেলাম। সে তখন উপুড় হয়ে একটা পাথর সরিয়ে কতগুলো ঝিনুক বার করলো। তার মধ্য থেকে একটা ঝিনুক বেছে আমার হাতে দিয়ে বললো, 'এটা আপনার।'

'বাঃ! বেশ তো জিনিসটা! আমি খুব খুশি হয়েছি বেন।' তার মুখে আর ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। একটু হেসে সে বলে উঠলো, 'আপনার চোখ দু'টো কী সুন্দর! একেবারে পরীর মত সুন্দর!' কি বলবো ভেবে না পেয়ে আমি হাতের ঝিনুকটিকেই দেখতে লাগলাম।

'আপনি তাঁর মত নন!'

'কার কথা বলছো?'

আনমনে সে এবার বলতে লাগলো, 'তিনি ছিলেন কত লম্বা! তাঁর চোখের দিকে তাকালে সাপের কথা মনে হতো! আমি তাঁকে এখানে কতবার দেখেছি। রাত্রিবেলা তিনি আসতেন।' একটু থেমে বেন আমাকে লক্ষ্য করলো। আমি কিছু বললাম না। আবার সে বলতে লাগলো, 'আমি একবার উঁকি মেরে তাঁকে দেখেছিলাম। উনি আমাকে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন 'জানালা দিয়ে আর কোনদিন উঁকি মারতে দেখলে তোমাকে পাগলা গারদে পুরে দেব, বুঝলে? আর কাউকে কিছু বলবে না কোনদিন।' আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'কাউকে কিছু বলবো না ম্যাডাম।' একটু চুপ করে থেকে বেন আবার

চিন্তিত স্বরে বললো, 'উনি চলে গেছেন। আর কোনদিন ফিরবেন না, না ?'

'কার কথা বলছো বুঝতে পারছি না। কিন্তু তুমি কিছু ভেবো না। তোমাকে কেউ পাগলা গারদে দেবে না। আচ্ছা আমি তাহলে চলি এবার।' জেসপারের বেণ্ট ধরে টানতে টানতে বাড়ির দিকে চললাম। বেচারা বেন! সে জানেনা আমাকে সে কি বলেছে! শিশুর মত সরল এই নিরীহ গোবেচারা লোকটিকে কেন পাগলা গারদে দেবার ভয় দেখানো হয়েছিল অবাক হয়ে তাই ভাবছিলাম। চলতে চলতে সেই বাঁকের দিকে একবার ফিরে তাকালাম। তখন বান আসছে। বেন ঐ পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে এখনও কুটিরের পাথরের চিমনি দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ আমার ইচ্ছে হোল ছুটে পালিয়ে যাই এখান থেকে। জেসপারের বেণ্ট টানতে টানতে সেই সংকীর্ণ বন-পথ দিয়ে ছুটে চলেছি। পেছন দিকে আর একবারও ফিরে তাকালাম না। জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ একত্র করে দিলেও এই মুহূর্তে আমি আর ঐ কুটিরে বা সাগর তীরে যাব না। মনে হচ্ছিল সেই শূন্য বাগানের কাঁটা গাছের মধ্যে কেউ যেন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। জেসপার আর আমি দু'জনেই দৌড়ে চলেছি। জেসপার এটা একটা নূতন ধরণের খেলা মনে করে আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে চলেছে। এখানে পথের দু'ধারে গাছগুলি যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শিকড়গুলি লতা জালের মত সমস্ত পথকে আছে ছেয়ে। পথটি অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা ইউক্যালিপটাস্ গাছের নিস্পত্র শাখা প্রশাখাগুলিকে কঙ্কালের মত দেখাচ্ছিল। তারই নিচ দিয়ে না জানি কত বছরের জমানো বৃষ্টির জলের ঘোলাটে জলের ধারা চুয়ে চুয়ে যাচ্ছে সাগরের দিকে। উপসাগরের কোলে উত্তাল ঢেউগুলির আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়বার অবিরাম শব্দ তখনও কানে আসছে।

ম্যাণ্ডারলের প্রাঙ্গণে এসে বাড়ি দেখতে পেয়ে মনটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সেই ছমছমে বন-পথ এখন পেছনে পড়ে আছে।

এবার বাদাম গাছের তলায় বসে চা খেয়ে তারপর বাড়িতে ঢুকবো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও চারটে বাজেনি। তাহলে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। সাড়ে চারটের আগে এখানে চা খাওয়ার রীতি নেই। ফার্থ আজ বাড়ি নেই। রবার্ট আমাকে চা এনে দেবে। সময় কাটাবার জন্য ম্যাণ্ডারলের আঙ্গিনা থেকে অলিন্দে পায়চারি করতে করতে সহসা দেখতে পেলাম গাড়ি চলার পথের বাঁকে রডোডেনড্রনের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের আলোয় কি একটা জিনিস ঝলমল করছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে মনে হোল জিনিসটা গাড়ির রেডিয়েটার। কে এলো! কোন অতিথি অভ্যাগত নাকি! কিন্তু তারা ও জায়গায় গাছের আড়ালে অমন করে গাড়ি রাখবে কেন! আরও একটু এগিয়ে দেখি সত্যি একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কি আশ্চর্য! যদি কেউ বেড়াতে এসে থাকে তাহলে রবার্ট নিশ্চয় তাদের লাইব্রেরিতে বা ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসিয়েছে। আমি এই পোশাকে তাদের সামনে যেতে চাই না। কি করবো ভেবে পেলাম না। হঠাৎ বাড়ির দিকে চোখ পড়লো। অবাক হয়ে দেখি পশ্চিম মহলের একটা জানালার সার্সি খোলা। কে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আমাকে দেখেই সে পেছনে সরে গেল। তারপর পেছন দিক থেকে কে একজন হাত বাড়িয়ে সার্সি বন্ধ করে দিল। ঐ হাতটি ডানভারসের! আজ কি বাইরের লোকদের ম্যাণ্ডারলে দেখবার দিন নাকি! কিন্তু একাজ তো ফার্থের। ফার্থ আজ বাড়িতে নেই। তাছাড়া পশ্চিম মহল তো বাইরের লোকদের দেখানো হয় না। তাহলে! হয় তো ওদিককার কোন ঘর মেরামত করবার জন্য লোক এসেছে। কিন্তু আমাকে দেখে লোকটি কেন সরে দাঁড়ালো! আর ঐ রডোডেনড্রনের আড়ালেই বা কেন গাড়ি রেখেছে! অবশ্য

মিসেস ডানভারস যদি তার নিজের কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে ওঘরে নিয়ে থাকে তাহলে আমার বলবার কি আছে! ম্যাক্সিম যেদিন বাড়িতে নেই ঠিক সেদিনটাতেই এমন হওয়া ভারি অদ্ভুত!

ওপরে উঠবো না ভেবে বসবার ঘরে এলাম। খাওয়ার আগে আমার উল বোনার থলি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখান থেকে সেটাকে সরিয়ে কে কুশনের পেছনে রেখেছে। চেয়ারের গদিতে বসবার চিহ্নও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ম্যাক্সিম এবং আমার অনুপস্থিতিতে ডানভারস তাহলে এঘরেই তার অতিথিকে অভ্যর্থনা করেছে! কেমন অসোয়াস্তিতে মনটা ভরে গেল। জেসপার লেজ নাড়তে নাড়তে সেই চেয়ারটির কাছে গিয়ে কি গন্ধ শুঁকছিল। ঘর হতে বের হতে যাব তখন দেখতে পেলাম ড্রয়িং রুমের যে দরজা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে যাওয়া যায় সে দরজাটা খুলে গেল। কাদের গলার স্বর শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার বসবার ঘরে ঢুকে গেলাম। আমাকে তারা দেখতে পায়নি। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের চলে যাবার অপেক্ষা করছি। জেসপার আমার দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ছিল। হতভাগা কুকুরটাই আমার সর্বনাশ করবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি! শুনতে পেলাম ডানভারস বলছে, 'আমার মনে হয় উনি লাইব্রেরিতে গেছেন। কোন কারণে তাড়াতাড়ি ফিরেছেন মনে হচ্ছে। যদি লাইব্রেরিতে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনি হলঘরের মধ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারেন। এখানে একটু দাঁড়ান, আমি দেখে আসছি।' বুঝতে পারলাম তারা আমার কথা বলছে। সমস্ত ঘটনাটা কেমন অদ্ভুত মনে হোল। জেসপার এবার ওদিকে ছুটে গেল। একটু পরে লোকটি এসে ঘরে ঢুকলো। আমি দরজার পেছনে ছিলাম বলে প্রথমে সে আমাকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু জেসপার আনন্দে আমার দিকে ছুটে এলে সে ঘুরেই আমাকে দেখতে পেল। তার চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠলো।

আমার মনে হোল আমিই যেন একটি চোর আর সে এই বাড়ির কর্তা। আমার আপাদমস্তক ভাল করে লক্ষ্য করে সে বললো, 'মাপ করুন।'

সে বেশ লম্বা চওড়া, দেখতে মন্দ নয়। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে মনে হচ্ছে। তার চোখ দু'টো এবং চুল লালচে। সে এবার হাসতে হাসতে বললো, 'আশাকরি ভয় পান নি!' আমি দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম। বোধ হয় আমাকে একেবারে বোকার মত দেখাচ্ছিল! আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখে সে আবার বললো, 'এভাবে হঠাৎ এসে পড়ে খুব অন্যায় করেছি। আশাকরি এজন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আমি ড্যানীকে দেখতে এসেছি। সে আমার অনেক কালের পুরানো বন্ধু।'

'ও।'

'ড্যানী বেচারা বড় ভাল মানুষ। সে আপনাকে বিরক্ত করতে চায়নি।'

আমি জেসপারের দিকে তাকিয়েছিলাম, সে তখনও আনন্দে লোকটির গায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। 'কুকুরটা আমায় ভোলেনি দেখছি। বেশ বড় হয়েছে তো! শেষবার যখন দেখেছি তখন তো খুব ছোট্ট ছিল। এখন বড় মোটা হয়ে গেছে। ওকে ব্যায়াম করানো দরকার।'

'আমি ওকে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াতে নিয়ে যাই।'

'তাই নাকি! বেশ উৎসাহ আছে তো আপনার।' তারপর সিগারেট কেস্ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নিন।'

'না। আমি খাই না।'

'সে কি!' সে একটি সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগলো। তার ব্যবহার খুব অভদ্র মনে হোল। সে আবার বলে উঠলো, 'বুড়ো ম্যাক্স কেমন আছে?' তার স্বর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ম্যাক্সিম যেন তার

কতকালের পরিচিত। ম্যাক্সিমকে 'ম্যাক্স' বলায় আমার খুব খারাপও লাগলো। তবু উত্তর দিলাম, 'ভাল আছেন। তিনি লণ্ডনে গেছেন।'

'নূতন বৌকে একা ফেলে রেখে! ভারি অন্যায় তো! কেউ এসে আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে সে ভয় নেই বুঝি তার?' সে জোরে হেসে উঠলো। তার এরকম কথা আর হাসি বড় অশোভন মনে হোল। এমন সময় ডানভারস ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে আমার বুক শুকিয়ে উঠলো।

'এই যে ড্যানী এসেছো। তোমার সব সাবধানতা ব্যর্থ হোল। জান বাড়ির কর্ত্রী দোরের পেছনে লুকিয়ে ছিলেন!' আবার সে সশব্দে হেসে উঠলো। ডানভারস কোন কথা না বলে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। লোকটি আবার বলে উঠলো, 'একি, তুমি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে না?' ডানভারস এবার বললো, 'ইনি মিঃ ফ্যাবেল।' তার স্বরে কেমন অনিচ্ছা প্রকাশ পেল। সে তার পরিচয় দিতে চায়নি বুঝতে পারলাম।

'চা খেয়ে যান।' ভদ্রতা রক্ষার জন্য আমাকে একথা বলতেই হোল।

'খুব লোভনীয় প্রস্তাব, কি বল ড্যানী?' লক্ষ্য করলাম ডানভারসের নীরব চোখের ভাষায় তার প্রতি সাবধানতার ইশারা ফুটে উঠলো। সমস্ত ব্যাপারটাই এত অস্বস্তিকর যে আমি মরমে মরে যেতে লাগলাম।

'না, আমাকে এখনই যেতে হবে। আসুন না আমার সাথে। আমার গাড়িটা দেখবেন।' তার স্বরে আত্মীয়তার সুর মাখানো থাকলেও তার এই কথায় কেমন অপমান বোধ হোল আমার। 'আসুন। ম্যাক্সের গাড়ি চাইতে আমার গাড়িটা অনেক ভাল।' ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'গাড়ি কোথায়?'

'পথের বাঁকে রেখে এসেছি। আপনাকে বিরক্ত করা হবে ভেবে এদিকে আনিনি। ভেবেছিলাম আপনি বিশ্রাম করছেন।' তার কথা

যে একেবারে মিথ্যা তা বেশ বুঝতে পারলাম। আমরা তখন ড্রয়িং রুম পার হয়ে হলঘরের দিকে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে সে ঘাড় ফিরিয়ে ডানভারসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে কি ইশারা করছিল। ডান-ভারসের মুখ গম্ভীর, ভাবহীন। জেসপার আনন্দে লাফাতে লাফাতে সবার আগে দৌড়ে যাচ্ছে। এই লোকটিকে সে অনেক দিন আগে থেকে চেনে তা বুঝতে পারলাম। হলঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বললো, 'টুপিটা বোধ হয় গাড়িতেই ফেলে এসেছি। আসল কথা কি জানেন, আমি এই পথ দিয়ে আসিনি কিন্তু। পেছন দিক দিয়ে ড্যানীর আস্তানাতেই প্রথম গিয়েছিলাম। ড্যানী, তুমি গাড়ি পর্যন্ত আসছো তো?' ডান-ভারসের দিকে সে সপ্রশ্ন ভাবে তাকালো। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ডানভারস দ্বিধাভরে উত্তর দিল, 'না। আমার এখন অনেক কাজ আছে। আচ্ছা, নমস্কার মিঃ জ্যাক।' সে তার হাতখানি আন্তরিক ভাবে নেড়ে বললো, 'আচ্ছা, আজ তাহলে বিদায় ড্যানী। নিজের ওপর একটু যত্ন নিও। আবার একদিন তোমাকে এসে দেখে যাব, কেমন?'

তারপর সে পথের দিকে চলতে লাগলো। জেসপার নাচতে নাচতে তার পাশে চলেছে। আমি খুব সংকুচিত হয়ে পেছন পেছন চলেছি। বাড়ির দিকে এবার ফিরে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, 'প্রিয় ম্যাণ্ডারলে! এতটুকুও বদলায়নি! ড্যানীর জন্যই বোধ হয় তা সম্ভব হয়েছে। সে ভারি চমৎকার লোক, তাই না?'

'হাঁ, খুব কাজের লোক।' যন্ত্র চালিতের মত উত্তর দিলাম।

'ম্যাণ্ডারলে আপনার কেমন লাগছে? খুব একঘেয়ে আর একেলা মনে হচ্ছে না?'

'না।'

'ম্যাক্সের সাথে প্রথম দেখা হবার সময় আপনি মন্টিতে ছিলেন?'

'হাঁ।' আমরা তখন গাড়ির কাছে এসে পড়েছি।

'কেমন লাগছে গাড়িটা ?'

'বেশ সুন্দর।'

'ফটক অবধি আমার সাথে আসুন না!'

'না। আমি এখন বড় ক্লান্ত।'

'আমার মত লোকের সাথে ম্যাণ্ডারলের কর্ত্রীকে এক গাড়িতে দেখলে লোকে কি ভাববে, তাই না ?' হেসে আমার দিকে চেয়ে সে বললো।

'না, না, তা নয়।' আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। সে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগলো। তার সেই চাহনি আমার ভাল লাগলো না।

'ও, হাঁ নূতন বৌকে বিপথগামী করা আমাদের উচিত নয়, কি বলিস জেসপার ?' তারপর সে তার টুপি ও দস্তানা হাতে নিয়ে বললো, 'আচ্ছা, নমস্কার। আপনার সাথে দেখা হয়ে বেশ আনন্দ পেলাম। আর একটা কথা, আমি যে এসেছিলাম এ সংবাদ ম্যাক্সকে না জানালে খুব খুশি হবো। আমাকে আবার সে তেমন পছন্দ করে না কি না। বেচারা ড্যানী তাহলে বিপদে পড়বে।'

'আমি কিছু বলবোনা।' ক্ষীণ স্বরে বললাম।

'আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। আর একদিন এসে আপনাকে বেড়াতে নিয়ে যাব, কেমন ? জেসপার, আয় নেমে আয় গাড়ি থেকে।' একটু চুপ করে থেকে আবার সে বললো, 'আপনাকে এরকম একেলা ফেলে রেখে ম্যাক্সের লণ্ডন যাওয়া কিন্তু উচিত হয়নি।'

'আমি একা থাকতে ভালবাসি।'

'তাই নাকি ? ভারি আশ্চর্য তো! কতদিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে বলুন তো ? তিন মাস, তাই না ?'

'প্রায় তাই হবে।'

'আহা, মাত্র তিন মাসের কনে যদি আমার বাড়িতে আমার জন্য প্রতীক্ষা করতো! আমি বেচারা একা একাই জীবনটা কাটালাম!' সে আবার হেসে উঠলো। তারপর গাড়িতে বসে টুপিটা চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, বিদায়।' গাড়িটা বিশ্রী শব্দ করতে করতে চলে গেল। জেসপার করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো সেদিক পানে। তার লেজ আর নড়ছে না।

'জেসপার, চলে এসো।' আমি আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম। তারপর হলঘরে ঢুকে ঘণ্টা বাজালাম। অনেকক্ষণ ঘণ্টা বাজাবার পর গম্ভীর মুখে এলিস হাজির হলো।

'রবার্ট আছে? আমি আজ বাদাম গাছের তলায় বসে চা খাব ভাবছি।'

'রবার্ট চিঠি পোষ্ট করতে গেছে। এখনও ফেরেনি। মিসেস ডানভারস তাকে বলেছেন আপনি আজ দেরিতে চা খাবেন। ফার্থও নেই। এখন চা খেলে আমি দিতে পারি। কিন্তু এখনও বোধ হয় সাড়ে চারটে বাজেনি।'

'ও, তাহলে থাক।'

ম্যাক্সিম বাড়িতে নেই বলে সব দিক দিয়েই এরকম অবহেলার ভাব দেখা যাচ্ছে কেন! ফার্থ এবং রবার্ট একই দিনে এক সময়ে আর কোন দিন তো বাইরে যায় না! ফ্যাবেল বেশ সুযোগ বুঝেই ডানভারসের সাথে দেখা করতে এসেছে। এখন বুঝতে পারছি সব ব্যবস্থা আগে থেকে ঠিক ছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন অন্যায়ের আভাস পাচ্ছি। ম্যাক্সিমকে কিছু না জানাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। এটা সত্যি ভারি অদ্ভুত!

কিন্তু কে এই ফ্যাবেল? ম্যাক্সিমকে সে 'ম্যাক্স' বলেছে! এখানে শুধু একজন ছাড়া আর কেউ তাকে এ নামে ডাকে বলে জানতাম না।

সেই কবিতার বইয়ের প্রথম পাতায় বাঁকা হাতের লেখায় দেখেছিলাম এই নামটি। ভেবেছিলাম এই নামে তাকে ডাকবার অধিকার শুধু একজনেরই ছিল। এসব কত কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সহসা আমার মনে হোল ডানভারস নিশ্চয় ভাল লোক নয়। ম্যাক্সিমের আড়ালে ঐ লোকটির সাথে হয়তো সে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। ম্যাক্সিমের সাথে ঘনিষ্ঠতার ভান করে লোকটি আমাকেও বুঝি প্রতারিত করে গেল। বাড়িতে আজ কেউ নেই এই সুযোগ নিয়ে ডানভারসের সাহায্যে হয়তো সে পশ্চিম মহলের মূল্যবান আসবাব পত্র চুরি করবার মতলব নিয়েই এখানে এসেছিল। সেখানে গিয়ে নিজ চোখে সব একবার দেখে আসলে কেমন হয়! রবার্ট তো এখনও ফেরেনি। চা খাওয়ার দেরি আছে।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ, নিঝুম। রান্নাঘরের পেছন দিকটায় তাদের থাকবার ঘরে অন্য চাকর-বাকরেরা এখন বিশ্রাম করছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা অসহ্য উত্তেজনায় ধুক ধুক করছে।

।। ১৮ ।।

চলতে চলতে হঠাৎ দেখি প্রথম দিন সকালে পশ্চিম মহলের যে বারান্দায় পথ ভুল করে এসে পড়েছিলাম সেখানটিতে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর আর একদিনও আমি এদিকে আসিনি। তাকিয়ে দেখি বারান্দার জানালা দিয়ে চিলতে সোনালি রোদের ছটায় সেই লতা-কুঞ্জটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

চারিধারে নিবিড় নিস্তব্ধতা। সেদিনকার মতই একটা পুরানো সোঁদা গন্ধ চারিদিকে। এদিকটা আমার কাছে পরিচিত নয় বলে বুঝতে

পারলাম না এখন কোন্ দিকে যাব। হঠাৎ মনে পড়লো সেদিন তো ডানভারস এখানেই আমার পেছন দিক দিয়ে আচমকা এসে পড়েছিল। তাহলে আমি যে ঘরে যেতে চাই সে ঘরটা এদিকেই হবে। দরজা ঠেলে সামনে যে ঘর পেলাম সেটাতেই ঢুকলাম। জানালা সার্সি সব বন্ধ বলে ঘরটি অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে দেওয়ালে সুইচ খুঁজে আলো জেলে দেখি একটি ছোট ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। দেওয়ালের চারধারে পোশাক রাখবার আলমারি দেখে বুঝলাম এটা শোবার ঘরের পাশে সাজঘর। এই ঘরের আধ খোলা দরজা দিয়ে বড় ঘরে ঢুকে আলো জেলে আমি চমকে উঠলাম। ঘরখানি যেন কেউ ব্যবহার করছে ঠিক তেমনিভাবে সাজানো গোছানো রয়েছে। ভেবেছিলাম ঘরের আসবাব পত্র সেদিনকার মতই সব আচ্ছাদনে সম্পূর্ণ ঢাকা দেখবো। দেওয়ালের এক পাশে যে খাট জোড়া দু'জনকার বিছানা পাতা রয়েছে সেটাও নিশ্চয় আগাগোড়া ঢাকা থাকবে কিন্তু কোন কিছুই ঢাকা ছিল না। ড্রেসিং টেবিলের ওপর চুলের ব্রাশ, চিরুণী, সুগন্ধ, পাউডার, সমস্ত প্রসাধন সম্ভার সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। বিছানাটি নিপুণভাবে পাতা। শাদা ধবধবে লিনেনের বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদরের উজ্জ্বল আভা আমার চোখের সামনে ঝকমক করে উঠলো। পায়ের দিকে সিল্কের ওয়াড় লাগানো কম্বল, লেপ পরিপাটী করে রাখা হয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর, বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিলটির ওপর টাটকা ফুলের তোড়া সাজানো রয়েছে। তারই মৃদু মধুর সুবাস ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চেয়ারের ওপর একটি সাটিনের ড্রেসিং গাউন পড়ে রয়েছে। সেই চেয়ারের সামনে মেঝেতে রয়েছে একজোড়া সুন্দর স্লিপার। এসব দেখতে দেখতে আমার মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল। মনে হোল আমি বুঝি ম্যাণ্ডারলের ফেলে আসা দিনগুলির ওপারে চলে গেছি। তার মৃত্যুর আগে তার ঘরে ঢুকে দর্শকের মত সব দেখছি।

আর এখনি বুঝি সে ঘরে ঢুকবে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পড়ে আপন মনে গানের সুর গুন্ গুন্ করতে করতে আয়নার দিকে চেয়ে চিরুণী দিয়ে তার লম্বা চুল আঁচড়াতে থাকবে। আয়নার মধ্যে তার প্রতিরূপ দেখবো, সেও দেখতে পাবে আমি কেমন আড়ষ্টভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

আচ্ছন্নের মত কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ আমাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনলো। এক পা দু'পা করে ঘরের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ালাম। না, ঘরখানি অনেকদিন ব্যবহার করা হয় না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন। টাটকা ফুলের সুবাসও এঘরের পুরানো, সোঁদা গন্ধকে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারেনি। জানালার পরদা টেনে দেওয়া আছে, সার্সিও বন্ধ। রেবেকা আর এঘরে ফিরে আসবে না, আসতে পারে না। ডানভারস এমন সুন্দরভাবে ঘরখানিকে সাজিয়ে রাখলেও সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। এক বছর হোল এই পৃথিবী থেকে সে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। মৃত ডি উইণ্টারদের পাশে সমাধিতে সেও ঘুমিয়ে আছে চিরকালের মত।...

জানালার কাছে গিয়ে এবার সার্সি খুলে দিলাম। যেখানে আধঘণ্টা আগে ফ্যাবেল আর ডানভারস দাঁড়িয়েছিল সেই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দিনের আলোর এক ঝলক তখনি ঘরে ঢুকে বিজলী আলোকে কেমন নিষ্প্রভ আর হলদে করে দিল। দিনের স্বচ্ছ আলোয় সেই দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা আরও ঝকমক করে উঠলো। ঘরের প্রতিটি জিনিস সূর্যের আলোর স্পর্শ পেয়ে যেন এক মুহূর্তে আরও সজীব, আরও সুন্দর হয়ে উঠলো। যখন জানালা, সার্সি, সব বন্ধ ছিল তখন বিজলী আলোয় ঘরখানিকে কেমন রঙ্গমঞ্চের মত স্বপ্নময় মনে হয়েছিল। যেন কোন নাটক অভিনয় হবার আগে একটি দৃশ্যের পটসজ্জা। এখন রোদের

পরশ পেয়ে সেই স্বপ্নের আবেশ কেটে গিয়ে সমস্ত কিছুই আমার চোখে বড় বাস্তব বলে মনে হোল। আবার নিজেকে ম্যাণ্ডারলের অতিথি বলে মনে হতে লাগলো। পথ ভুলে যেন এ বাড়ির কর্ত্রীর ঘরে এসে পড়েছি। তার চুলের ব্রাশ, ড্রেসিং গাউন, স্লিপার, সবই প্রতিমুহূর্তে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে এ কার ঘর, কোথায় আমি এসেছি। সহসা অনুভব করলাম আমার পা দু'টো থর থর করে কাঁপছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছে কি একটা জগদ্দল পাথর বুঝি আমার বুকে চেপে আছে। ভারি মনে চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

ঘরখানি সত্যি কী সুন্দর! ডানভারস সেদিন মিথ্যে বলেনি। বাড়ির মধ্যে নিঃসন্দেহে এই ঘরখানিই সবচেয়ে সুন্দর। প্রতিটি আসবাব, প্রতিটি জিনিস কী অপরূপ! এসব জিনিস আমার হলে হয় তো একটাও ব্যবহার না করে শুধু সাজিয়ে রেখে কেবল দু'চোখ ভরে দেখতাম। কিন্তু আমার তো কিছুই নয় এসব। আমার কোন অধিকার নেই। আয়নার মধ্যে আমার মুখ কী শাদা আর শুকনো দেখাচ্ছে! আমার চুলগুলো বড় সোজা আর শ্রীহীন। আমার বিবর্ণ প্রতিমূর্তি শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে উঠে গিয়ে ড্রেসিং গাউনটি হাত দিয়ে ধরলাম। স্লিপার জোড়া হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। প্রথমে একটু ভয় তারপর কেমন এক নিরাশার ভাব সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেললো। আমি একে একে বিছানা, তার রাত্রিবাস, সব স্পর্শ করছি। নরম, মসৃণ, রেশমী রাত্রিবাসটি দু'হাতে তুলে নিয়ে আমার মুখের ওপর চেপে ধরে তার স্পর্শ-সুখ অনুভব করলাম। [illegible] কিন্তু কী ঠাণ্ডা! পুরানো গন্ধের সাথে তখনও মেশানো রয়েছে এজেলিয়ার মিষ্টি মধুর সুবাসের একটুখানি স্মৃতি! বুকের ভেতরটা কি এক বোবা বেদনায় গুমড়ে উঠলো। তারপর কে যেন

আমাকে ধাক্কা দিয়ে পাশের সেই সাজঘরে নিয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত পোশাকের আলমারি খুললাম। কত সাজ, কত পোশাকের সমারোহ! রঙবেরঙের রকমারি কত পোশাক! ব্রোকেড, সাটিন, ভেলভেট, কিছু আর বাকি নেই। নানা রঙের বাহার আমার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। কিন্তু এখানেও সেই সোঁদা, পুরানো গন্ধের আভাস। তারই সাথে এজেলিয়ার মৃদু সুবাসও মিশে আছে। আলমারির দরজা বন্ধ করে আবার শোবার ঘরে এলাম। বিছানার সোনালি আচ্ছাদনে সূর্যের আলোর একটু ঝিলিক তখনও ঝিলিমিলি করছে। সেই আচ্ছাদনের এককোণে তার নামের প্রথম অক্ষর বাঁকা 'র' স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ডানভারস দাঁড়িয়ে আছে। তার তখনকার মুখের ভাব এ জীবনে ভুলবো না। অদ্ভুত একটা বিজয়ের হাসিতে তার মুখখানি কী বিশ্রী দেখাচ্ছে! তাকে দেখে ভয়ে ভাবনায় সংকুচিত হয়ে পড়লাম।

'কি হয়েছে?' সে প্রশ্ন করলো। আমি একটু হেসে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটলো না।

'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?' আমার একান্ত কাছে এসে সে নরম সুরে আবার প্রশ্ন করলো। আমি একটু পিছিয়ে এলাম। মনে হোল সে আমার এত কাছে এলে আমি বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো। তার গরম নিঃশ্বাস আমার মুখকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে যেন।

'না। কিছু হয়নি তো। জানালার সার্সি খোলা রয়েছে দেখে বন্ধ করে দিতে এলাম।'

'আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।' সে ওদিকে গিয়ে সার্সি বন্ধ করে দিল। দিনের আলো নিভে গিয়ে হলদে আলোর আভায় ঘরখানিকে আবার কেমন স্বপ্নময় মনে হোল। ঘরের আবহাওয়া কেমন অবাস্তব আর ছম ছমে হয়ে উঠলো আবার।

ডানভারস ফিরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি ওটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। আপনিই এখন সাসিটা আবার খুলেছিলেন। তাই না? আপনি ঘরখানি দেখতে এসেছেন। আমাকে কেন আগে বলেন নি? আমিই তাহলে ভাল করে সব দেখিয়ে দিতাম।'

ইচ্ছা হোল এখান থেকে দৌড়ে চলে যাই। কিন্তু নড়বার সামান্য শক্তিও আমার নেই।

'আসুন, আপনাকে সব দেখাবো।' তার স্বরে অকারণ উৎসাহের ছোঁয়াচে কৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠলো।

'আমি জানি অনেক দিন থেকেই আপনার এই ঘরখানি দেখবার সাধ হয়েছে কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারেননি। ঘরখানি ভারি সুন্দর, তাই না? এমন সুন্দর ঘর আপনি আর কোথাও দেখেন নি।'

এবার সে আমার হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে গেল। আমি কোন বাধা দিতে পারলাম না। আমি তখন পুতুলের মত হয়ে গেছি। তার হাতের ঠাণ্ডা স্পর্শে শুধু একটু কেঁপে উঠলাম। তার ফিসফিসে গলার স্বরে ছদ্ম আন্তরিকতার ইঙ্গিতে আমার মন তার ওপর ঘৃণায় কালো হয়ে উঠলো। কেমন ভয়ও করছে!

'এই যে দেখুন তাঁর বিছানা। কী সুন্দর তাই না? এই সোনালি রঙের আচ্ছাদনটি তার বড় প্রিয় ছিল। তাই আমি এটা দিয়েই তাঁর বিছানা ঢেকে রাখি। এই যে তাঁর রাত্রিবাস। এটা একবার ছুঁয়ে দেখেছেন বুঝি? মৃত্যুর আগে শেষবারের মত এই পোশাকটিই তিনি পরেছিলেন। আবারও একটু ধরে দেখুন। দেখুন কত নরম আর হালকা! তাঁর রাত্রিবাস, ড্রেসিং গাউন, স্লিপার জোড়াও আমি ঠিক সেই শেষরাত্রির মত সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না।' রাত্রিবাসটি ভাঁজ করে আবার সে রেখে দিল সেই জায়গায়। হাত ধরে আবার সে আমাকে সেই ড্রেসিং গাউন এবং স্লিপারের কাছে টেনে

নিয়ে গিয়ে বললো, 'আমিই তাঁর সব কাজ করে দিতাম। তাঁকে পোশাক পরিয়ে দিতাম। একের পর এক কত পরিচারিকা তাঁর জন্য ঠিক করেছি কিন্তু কাউকেই তাঁর মনে ধরতো না। তিনি বলতেন, 'তোমার কাজ ছাড়া আমার অন্য কারুর কাজ পছন্দ হয় না ড্যানী। তোমাকে ছাড়া চলবে না।' এই যে দেখুন তাঁর ড্রেসিং গাউন। আপনার চাইতে তিনি অনেক লম্বা ছিলেন। কী অপরূপ ছিল তাঁর দেহের গঠন! এই যে তাঁর স্লিপার। তাঁর পা দু'খানি কত ছোট ছিল! হাতে নিয়ে দেখুন।' সে জোর করে আমার হাতের মধ্যে জুতো জোড়া ধরিয়ে দিল। তাঁর মুখে সর্বদা একটুকরো হাসি লেগেই ছিল। আবার সে বলতে লাগলো, 'তিনি আমার মতই লম্বা ছিলেন। কিন্তু ঐ বিছানায় শুয়ে থাকলে তাঁর তন্বী দেহখানিকে কত ছোট্ট, একটুখানি মনে হোত! একরাশ কালো চুলের মধ্যে সুন্দর মুখখানি কী অপরূপই না দেখাতো!' ড্রেসিং গাউন আর স্লিপার জায়গা মত রেখে দিয়ে এবার আমাকে সে ড্রেসিং টেবিলের কাছে টেনে গিয়ে বলতে লাগলো, 'তাঁর চুলের ব্রাশ দেখেছেন? ঠিক যেমনটি তিনি ব্যবহার করতেন তেমনটিই রেখে দিয়েছি। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলায় তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম। শেষের কয়েক বছর তিনি চুল ছোট করে কেটে ফেলেছিলেন। বিয়ের সময় তাঁর চুল কোমরের নিচ অবধি ছিল। তখন মিঃ ডি উইণ্টার তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন। আমি কতদিন দেখেছি তিনি দু'হাতে দু'টো ব্রাশ নিয়ে তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন। হাসতে হাসতে তিনি বলতেন, 'আরও জোরে ম্যাক্স, আরও জোরে আঁচড়াও।' তখন হয়তো ডিনারের সময় হয়ে গেছে। অতিথিরা অপেক্ষা করছে। তাই মিঃ ডি উইণ্টার ব্রাশ দু'টো আমার হাতে ফেলে দিয়ে 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে', বলে তাড়াতাড়ি চলে যেতেন। সে সময় মিঃ ডি উইণ্টার কত হাসিখুশি ছিলেন।' ডানভারস এবার একটু চুপ করলো। তখনও তার হাত

আমার হাতখানি শক্ত করে ধরে আছে। আবার সে বলে চললো, 'যখন তিনি চুল কেটে ফেললেন সকলে তাঁর ওপর খুব রাগ করেছিল। কিন্তু তিনি কিছু গ্রাহ্য করতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি যা খুশি করবো। তাতে কার কি ?' ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিমায় তাঁর একখানি ছবি একজন বিখ্যাত শিল্পী এঁকেছিলেন। ছবিটি লণ্ডনের চিত্রশালায় রয়েছে। আপনি সেটা দেখেন নি ?' আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'আমার তো মনে হয় ছবিখানি সে বছরের সেরা ছবি। কিন্তু মিঃ ডি উইণ্টারের মতে সে শিল্পী নাকি তাঁর সৌন্দর্যকে ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তাই তিনি ছবিখানি ম্যাণ্ডারলের চিত্রশালায় রাখেন নি। চলুন আপনাকে এবার তাঁর পোশাক দেখাবো।' আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে আমাকে পাশের ছোট্ট ঘরে টেনে নিয়ে এলো। একের পর এক আলমারি খুলে দেখাতে লাগলো।

'এটার মধ্যে তাঁর শীতের পোশাক রেখেছি। এই যে এই পোশাকটি একবার বড়দিনে মিঃ ডি উইণ্টার তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এই আলমারিতে তাঁর সব সান্ধ্য-সাজ রেখেছি। আপনিও সব আলমারিগুলো একবার খুলে দেখেছেন, তাই না ? মিঃ ডি উইণ্টার রূপোলী রঙের পোশাকই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁকে সমস্ত রঙেই ভারি সুন্দর মানাতো। এই ভেলভেটের পোশাকে তাঁকে অপূর্ব দেখাতো ! নিন, গালে ছুঁইয়ে দেখুন। কী নরম, না ? সুগন্ধ এখনও পাওয়া যাচ্ছে, কেমন ? তিনি ঘরে ঢুকলে আমি অনেক দূর থেকেও বুঝতে পারতাম। তাঁর অঙ্গের মৃদু সৌরভে ঘর ভরে যেত। এই যে এখানে তাঁর সেমিজ, বডিস, সব অন্তর্বাস সাজিয়ে রেখেছি দেখুন। এই গোলাপি সেটটি তিনি আর ব্যবহার করতে পারেন নি। শেষ সময়ে তাঁর পরণে ছিল ঢিলে পায়জামা আর সার্ট। অনেকদিন পরে তাঁকে পাওয়া যায় বলে তখন তাঁর দেহে কোন আবরণই অবশ্য ছিল না।' তার আঙুলগুলি

আমার হাতে কী শক্ত হয়ে বসেছে! তার সেই কঙ্কালের মত বিবর্ণ কদাকার মুখ আমার মুখের একান্ত কাছে এনে গভীর কালো চোখে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে সে বললো, 'পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তাঁর সুন্দর মুখখানি আর চেনা যায়নি। মিঃ ডি উইণ্টার তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন। তখন তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বাধা দিয়ে ধরে রাখতে পারলো না। এজকোম্বে গিয়ে তিনি তাঁকে সনাক্ত করলেন।' ডানভারসের চোখ আমার মুখের ওপর থেকে একটুও সরছে না। একটু চুপ করে থাকার পর আবার বললো, 'সেই ভয়ানক দুর্ঘটনার জন্য আমি নিজেকেই এক এক সময় দায়ী করি। সেই সন্ধ্যায় ম্যাণ্ডারলের বাইরে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। মিসেস ডি উইণ্টার সেদিন লণ্ডনে গিয়েছিলেন। আমি রাত্রি সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরলাম। এসে শুনলাম তিনি সাতটার আগে ফিরেছেন। কিন্তু খেয়ে আবার বেরিয়ে গেছেন সাগর পারের সেই কুটিরে। বড় দুর্ভাবনা হোল। কারণ তখন ভীষণ বেগে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। আমি থাকলে তাঁকে যেতে দিতাম না। আমার কথা তিনি সব সময় শুনতেন। যদি কখনও বলতাম, 'আমি হলে এরকম বিশ্রী আবহাওয়ায় বাইরে যেতাম না,' তাহলে তিনি তখনি বলতেন, 'আচ্ছা, বুড়ো ড্যানীর ইচ্ছাই তাহলে পূর্ণ হোক।' তারপর অন্যবারের মত হয়তো তিনি আমার পাশে বসে লণ্ডনে তাঁর বেড়াবার গল্প শোনাতেন।' ডানভারসের আঙুলের কঠিন চাপে আমার হাত ব্যথায় অবশ হয়ে এলো।

'মিঃ ডি উইণ্টার সেদিন মিঃ ক্রলের বাড়িতে খেয়ে দেয়ে অনেক রাত করে ফিরেছিলেন। গভীর রাতেও মিসেস ডি উইণ্টার ফিরলেন না দেখে দারুণ দুশ্চিন্তায় নিচে নেমে দেখলাম লাইব্রেরি ঘরে আর আলো জ্বলছে না। আবার উপরে এসে সাজঘরের কড়া নাড়লাম। মিঃ ডি উইণ্টার উত্তর দিলেন, 'কে? কি চাও?' বললাম, 'মিসেস ডি উইণ্টার

এত রাত্রিতেও না ফেরায় আমি বড় চিন্তিত হয়েছি।' কয়েক মুহূর্ত পর তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তিনি আজ কুটিরে রাত কাটাবেন। এই ঝড়ে আর ফিরে আসবেন না।' তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমি আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর এলো না। সমস্ত রাত তাঁর জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে জেগে রইলাম।' এবার সে চুপ করলো একটু। আমি আর এসব শুনতে চাইনা। এঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাবার জন্য আমার মন ছটফট করে উঠলো। কিন্তু আবার সে আরম্ভ করলো বলতে, 'ভোর সাড়ে পাঁচটার পর আর অপেক্ষা করতে না পেরে ম্যাণ্ডারলের বনের ভেতর দিয়ে বেলাভূমির দিকে চললাম। ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করছে। ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু কুয়াশার মত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল বলে চারিদিক কেমন আবছা দেখাচ্ছিল। সাগরপারে গিয়ে দেখি সেখানে বয়া আর ডিঙ্গি তেমনি বাঁধা রয়েছে, কিন্তু নৌকো কোথায়!'

ডানভারস আমার হাতখানি এবার ছেড়ে দিয়েছে। তার গলার স্বরও সব উৎসাহ হারিয়ে আগেকার মত কঠিন, প্রাণহীন হয়ে উঠছে। 'এখন বুঝতে পারলেন তো কেন মিঃ ডি উইণ্টার এমহল আর ব্যবহার করেন না? ঐ যে শুনুন, সাগরের পাগল করা ডাক।' জানালা, সার্সি, সব বন্ধ থাকলেও আমি ওখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাচ্ছিলাম উপসাগরের কোলে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার একটানা শব্দ। এখন নিশ্চয় বানের জল এসে বেলাভূমি ভাসিয়ে দিয়ে সেই কুটিরের গা ছুঁই ছুঁই করছে।

'সেই কাল রাত্রির পর থেকে আর তিনি এঘরটি ব্যবহার করেন নি। বারান্দার ওদিকে একটি ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও তিনি ঘুমাতে পারতেন না। চেয়ারে বসে রাত কাটাতেন। সকালে দেখা যেত মেঝে সিগারেটের ছাইয়ে একাকার। দিনের বেলা ফার্থ তাঁকে লাইব্রেরি ঘরে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক পায়চারি করতে

শুনতো।' ডানভারস এবার সাজঘর আর শোবার ঘরের মাঝখানে যে দরজাটি রয়েছে সেটি বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিল। তারপর সাজঘর থেকে বের হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। আমি বেরিয়ে এলে বললো, 'আমি রোজ নিজে এঘরগুলোর ধুলো ঝাড়ি, পরিষ্কার করি। এখানে আসতে ইচ্ছা হলে আমাকে শুধু জানাবেন। এখানে কোন পরিচারিকাকে আমি ঢুকতে দিই না। আমি ছাড়া আর কেউ এমহলে আসে না।' তার কথায় আবার সেই কৃত্রিম আন্তরিকতার ছোঁয়াচ লাগলো। 'যখন খুব একা মনে হবে নিজেকে তখন এ মহলে এসে বসে থাকতে পারেন। আমাকে বললেই আমি আপনাকে নিয়ে আসবো। এই সুন্দর সাজানো ঘরে বসে থাকলে আপনারও মনে হবে তিনি চির-দিনের জন্য চলে যাননি! কোথাও বুঝি বেড়াতে গেছেন, এখনি ফিরে এলেন বলে!' আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'শুধু এই ঘরটিই নয়, ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি ঘর তাঁর স্মৃতিতে ভরা। বসবার ঘর, হলঘর, ফুলঘর, সমস্ত জায়গায় আমি তাঁকে অনুভব করি। আপনারও তাই মনে হয় নিশ্চয় ?' সে এবার আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, 'এই বারান্দা দিয়ে হাঁটলে মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন ? মনে হয় তিনি বুঝি আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন! তার লঘু পায়ের মৃদু শব্দ, সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তাঁর পোশাকের খস খস শব্দ আমি আজও শুনতে পাই।' একটু চুপ করে থেকে আমার চোখে চোখ রেখে আবার সে বলতে লাগলো, 'আমরা দু'জনে এই যে কথা বলছি আপনার কি মনে হচ্ছে, না তিনি আমাদের দেখছেন ? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তিনি এখানে ফিরে এসে মিঃ ডি উইণ্টার এবং আপনাকে লক্ষ্য করছেন!'

দু'জন দু'জনের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। আমি তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। দেখলাম তার বিবর্ণ মুখের গভীর কালো চোখ দু'টিতে আমার প্রতি অনেকখানি ঘৃণা, অবজ্ঞা আর করুণা ফুটে উঠেছে। তারপর সে বারান্দার দরজা খুলে বললো, 'রবার্ট ফিরে এসেছে। তাকে আমি আপনার চা বাদামতলায় নিয়ে যেতে বলছি।' তারপর একপাশে সরে দাঁড়ালো। দরজায় একটা হোচট খেয়ে আমি চলতে লাগলাম, কোথায় কোনদিকে যাচ্ছি কিছু না দেখেই। অন্ধের মত সিঁড়ি দিয়ে নামছি। তারপর নিজের একান্ত অজানিতেই কখন পূবমহলে আমার শোবার ঘরে পেঁ াছে গেলাম। দরজায় তালা লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলাম। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হোল এখনি বুঝি মরে যাব। চারিদিক অন্ধকার, কেবল অন্ধকার…।

॥ ১৫ ॥

পরদিন সকাল বেলা ম্যাক্সিম ফোন করে জানালো সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সে ম্যাণ্ডারলে পেঁ াছে যাবে। সকালবেলা চা খেতে বসে পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠতেই আমার মনে হোল এইবার ফার্থ এসে আমায় বলবে, 'মিঃ ডি উইণ্টার আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।' আমি তাড়াতাড়ি ন্যাপকিন তুলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। তখনি ফার্থ এঘরে এসে আমায় খবরটি জানালো। আমাকে ওদিকে যেতে দেখে সে বললো, 'মিঃ ডি উইণ্টার তো ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে আসছেন শুধু এই খবর জানিয়েছেন।' আমি আবার চেয়ারে বসে পড়ে

খেতে আরম্ভ করলাম। জেসপার আমার পায়ের কাছে বসে আছে। তার মা এককোণে বাস্কেটে শুয়ে।

সারাটা দিন আমি কেমন করে কাটাবো খেতে খেতে তাই ভাবছিলাম। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, হয়তো একা ছিলাম বলে। সমস্ত রাত ছটফট করেছি। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে তন্দ্রা-জড়ানো চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছি তার দু'টো কাঁটা বুঝি এক জায়গাতেই থেমে আছে। দুঃখের রাত এত দীর্ঘ! মাঝে মাঝে আবার ঘুমিয়েও পড়েছি। কিন্তু কত যে স্বপ্ন দেখেছি! স্বপ্ন দেখেছি ম্যাক্সিম আর আমি বনের মধ্য দিয়ে চলেছি। সে আমার আগে আগে চলেছে। আমি তার সাথে সমান তালে চলতে পারছি না। তার মুখও দেখতে পাচ্ছি না। স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে কতবার কেঁদে উঠেছি। সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি কী বিশ্রী দেখাচ্ছে আমায়! বিবর্ণ মুখখানিকে স্বাভাবিক করবার জন্য একটু প্রসাধন করলাম। কিন্তু তাতে হয়ত আরও খারাপ দেখালো। হলঘর দিয়ে খাবার ঘরে যাওয়ার সময় রবার্ট আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো লক্ষ্য করলাম।

বেলা দশটায় অলিন্দে দাঁড়িয়ে যখন পাখিদের জন্য খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম তখন আবার ফোন বেজে উঠলো। ফার্থ এসে বললো মিসেস লেসি ফোন করছেন। ফোন ধরে বললাম, 'কে? বিয়েট্রিস?'

'হ্যাঁ, কেমন আছ? শোন, আজ বিকেলে দিদিমাকে দেখতে যাব ভাবছি। তোমারও একবার তাঁকে দেখতে যাওয়া উচিত, কি বল?'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে নিয়ে যেও।'

'বেশ, তৈরী হয়ে থেকো, আমি সাড়ে তিনটের মধ্যে তোমায় তুলে নেব।'

তারপর কি করবো ভেবে না পেয়ে বাগানে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম। বিয়েট্রিসের সাথে দিদিমাকে দেখতে গেলে সমস্ত দিনের

একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাব ভাবতে বেশ ভালো লাগলো। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এতটা সময় না হয় কেমন করে কাটাতাম! কালকের মত অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ আর ছুটির আনন্দ আজ আর অনুভব করতে পারছিনা। জেসপারকে নিয়ে হ্যাপিভ্যালির দিকে যেতেও মন চাইছে না। কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর একখানি উপন্যাস, খবরের কাগজ আর আমার বোনা কোলে নিয়ে গোলাপ বাগানের আলতো রোদের ছায়ায় চুপচাপ বসে রইলাম। আমার চারপাশে ফুলে ফুলে ভ্রমরদের মধুর গুণগুণানি। প্রথম পত্রিকার দরকারি খবরের মধ্যে মন বসাতে চেষ্টা করলাম। তারপর উপন্যাসটি পড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। কালকের বিকেলের সেই তিক্ত স্মৃতি, ডানভারসের কথা আর ভাবতে চাইনা। কিন্তু বই থেকে চোখ তুলে এদিক ওদিক তাকালেই কেমন মনে হচ্ছিল আমি এখানে একা নই। ম্যাণ্ডারলের কোন ঘর থেকে হয়তো ডানভারস আমাকে লক্ষ্য করছে। দীর্ঘ একটানা সকাল এভাবে বাগানে কাটিয়ে অবশেষে দুপুরবেলা খাবার সময় হোল। ফার্থ আর রবার্টের গম্ভীর ভাবশূন্য মুখভাব, নিপুণভাবে খাবার পরিবেশন করবার অদ্ভুত দক্ষতা লক্ষ্য করতে করতে খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বেলা সাড়ে তিনটায় বিয়েট্রিসের গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। 'এই যে, এসেছি আমি। কী সুন্দর দিনটা, তাইনা?' বলে বিয়েট্রিস গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আমার দিকে প্রায় ছুটে এসে আমার কানের কাছে চুমু দিয়ে বললো, 'একি! তোমাকে খুব রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?' সে আমার আপাদ মস্তক ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো। 'কই কিছু হয়নি তো।' 'উহু! আগের বারের চাইতে এবার তোমায় একেবারে অন্য রকম দেখছি।' গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, 'ইতালীতে যেটুকু রঙ লেগেছিল তা এখন ফিকে হয়ে গেছে হয়তো।'

গাড়ি এবার খুব বেগে ছুটলো পথের প্রথম বাঁকটি ঘুরে। আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে এবার সে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার! বাচ্চা হবে নাকি?'

'না, না, তা নয়।'

'সকালে গা বমি বমি করে না তো! শরীর অস্থির অস্থির করে?'

'না।'

'সব সময় তা-ই যে হবে তারও কোন মানে নেই। রোজারের সময় আমি তো এতটুকুও অসুস্থ বোধ করিনি। পুরো ন'মাস অদ্ভুত ভালছিলাম। তার জন্মের আগের দিনও গলফ্ খেলেছি। এতে লজ্জা পাবার কি আছে! তোমার মনে এতটুকুও সন্দেহ হলে আমায় বলবে।'

'না বিয়েট্রিস, সত্যি তোমায় বলবার কিছু নেই।'

'আমি কিন্তু আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি তুমি আমাদের ম্যাণ্ডারলের উত্তরাধিকারী উপহার দেবে, কেমন? ও হাঁ, আঁকছো কিছু আজকাল?'

'না।'

'কেন? এমন সুন্দর আবহাওয়ায় বাইরে বসে বসে আঁকতে তো বেশ মজা। আচ্ছা, আমি যে বইগুলো পাঠিয়েছি সেগুলো তোমার ভাল লেগেছে?'

'হাঁ, খুব ভাল লেগেছে। সত্যি কী সুন্দর উপহার তোমার!' আমার কথায় সে বেশ খুশি হোল।

'তোমার ভাল লাগলেই আমি খুশি।'

গাড়ি তখন প্রতিটি বাঁক তীব্র গতিতে ঘুরছিল। অন্য দু'টি গাড়ির চালক পাশ দিয়ে যেতে যেতে জানালা দিয়ে খুব রাগত ভাবে তার দিকে তাকালো। একজন পথিক তো তার হাতের ছড়ি তার দিকে উঁচু করে তুলে ধরলো মারবার ভঙ্গি করে। সে কিন্তু এসব কোন কিছুই লক্ষ্য করলো না। আমি খুব অসোয়াস্তি বোধ করে গুটিসুটি হয়ে গাড়ির

মধ্যে বসে রইলাম। সামনের গাড়িটিকে পাশ কাটিয়ে আমাদের গাড়ি সবেগে বড় রাস্তায় পড়লো। বিয়েট্রিস এবার বললো, 'এখানে তোমার নিশ্চয় খুব একা মনে হয়? মাঝে মাঝে তুমি আমাদের কাছে চলে আসবে, বুঝলে? আমরা হেসে, খেলে, বেড়িয়ে কত আনন্দে থাকি! তোমার খুব ভাল লাগবে। গেলবার বড়দিনের উৎসবে আমরা কী মজাটাই না করেছি। অবশ্য আমাদের এখানকার আনন্দ-উৎসবের সাথে ম্যাণ্ডারলের আগেকার আনন্দ-উৎসবের কোন তুলনাই চলেনা। ম্যাণ্ডারলের আনন্দ-উৎসবের জাঁকজমক সত্যি ভোলা যায় না!' একটু চুপ করে থেকে বিয়েট্রিস আবার প্রশ্ন করলো, 'ম্যাক্সিম কেমন আছে?'

'ভাল।'

'বেশ হাসি খুশি আছে তো?'

'হাঁ।'

আমাদের গাড়ি এবার গাঁয়ের সুরু পথ ধরে ছুটে চলেছে। আমি ভাবছিলাম ডানভারসের কথা, ফ্যাবেলের কথা বিয়েট্রিসকে বলবো কিনা। সে যদি ম্যাক্সিমকে বলে দেয় তাহলেও মুস্কিল! কিন্তু তবুও তাকে বলাই উচিত ভেবে বলে ফেললাম, 'ফ্যাবেল নামে কাউকে চেন? জ্যাক ফ্যাবেল?'

'জ্যাক ফ্যাবেল! চেনা চেনা মনে হচ্ছে তো নামটা। জ্যাক ফ্যাবেল! হাঁ, অনেকদিন আগে একবার তাকে দেখেছিলাম মনে পড়ছে।'

'সে কাল মিসেস ডানভারসের সাথে দেখা করতে এসেছিল।'

'তাই নাকি?'

'কেন এসেছিল?'

'সে তো সম্পর্কে রেবেকার কেমন ভাই হয়।' একথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। ঐ লোকটি রেবেকার আত্মীয়!

'কিন্তু আমি যে তাকে তেমন অভ্যর্থনা করিনি।'

'তাতে কি হয়েছে ? সেজন্য তোমায় ভাবতে হবেনা।' বিয়েট্রিসের ভাব দেখে মনে হোল এবিষয়ে সে আর বেশি কিছু বলতে চায়না। ফ্যাবেল যে তার কথা কাউকে বলতে নিষেধ করেছে সে কথা বিয়েট্রিসকে বলবো কি বলবো না ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি শাদা ফটকের মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকরের সুন্দর পথে আমাদের গাড়ি চলেছে। বিয়েট্রিস বললো, 'দিদিমা চোখে খুব কম দেখেন। একরকম অন্ধ বললেই হয়। আজকাল তাঁর শরীরও খুব খারাপ যাচ্ছে। আমি নার্সকে ফোন করে আমাদের আসবার কথা আগেই জানিয়েছি।'

ভিক্টোরিয়া আমলের লাল প্রকাণ্ড একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিতে বিয়েট্রিস বললো, 'এই যে নোরা কেমন আছ ?'

'ভাল আছি, আপনি ভাল আছেন তো ?'

'হাঁ আমরা সবাই বেশ ভাল আছি। দিদিমা কেমন আছেন নোরা ?'

'এক এক সময় বেশ ভাল থাকেন। আবার হঠাৎ হয়তো খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনাদের দেখে তিনি খুব খুশি হবেন।' পরিচারিকাটি কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল।

'ইনিই মিসেস ম্যাক্সিম।'

'ও।' মাথা নিচু করে সে এবার আমাকে অভিবাদন জানালো। তারপর ড্রয়িংরুমের মধ্য দিয়ে আমরা বারান্দায় উপস্থিত হলাম। সেই বারান্দার সামনে সবুজ সুন্দর অঙ্গন। বারান্দার সিঁড়ির দু'ধারে পাথরের টবে কী সুন্দর সব ফুল ফুটে রয়েছে! বারান্দার একদিকে একখানি আরাম কেদারায় বিয়েট্রিসের দিদিমা বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ম্যাক্সিমের সাথে তাঁর চেহারার অদ্ভুত মিল রয়েছে। নার্স জোরে জোরে তাঁকে কি একটা বই পড়ে শোনাচ্ছিল। আমাদের

দেখে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিয়েট্রিসের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললো, 'কেমন আছেন মিসেস লেসি?' বিয়েট্রিস আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, 'দিদিমাকে তো বেশ ভালই দেখাচ্ছে। ছিয়াশী বছর বয়সে এরকম ভাল থাকাটা কিন্তু বড় আশ্চর্য!' তারপর বেশ জোরে বলে উঠলো, 'দিদিমা, আমরা এসেছি।' তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে? বী? এসো, এসো ভাই। বড় একঘেয়ে দিন কাটছে আমাদের।' বিয়েট্রিস তাঁর একান্ত কাছে গিয়ে নিচু হয়ে তাঁকে চুমু দিল। তারপর বললো, 'জান ম্যাক্সিমের বৌকে নিয়ে এসেছি তোমাকে দেখাতে।' বিয়েট্রিসের ইশারায় আমিও তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কপালে চুমু দিলাম। তিনি দু'হাত দিয়ে আমার মুখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। ম্যাক্সিমকে নিয়ে আসলে না কেন?'

'উনি লণ্ডনে গেছেন। আজ রাত্রিতে ফিরবেন।'

'তাকে নিয়ে আবার আসবে একদিন। এই চেয়ারটিতে বোস। তাহলে আমি দেখতে পাব। বী তুমি এদিকটায় বোস। রোজার কেমন আছে? সে বড় দুষ্টু হয়েছে তো। কতদিন আমায় দেখতে আসছে না।'

'সে এখানে নেই। আগষ্টে আসবে। জান দিদিমা, ইটন ছেড়ে সে এবার অক্সফোর্ডে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি! তাহলে বেশ বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়? হয়তো এখন আর তাকে চিনতেই পারবো না।' বিয়েট্রিস তাঁকে গাইলসের কথা, রোজারের গল্প, তার বাড়ির ঘোড়া, কুকুর সব কিছুর গল্প অনর্গল বলে যেতে লাগলো। নার্স টি তার বোনা বের করে চটপট বুনে যাচ্ছিল। আমার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে সে বললো, 'ম্যাণ্ডারলে আপনার কেমন লাগছে মিসেস ডি উইণ্টার?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'ভারি সুন্দর জায়গা, তাই না? আমি অনেক দিন ওখানে যেতে পারিনি। ম্যাণ্ডারলে আমার এত ভাল লাগে কী বলবো!'

'একদিন বেড়াতে আসবেন।'

'নিশ্চয় যাব। ধন্যবাদ। মিঃ ডি উইণ্টার কেমন আছেন?'

'ভাল আছেন।' ওদিকে বিয়েট্রিসের কথাও আমার কানে যাচ্ছিল। সে তখন বলছিল, 'বুড়ো মার্কসম্যানের কথা তোমার মনে আছে দিদিমা? সেই যে খুব বড় শিকারী?'

'ও, হাঁ।'

'জান বেচারার দু'চোখই অন্ধ হয়ে গেছে।'

'আহা বেচারা!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা বললেন। দিদিমাকে এসময়ে অন্ধ হওয়ার গল্প বলা যে বিয়েট্রিসের উচিত হচ্ছে না সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। অপ্রস্তুত হয়ে নার্সের দিকে তাকালাম। সে কিন্তু তখন একমনে বোনার কাঁটা চালাতে ব্যস্ত। সে আবার আমায় প্রশ্ন করলো, 'আপনি শিকার করতে জানেন মিসেস ডি উইণ্টার?'

'না।'

'এরকম জায়গায় শিকার করতে না জানলে সময় কাটতে চায় না। আমরা সবাই শিকার করতে বড় ভালবাসি।' বিয়েট্রিস এবার মুখ ফিরিয়ে বললো, 'মিসেস ডি উইণ্টার আঁকতে ভালবাসেন।'

'তাই নাকি? আপনি তাহলে শিল্পী!' নার্সটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো। বিয়েট্রিস তার দিদিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে বললো, 'জান দিদিমা আমাদের পরিবারে একজন শিল্পী পেয়েছি।'

'শিল্পী? কে? কই, আমি তো কিছু জানিনা।'

'তোমার নূতন নাত বৌ গো। আমি তাকে বিয়েতে কি উপহার দিয়েছি জিজ্ঞেস কর না।' বিয়েট্রিসের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছিলাম। দিদিমা আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'বৌ কি বলছে? সত্যি তুমি শিল্পী?'

'বিয়েট্রিস বানিয়ে বলছে। আঁকবার একটু আধটু সখ আছে বলে বিয়েট্রিস আমাকে খুব সুন্দর কয়েকখানি শিল্পের বই উপহার দিয়েছে।'

'ও, বই দিয়েছে? এ যে তেলা মাথায় তেল দেওয়া দেখছি। ম্যাণ্ডারলের লাইব্রেরিতে কি বইয়ের অভাব?' বৃদ্ধা এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। আমরাও তাঁর সাথে যোগ দিলাম।

'তুমি বুঝতে পারছো না দিদিমা। ওগুলো কি সাধারণ বই নাকি?' বিয়েট্রিসের স্বরে অভিমান ফুটে উঠলো।

'বিয়েতে বই উপহার! ভারি মজার ব্যাপার কিন্তু। আমাদের সময় তো এরকম উপহারের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না।' তিনি আবার হেসে উঠলেন। বিয়েট্রিস তাঁর কথায় বেশ মনক্ষুণ্ণ হোল। দিদিমা হঠাৎ বিরক্তিভরা সুরে বলে উঠলেন, 'চা দিচ্ছে না কেন? সাড়ে চারটে বাজে নি? নোরা কেন চা আনছে না?'

'সে কি! দুপুরে অত খাওয়ার পর আবার এখনি ক্ষিদে পেয়ে গেল!' নার্স উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললো।

আমি তখন ভাবছিলাম বুড়ো হলে মানুষ শিশুর চাইতেও অবুঝ হয়ে পড়ে কেন! বৃদ্ধা আবার চোখ বুজে চুপ করে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। এখন ঠিক ম্যাক্সিমের মতই দেখাচ্ছে তাঁকে। যৌবনে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন আমি যেন কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তন্বী সুন্দরী একটি যুবতীর ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মৃত্যু পথ যাত্রী আজকের এই বৃদ্ধার জীবন থেকে চিরতরে খসে পড়েছে যে সব দিনগুলি তারাই আজ আমার সামনে মূর্ত

হয়ে উঠে আমার জীবনকেও দোলা দিয়ে যাচ্ছে যেন! একদিন যিনি ছিলেন ম্যাণ্ডারলের সর্বময়ী কর্ত্রী আজ তিনি সব হারিয়ে প্রকাণ্ড এই লাল বাড়ির গহ্বরে শুধু দাসদাসী আর নার্সের দায়িত্বে পড়ে আছেন শেষ দিনটির প্রতীক্ষায়। ফুল ফোটে, সৌরভ ছড়ায় তারপর ঝরে পড়ে মাটির বুকে। জীবনের এই পরম কঠিন সত্যকে কে অস্বীকার করবে !.......

অন্ধ প্রায় চোখ দু'টি বুজে এখন তিনি কি ভাবছেন? তিনি কি অনুভব করতে পারছেন যে এখন থেকে ওঠবার ব্যস্ততায় বিয়েট্রিস ঘন ঘন তার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে! আমরা তাঁকে দেখতে এসেছি শুধুই শুষ্ক কর্তব্যের দায়ে, সে কথা কি তিনি বুঝতে পেরেছেন! ম্যাণ্ডারলের কথা কি তিনি ভাবেন কখনও? আমি যেখানে খেতে বসি সেখানে তো তিনিও একদিন খেতে বসতেন সেই স্মৃতি কি তাঁর মনে জাগে না? আমারই মত বাদাম-তলায় বসে কি তিনি কোনদিন চা খেয়েছিলেন! কে জানে! হয়তো সেসব দিনের কথা কিছুই আজ তাঁর মনে নেই। তাঁর ঐ ক্লান্ত বিবর্ণ চেহারার আড়ালে আজ হয়তো শুধুই রয়েছে অনুভূতি শূন্য একটি মন, যার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। কিন্তু জরাজীর্ণ বৃদ্ধার চোখ বুজে থাকা এই ক্লান্ত মূর্তি নয়, আমি দেখতে চাই তাঁর যৌবন দীপ্ত, কর্মঠ জীবনের আনন্দ-মুখর সেই সব দিনগুলিকে।

'নোরা কেন চা আনছে না?' দিদিমার বিরক্তি ভরা স্বরে আমার তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। বিয়েট্রিস চুপি চুপি নার্সকে বললো, 'তুমি কি করে এই কাজ করেছো? আমাকে তো দিনে হাজার টাকা দিলেও করতে পারতাম না।'

'আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি এখানে বেশ আরামেই আছি। এই যে নোরা আসছে।' নোরা ছোট্ট একটি টেবিল, শাদা ধবধবে টেবিল ক্লথ নিয়ে ঢুকলো। দিদিমা অভিযোগের সুরে বললেন, 'এতক্ষণ কি

করছিলে ?' নোরাও হাসিমুখে উত্তর দিলো, 'এই তো সবে সাড়ে চারটে বাজলো।' সবাই ওঁকে শিশুর মত মনে করে তাঁর সঙ্গে কত হালকা ভাবে কথা বলছে।

আমরা চুপচাপ চা, খাবার খেতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম দিদিমার মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠছে। একটু পরে তিনি বলে উঠলেন, 'উঃ কী গরম চা! কতবার বলেছি এত গরম চা আমি খেতে পারি না। কে শোনে আমার কথা।' তারপর তিনি চামচ দিয়ে একটু একটু করে চা খেতে লাগলেন। আবার তাঁর দৃষ্টি কেমন আনমনা হয়ে গেছে। কি ভাবছেন কে জানে! বিয়েট্রিস এবার দিদিমার দিকে ফিরে বললো, 'জান দিদিমা মধু-যামিনীতে ওরা ইতালী গিয়েছিল। ম্যাক্সিম রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে এসেছে।'

'ম্যাক্সিম আজ আসে নি কেন ?'

বিয়েট্রিস অধৈর্যভাবে বলে উঠলো, 'তোমাকে তো বললাম যে লণ্ডনে গেছে।'

'ও। কিন্তু ইতালীতে গিয়েছিল কেন ?'

'বিয়ের পর বেড়াতে গিয়েছিল। এখন ফিরে এসেছে।' নার্সও জোরে বললো তাঁকে, 'মিঃ এবং মিসেস ডি উইণ্টার এখন ম্যাণ্ডারলে ফিরেছেন।' আমি এবার তাঁর একান্ত কাছে গিয়ে বললাম, 'এখন ম্যাণ্ডারলে ফুলে ফুলে কী সুন্দর হয়ে উঠেছে! গোলাপেরা সব ফুটতে সুরু করেছে।'

'আমি গোলাপ খুব ভালবাসি।' বিমনাভাবে কথাটা বলে তিনি আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আবার বললেন, 'তুমিও ম্যাণ্ডারলেতে আছ ?' আমি কোন উত্তর না দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বিয়েট্রিস অস্থির স্বরে বলে উঠলো, 'আঃ দিদিমা, তুমি তো জান ও এখানে থাকে। ম্যাক্সিম যে ওকে বিয়ে করেছে।' লক্ষ্য করলাম নার্স তাড়াতাড়ি তাঁর চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে চিন্তিত ভাবে তাঁর দিকে

তাকাচ্ছে। তিনি বালিশে হেলান দিয়ে গায়ে শাল টেনে নিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তোমরা বড়ো বেশি বাজে কথা বল। কি বলছো কিছু বুঝতে পারছি না।' তারপর ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কে? তোমাকে তো কোন দিন দেখিনি! তোমাকে আমি চিনি না। ম্যাণ্ডারলেতে তুমি কোন দিন ছিলে না। বী, এই ছেলেমানুষ মেয়েটি কে? ম্যাক্সিম রেবেকাকে আনেনি? রেবেকাকে আমি কত ভালবাসি। রেবেকা কোথায়?'

এবার কেউ কোন কথা বলছে না। অসহ্য নীরবতায় প্রতিটি মুহূর্তকে কী দীর্ঘ মনে হচ্ছে! আমার মুখ লাল হয়ে উঠলো অনুভব করলাম। নার্স তখনই তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। তিনি বলে চলেছেন, 'আমি রেবেকাকে দেখতে চাই। তোমরা তাকে কি করেছ?' বিয়েট্রিস ত্রস্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালো। তার ঠোঁট কাঁপছে। নার্স কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে বলে উঠলো, 'আমার মনে হয় আপনাদের এখন চলে যাওয়া উচিত। এরকম ভাব কিছুক্ষণ থাকবে। অনেকদিন পর এমন অপ্রকৃতস্থ হলেন। কিছু মনে করবেন না মিসেস ডি উইণ্টার।'

'না, না, মনে করবার কিছু নেই। আমাদের এখন চলে যাওয়াই উচিত।' আমরা দু'জনে আমাদের ব্যাগ, দস্তানা তুলে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলাম। নার্স তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলছে, 'আরও একটু স্যাণ্ডউইচ দেব?'

'রেবেকা কোথায়? ম্যাক্সিম রেবেকাকে নিয়ে আসেনি কেন?' ক্লান্ত, ক্ষীণ স্বরে আবারও সেই এক প্রশ্ন!

আমরা ড্রয়িং রুমের ভেতর দিয়ে হলঘর পার হয়ে বেরিয়ে এলাম। বিয়েট্রিস একটিও কথা না বলে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলো। শাদা ফটক পার হয়ে গাড়ি সদর রাস্তায় এসে পড়লো। আমি সোজা পথের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার জন্য আমি কিছুই ভাবছিলাম না। আমি

একা থাকলে এমন অবস্থায় কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু বিয়েট্রিসের কথা ভেবে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। এই আকস্মিক ব্যাপারটা তার কাছে কত অপ্রীতিকর! কিছুক্ষণ নীরবতার পর বিয়েট্রিস কথা বললো, 'আমি খুব দুঃখিত ভাই। কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না।'

'তুমি কিছু ভেবো না বী। এমন কি হয়েছে!'

'আমি আগে বুঝতে পারিনি যে এরকম হবে। তাহলে তোমাকে নিয়ে আসতাম না। কী বিশ্রী ব্যাপার হোল বলতো!'

'লক্ষ্মীটি আর এসব কথা বোল না।' অনুনয়ের সুরে বললাম। কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে সে বলতে লাগলো, 'তোমার কথা দিদিমা সব জানেন। ম্যাক্সিম এবং আমি দু'জনেই তোমার কথা তাঁকে জানিয়েছিলাম। তোমাদের বিয়ের খবর পেয়ে তিনি কত খুশি হয়েছিলেন।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ তাঁর কত বয়স হয়েছে। ওসব কথা তাঁর কি মনে আছে?' আবার নীরবতা নেমে এলো। আঁকা বাঁকা রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকুনিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে পারছিলাম বলে আরাম পেলাম মনে মনে। একটু পরে বিয়েট্রিস আবার বললো, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম উনি রেবেকাকে কী অদ্ভুতভাবে ভালবাসতেন। ওরকম যে হবে আমার আগে থেকে বোঝা উচিত ছিল। এখন বুঝতে পারছি সেই দুর্ঘটনার কথা তাঁর মনে এতটুকুও রেখাপাত করতে পারেনি। ওঃ আজ বিকেলটা কিভাবে নষ্ট হোল! তুমি আমাকে কি ভাববে।'

'লক্ষ্মীটি এভাবে আর বোলনা। আমি কিছুই মনে করিনি সত্যি বলছি।'

'রেবেকা তাঁকে নিয়ে সর্বদা কত আমোদ আহ্লাদ করতো। তার প্রতিটি কথায় দিদিমা হেসে লুটোপুটি যেতেন। রেবেকা সবাইকে খুব আনন্দ দিতে পারতো। মানুষকে আকর্ষণ করবার কী অদ্ভুত ক্ষমতাই

না তার ছিল! মেয়ে পুরুষ শিশু নির্বিশেষে, শুধু মানুষই নয়, পশু-পাখি সকলে তাকে ভালবাসতো! দিদিমা তাকে কোনদিন ভুলতে পারবেন না। আজকের সন্ধ্যা এভাবে নষ্ট করবার জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।' যন্ত্রের মত আমি আবারও বলে উঠলাম, 'আমি কিছু মনে করিনি বিশ্বাস কর।'

'গাইলস শুনলে ভারি অপ্রস্তুত হয়ে যাবে। তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবার জন্য সে আমাকে বকবে।'

'এসব এখন ভুলে যাও বী। আর বোলনা। তুচ্ছ ঘটনাকে কথায় কথায় বাড়িয়ে তুলছো।'

'গাইলস আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারবে কিছু একটা ঘটেছে। তাছাড়া তাঁকে আমি কোন কথা লুকাতেও পারি না।' আমি এবার চুপ করে রইলাম। কি আর বলবো? বুঝলাম এই ব্যাপারটা কেমন করে এক থেকে অপর মুখে পল্লবিত হয়ে উঠবে। ম্যাক্সিমের কানে খবরটা না পৌঁছলেই বাঁচি!

আচমকা সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেলাম অদূরে ম্যাণ্ডারলের গম্ভীর বনরেখার ফাঁকে ফাঁকে নীল সাগরের ঝিলিমিলি! ম্যাণ্ডারলে এসে গেছে। বিয়েট্রিস বললো, 'তোমাকে ফটকের সামনে নামিয়ে দিলে খুব অসুবিধা হবে না তো? আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'আমি ওটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারবো।'

'আচ্ছা।' বিয়েট্রিসের স্বরে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো। বুঝলাম সে এখন কোন ছলে একা থাকতে চায়, ম্যাণ্ডারলে আসতে চায় না। আজকের বিকেলের তিক্ত স্মৃতি সে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছে না। আমি ফটকের সামনে নেমে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। বিয়েট্রিস বললো, 'আবার যেদিন দেখা হবে সেদিন যেন তোমায় ভাল

দেখতে পাই। শরীরটাকে একটু যত্ন কোর। এত রোগা হওয়া তো ভাল নয়। ম্যাক্সিমকে আমার ভালবাসা জানাবে। আর আজকের জন্য আমাকে ক্ষমা কোর।'

একরাশ ধুলো আর ধোঁয়া ছড়িয়ে একনিমেষে তাঁর গাড়িটি উধাও হয়ে গেল। আনমনে পথ চলতে চলতে ভাবছিলাম একদিন যেদিন ম্যাক্সিমের দিদিমা এই পথ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছেন সেদিনের চেয়ে আজকের এই পথ কতখানি বদলেছে! জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধার কথা আর মনে রইলো না। সুদূর অতীতের অন্ধকার আবরণ ভেদ করে ম্যাণ্ডারলের বিগত জীবনের এক একটি ছবি আমার দিব্য দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো! ম্যাণ্ডারলের তখনকার দিনের কত ছবি হয়তো আজও কোন এলবামের পাতায় চিরতরে বন্দী হয়ে আছে! মাত্র কয়েক বছর আগেকার দিদিমাকেও যেন আজ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। লাঠি ভর দিয়ে ম্যাণ্ডারলের অঙ্গনে, অলিন্দে ঐ যে তিনি পায়চারি করছেন; তারই পাশে রয়েছে আরও একজনা, তাঁর হাত ধরে সকৌতুক কলরবে, আনন্দোচ্ছ্বাসে যে প্রতিটি মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলছে! কী অপরূপ সে দেখতে! বিয়েট্রিস বলেছে লোককে আকর্ষণ করবার ক্ষমতাও তার ছিল অসীম! কী এক অজানা আকর্ষণে তার কথা ভাবতে ভাবতে একটা স্বপ্নাবেশের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো পথের শেষে যেখানে ম্যাক্সিমের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণকার স্বপ্ন-কুহেলি একনিমেষে টুটে গিয়ে আমার বুক আনন্দে নেচে উঠলো। প্রায় ছুটে হলঘরে গিয়ে দেখলাম টেবিলের ওপর তার দস্তানা আর টুপি রয়েছে। এবার লাইব্রেরির দিকে চললাম। লাইব্রেরির কাছে এসে ম্যাক্সিমের উত্তেজিত গলার স্বর শুনতে পেয়ে ঘরে না ঢুকে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরজা বন্ধ ছিল কিন্তু ম্যাক্সিমের কথা শুনতে পাচ্ছি।

'তুমি তাকে জানিয়ে দেবে সে যেন ভবিষ্যতে আর কখনও ম্যাণ্ডারলে না আসে, বুঝলে? তার কথা কে আমাকে বলেছে তা তোমার জেনে দরকার নেই। তার সাথে দেখা করবার ইচ্ছে হলে ম্যাণ্ডারলের বাইরে গিয়ে দেখা করতে পার। কিন্তু ফটকের এদিকে যেন সে আর এক পাও না বাড়ায়। শেষবারের মত তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মনে রেখো।' দরজা খোলার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চিত্রশালার দিকে চলে এসে দরজার পেছনে লুকিয়ে রইলাম। ডানভারস লাইব্রেরি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার মুখ চোখ রাগে অপমানে ফেটে পড়ছে! কী ভয়ানক কুটিল হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি! সিঁড়ি দিয়ে উঠে পশ্চিম মহলের দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ সেখানেই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। ম্যাক্সিম একটা চিঠি হাতে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল আমার দিকে পেছন ফিরে। একবার ভাবলাম চুপি চুপি ফিরে চলে যাই। কিন্তু সে বোধহয় দরজার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তাই ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'কে?' আমি তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে একটু হেসে বললাম, 'আমি।'

'ও, তুমি!'

তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম কোন কারণে সে খুব রাগ করেছে। মুখখানি কঠিন, বিবর্ণ। 'কি করলে এ দু'দিন?' আমার কাছে এসে কপালে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো। মনে হোল কত যুগ পর যেন আমি তাকে আমার একান্ত কাছে পেলাম!

'দিদিমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আজ বিকেলে বিয়েট্রিস আমায় নিয়ে গিয়েছিল।'

'কেমন আছেন তিনি?'

'ভাল আছেন।'

'বী এলো না কেন ?'

'তার কি কাজ আছে বললো।'

ম্যাক্সিম এবার জানালার ধারে গিয়ে বসলো। আমিও পাশে বসে তার হাত আমার হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'তুমি কেন গেলে ? এ দু'দিন আমার একটুও ভাল লাগেনি। প্রতি মুহূর্তে তোমার কথা মনে হয়েছে।'

'সত্যি ?' একটু হেসে সে প্রশ্ন করলো। তারপর দু'জনেই চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙ্গে আমিই আবার প্রশ্ন করলাম, 'লণ্ডনে কেমন গরম পড়েছে ?'

'খুব। ও জায়গাটা আমার একটুও ভাল লাগে না।' আবার আমরা চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম ডানভারসের সাথে তার কি কথা হোল আমায় তা বলবে কিনা! ফ্যাবেলের আসার কথা কে তাকে বলেছে তাও ভেবে পেলাম না।

'কি ভাবছো ? তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ?'

'কিছু না। সারাদিন বড় পরিশ্রম গেছে তাই অমন দেখাচ্ছে।' সে এবার উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগলো। বুঝতে পারলাম সে আমায় ওসব কিছু বলবে না। আমিও খুব আস্তে আস্তে বলে উঠলাম, 'আমিও বড় ক্লান্ত। আজ দিনটা কী অদ্ভুত কাটলো !'

॥ ১৬ ॥

আজও মনে পড়ছে ফ্যান্সিড্রেসবলের প্রসঙ্গ যেদিন প্রথম তোলা হয়েছিল সেদিনটা ছিল এক রবিবার। সেদিন ফ্র্যাঙ্ক আমাদের সাথে দুপুরবেলা খেতে এলো। খাওয়ার পর আমরা তিনজন অলিন্দে বসে গল্প করছি। ভেবেছিলাম বিকেলবেলা বাদাম গাছ তলায় বসে অলস অন্য মনে চা খাব, গল্প করবো। কখনও বা কোন কথা না বলে দু'চোখ ভরে প্রকৃতির বিজন রূপলীলা দেখবো, অনুভব করবো। এমনি করে বিকেলটা কেটে যাবে অনাবিল শান্তি আর নির্ভাবনায়। কিন্তু আমাদের সে কল্পনা নিমেষে ভেঙ্গে দিয়ে হঠাৎ শোনা গেল অনেকগুলি গাড়ি আসার শব্দ। চেয়ে দেখি একদল অতিথি এসে গেছে। মন না চাইলেও হাসিমুখে এগিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলাম। শুষ্ক ভদ্রতার খাতিরে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তাদের সাথে সাথে এদিক ওদিকে, ম্যাণ্ডারলের গোলাপ বাগানে, বনে উপবনে আর হ্যাপিভ্যালিতে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর বৈকালিক চায়ের আসরে তাদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসতে হোল। ফার্থ আর রবার্ট মহা সমারোহে আমাদের চা আর কত কি খাবার পরিবেশন করছে। বিরাটকায় রূপোর কেটলীটির দিকে চেয়ে ভাবছি কি করে ফার্থ সেটা নাড়াচাড়া করছে! আমার পাশে তাদের আলাপ আলোচনায় মন বসাতে পারছি না। এসব সামাজিক ব্যাপারে আমার সংকট মুহূর্তে ফ্র্যাঙ্কই আমার একমাত্র বন্ধু, ত্রাতা। আমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে সে সবাইকে দিচ্ছে। অন্যমনে কি ভাবতে ভাবতে আমি তাদের সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারছি না দেখে সে তাদের সাথে আমার হয়ে কথা বলছে। ম্যাক্সিম ঘরের আর এক দিকে অনেককে বই, ছবি

এসব দেখাচ্ছে গৃহস্বামীর সহজ, স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে। তার কাছে চা খাওয়া পর্বের এসব জাঁকজমক, সমারোহ লক্ষ্য করার মত কোন ঘটনাই নয়। তার নিজের চা তো ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ বসে আছি, চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এমন সময় লেডি ক্রোয়ান ম্যাক্সিমকে তাঁর দিকে আসতে দেখে বলে উঠলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলবো অনেক দিন থেকে ভাবছি। আচ্ছা ম্যাণ্ডারলের ফ্যান্সি ড্রেস বল কি আবার প্রবর্তন করবেন?' আমি মুখ নিচু করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি। কেমন একটা অসোয়াস্তিতে মন ভরে উঠলো। ম্যাক্সিম কিন্তু বেশ শান্ত সহজ ভাবে উত্তর দিল, 'আমি এ বিষয়ে এখনও কিছু ভেবে দেখিনি।' লেডি ক্রোয়ান বললেন, 'সকলের হয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি আবার ঐ উৎসবটার আয়োজন করুন।' ম্যাক্সিম এবার শুষ্ক স্বরে বললো, 'ব্যাপারটা খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ। ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞেস করুন। তাকেই তো সব করতে হয়।'

'মিঃ ক্রলে, আপনি আমাদের পক্ষে আসুন।' লেডি ক্রোয়ানের সাথে এবার সমবেত সকলে একযোগে তাদের আগ্রহ জানালো। ক্রলের শান্ত স্বর শুনতে পেলাম, 'ম্যাক্সিমের আপত্তি না থাকলে আমি সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে রাজী আছি। কিন্তু অনুষ্ঠানটি আবার প্রবর্তন করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত করবেন ম্যাক্সিম এবং মিসেস ডি উইণ্টার।' এবার আমি হলাম তাদের প্রধান লক্ষ্য। লেডি ক্রোয়ান আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'মিসেস ডি উইণ্টার, আপনার স্বামীকে আমাদের হয়ে বলুন, আপনার কথা উনি রাখবেন। এখানে আপনার আগমন উপলক্ষ করে আপনার সম্মানে তাঁর এই উৎসবের আয়োজন করা উচিত।' ওদিক থেকে কে একজন ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'হাঁ, উনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনাদের বিয়ের আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এখন একটা উৎসবের আয়োজন না করলে আমাদের ওপর খুব অন্যায় করা হবে। আচ্ছা, কে কে আমাদের সমর্থন করছেন হাত তুলুন। মিঃ ডি উইণ্টার, দেখলেনতো? প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে গেল।' হাততালি দিয়ে সবাই হেসে উঠলো। ম্যাক্সিম আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি কি বল?'

'আমি কি বলবো? তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে।' লেডি ক্রোয়ান বলে উঠলেন, 'ওঁর সম্মানার্থে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। উনি তো সমর্থন করবেনই। আচ্ছা মিসেস ডি উইণ্টার, আপনি কি সাজ করবেন? আমার মতে আপনাকে গ্রাম্য মেষপালিকার সাজে ভারি চমৎকার মানাবে!' আমার রূপ নেই, আমি যে কত সাধারণ তাঁর এই কথায় আর একবার আমার মনে পড়লো। এমন সময় ফ্র্যাঙ্ক এই আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দিল বলে তার ওপর আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। সে ম্যাক্সিমকে বললো, 'মিসেস ডি উইণ্টারের সম্মানে একটা উৎসব আমাদের করা উচিত একথা আমাকেও অনেকে বলেছেন।' লেডি ক্রোয়ান এবার বিজয় গর্বে বলে উঠলেন, 'তাহলে? এবার আর আপনি অমত করবেন না মিঃ ডি উইণ্টার।'

ম্যাক্সিম আমার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল। আমার মত অসামাজিক, লাজুক মেয়ে কি করে ওরকম বিরাট উৎসবে নিজেকে মানিয়ে নেবে তাই হয়তো ভাবছিল সে। আরও কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাহলে তুমি সব ব্যবস্থা করতে আরম্ভ কর। মিসেস ডানভারস তোমাকে সাহায্য করবে।' লেডি ক্রোয়ান অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'মিসেস ডানভারস! সেই অদ্ভুত মহিলাটি এখনও আপনাদের এখানে আছে নাকি?' ম্যাক্সিম তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললো, 'আপনাদের খাওয়া শেষ হয়েছে তো? চলুন তাহলে বাগানে বেড়িয়ে আসা যাক।' তারপর আমরা সবাই এদিক

ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। সবাই ফ্যান্সি ড্রেস বলের জল্পনা কল্পনা করছে। অবশেষে তাদের যাবার সময় হোল। একে একে সবাই চলে যাবার পর আমি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ড্রয়িংরুমে গিয়ে আরও এক কাপ চা খেতে খেতে ভাবছিলাম যাক আজকের মত অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করবার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। একটু পরে ফ্র্যাঙ্কও এসে আমার পাশে বসলো। ম্যাক্সিম বাইরে জেসপারের সাথে খেলা করছে। আমরা দু'জন কিছুক্ষণ কোন কথা বললাম না। চা খাওয়া শেষ করে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ফ্যান্সিড্রেসবল সম্বন্ধে আপনার কি মত?' সে একটু দ্বিধা করে জবাব দিল, 'আমার আবার মতামত কি? ম্যাক্সিমের কোন আপত্তি নেই সেটাই যথেষ্ট।'

'মত না দিয়ে তার তো কোন উপায় ছিল না। আচ্ছা, আপনার কি সত্যি মনে হয় যে এখানকার সকলেই ম্যাণ্ডারলের এই বিশেষ উৎসবটির জন্য ব্যাকুল আগ্রহে দিন গুনছে?'

'হাঁ, সে কথা সত্যি। তাছাড়া লেডি ক্রোয়ান যে বললেন আপনার সম্মানার্থে একটা কিছু করা দরকার তাতে কিন্তু আমি তাঁর সাথে এক মত।'

'না, আমি তা চাই না। আমার বিয়েতেও কোন জাঁকজমক হয় নি।'

'তাতে কি হয়েছে? উৎসব-মুখর ম্যাণ্ডারলে সত্যি অপূর্ব! দেখবেন আপনারও খুব ভাল লাগবে। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। অতিথি অভ্যাগতদের শুধু অভ্যর্থনা করবেন। আচ্ছা, আপনার সাথে আমি নাচবার অনুমতি পাব তো?' সহজ, সরল ফ্র্যাঙ্ক। সত্যি ওকে আমার বড় ভাল লাগে। আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম, 'যতবার খুশি আপনি আমার সাথে নাচবেন। ম্যাক্সিম আর আপনি ছাড়া আমি অন্য কারও সাথে নাচলে তো!'

'না, না, তাহলে বড় বিশ্রী হবে। সবাই খুব মনক্ষুণ্ণ হবে। আপনি অন্যদেরও নিরাশ করবেন না।' সে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আমি হাসি লুকাবার জন্য মুখ ফেরালাম।

'লেডি ক্রোয়ান বললেন আমাকে গ্রাম্য মেষপালিকার বেশে ভাল মানাবে। আপনি কি বলেন ?'

'হাঁ, সেই সাজে আপনাকে সত্যি খুব সুন্দর মানাবে!' আমি এবার জোরে হেসে উঠলাম। আমাকে হাসতে দেখে সে অবাক হয়ে বললো, 'হাসছেন যে ?' এমন সময় ম্যাক্সিম ঘরে ঢুকলো। জেসপার তার পেছনে লাফাতে লাফাতে আসছে।

'কি হোল ? এত হাসছো কেন ?'

'উনি বলছেন লেডি ক্রোয়ানের কথা মত গ্রাম্য মেষ পালিকার সাজে আমাকে নাকি খুব ভাল মানাবে!'

'লেডি ক্রোয়ানের কথা ছেড়ে দাও। তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই উৎসবের আয়োজন করতে হলে যেরকম পরিশ্রম করতে হয় তার শতাংশের একাংশও তাঁকে করতে হলে তিনি এতটা উৎসাহ দেখাতেন না। আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক কত লোককে নিমন্ত্রণ করতে হবে ?'

'নিমন্ত্রিতদের তালিকা অফিসে আছে। তাতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু অতগুলি চিঠিতে টিকিট লাগানোই একটা বড় কাজ।'

আমার দিকে তাকিয়ে ম্যাক্সিম হেসে বললো, 'সে কাজটা তুমি করবে, কেমন ?'

'না, না, মিসেস ডি উইণ্টারকে ওসব নিয়ে একটুও ভাবতে হবে না। আমরাই সব করতে পারবো।' আমাকে কোন দায়িত্ব নিতে হবে না ভেবে আমি খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু টিকিট লাগাবার কাজটাও আমি সুষ্ঠু ভাবে করতে পারবো না ভেবে আমার আত্মসম্মানে কেমন একটু আঘাতও লাগলো। বসবার ঘরে লেখবার টেবিলের ছোট ছোট

দেরাজের ওপর সেই বাঁকা আখরগুলি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠে আমাকে যেন বিদ্রূপ করতে লাগলো। নিজেকে সামলে নিয়ে ম্যাক্সিমকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি সাজবে?'

'একমাত্র গৃহস্বামীকেই সঙ সাজবার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাই না ফ্র্যাঙ্ক?'

'আমি কিন্তু মেষপালিকা সাজবো না।'

'বেশ তো। তোমার এই ছোট্ট চুলে একটি রিবন বেঁধে আজব দেশে এলিস হওনা কেন? এখন তোমাকে ঠিক তাই মনে হচ্ছে।'

'কেন এমন বলছো? দেখে নিও তোমাদের দু'জনকেই কেমন অবাক করে দিই! কি সাজ করবো এখন কিছু বলবো না।'

'মুখে কালি ঝুলি মেখে বাঁদরের মত অদ্ভুত সাজ না হলেই হোল।'

'বেশ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা কেউ কিছু জানতে পারবে না। জেসপার, আয়, আমরা এখান থেকে চলে যাই।' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলাম ম্যাক্সিম খুব হেসে ফ্র্যাঙ্ককে কি যেন বলছে।

বাগানের দিকে চলতে চলতে ভাবছিলাম ম্যাক্সিম কেন আমাকে সব সময় এত ছেলেমানুষের মত মনে করে ওরকম ব্যবহার করে! তার খেয়াল খুশি মত মাঝে মাঝে সে আমায় আদর করে সোহাগ করে, কিন্তু কোন ছোট মেয়েকে বড়রা যেমন আদর করে ঠিক তেমনি। কত সময়ে আমার অস্তিত্ব নিঃশেষে ভুলে গিয়ে সে আপন মনে কি ভাবে। তখন আমার মনে হয় আমার কাছ থেকে সে যেন কতদূরে চলে গেছে। তার একলা মনের গোপন ব্যথার কোন সন্ধান আমি পাইনি আজ অবধিও। এ জীবনে কি কোনদিনই আমি তার উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনী হতে পারবো না! আজকের এই ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙ্গে তার মনের একান্ত সংগোপনে তার সত্যিকারের সহধর্মিণীর স্থান কি কোনদিনও পাব না! এভাবে কি আমাদের সমস্ত জীবন কেটে যাবে। আমাকে

কেন আরও বয়স্ক, আরও অভিজ্ঞ দেখায় না! তাহলে তো আমাকে সে তার মনের কাছ থেকে এত দূরে সরিয়ে রাখতে পারতো না। উত্তাল সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমনি কত কি যে ভেবে চলেছি। হঠাৎ মনের মধ্যে কেমন অস্থিরতা অনুভব করলাম। 'জেসপার, আয়, ছুটে আয়' বলে আমিও ছুটে চলেছি পাগলের মত। আমার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে অজস্র জলের ধারা।······

ফ্যান্সি ড্রেস বলের খবর ঝড়ের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ক্ল্যারিস তো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সারাদিন কেবল এই এক কথাই বলছে। তার কাছ থেকে শুনলাম ম্যাণ্ডারলের সবাই এই খবর শুনে খুশি হয়েছে। ক্ল্যারিস আমাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি সাজবেন?'

'এখনও কিছু ভাবিনি।'

'আমার মা বলেন গেল বছরের কথা জীবনেও তিনি ভুলতে পারবেন না। আপনি কি লণ্ডন থেকে পোশাক আনাবেন?'

'কি সাজ করবো তা ঠিক করলে তোমাকেই সব প্রথম জানাবো। আর কাউকে বোল না কিন্তু।'

'ও, কী মজা! না, আমি কাউকে বলবো না।'

এই সংবাদ জেনে ডানভারস কি ভাবছে, তার মনের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হোল। সেদিন বিকেলের পর তার সাথে আমার আর দেখা হয় নি। সেদিন তার যে রকম ভয়ানক মুখের ভাব হয়েছিল আমি জীবনেও তা ভুলতে পারবো না। সে হয়তো ভেবেছে আমিই ফ্যাবেলের কথা ম্যাক্সিমকে বলে দিয়েছিলাম। সে এখন আমাকে আরও বেশি করে ঘৃণা করবে। আমার হাতে তার হিম শীতল হাতের স্পর্শ আর কানের কাছে সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের তিক্ত

স্মৃতি আজও আমাকে শিউরে তোলে। সেদিনের কথা নিঃশেষে ভুলে যেতে চাই। কিন্তু ভুলতে পারি কই!

উৎসবের আয়োজন দ্রুততালে চলেছে। ম্যাক্সিম আর ফ্র্যাঙ্ক রোজ সকালবেলা অফিসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যস্ত থাকছে। আমাকে কিছু করতে হচ্ছে না। কিন্তু যতই দিন ঘনিয়ে আসছে কি সাজ করবো আমি সে ভাবনাই আমাকে বড় ভাবিয়ে তুললো। অবশেষে একেবারে মরিয়া হয়ে একদিন সকালবেলা বিয়েট্রিসের দেওয়া আঁকবার সেই বইগুলি নিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বসে একের পর এক ছবি দেখতে লাগলাম যদি তার মধ্য থেকে কোন ছবির সাজ আমার পছন্দ হয় এই আশায়। কিন্তু কোনটাই আমার মনে ধরলো না। বিখ্যাত শিল্পী রুবেন, র‍্যামব্রাণ্টের বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য এত অপূর্ব যে তাদের কোন সাজ আমাকে মানাবে না। তবু একটা কাগজে পেন্সিল দিয়ে দু'একটা ছবি নকল করলাম। কিন্তু মনমত না হওয়ায় সেগুলোও বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। সেদিন সন্ধ্যেবেলা শোবার ঘরে বসে আছি এমন সময় কে কড়া নাড়লো। ক্ল্যারিস এসেছে ভেবে বললাম, 'ভেতরে এসো।' দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো ক্ল্যারিস নয়, ডানভারস। তার হাতে কি একটা কাগজের টুকরো।

'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে। দিনশেষে সমস্ত বাজে কাগজের ঝুড়িগুলিকে দেখবার জন্য আমার কাছে আনা হয়। লাইব্রেরি ঘরের ঝুড়িতে এই কাগজটি পেলাম। দেখুন, এটা দরকারি কিছু নয়তো?' তাকে দেখেই আমি কেমন হয়ে গেলাম। কাগজটি আমার দিকে সে এগিয়ে ধরলো। সকালবেলা যে ছবিখানি এঁকে আবার ফেলে দিয়েছিলাম এটা সেটাই! আমি বললাম, 'ওটা একটা ছবির নক্সা। আমার আর লাগবেনা। ফেলে দিন।'

'ও, আচ্ছা।'

ভেবেছিলাম সে এবার চলে যাবে। কিন্তু কোন কথা না বলে সে দাঁড়িয়েই রইলো। কয়েক মুহূর্ত পর আবার বললো, 'কি সাজ পরবেন এখনও কিছু ঠিক করেন নি?'

'না।'

দরজার হাতলে একখানি হাত রেখে সে আমাকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল।

'চিত্রশালায় যে সব ছবি রয়েছে তার মধ্য থেকে কেন একটা বেছে নিন না।'

'হাঁ, তা মন্দ হবেনা।' মনে মনে ভাবলাম আশ্চর্য, ওকথা কেন আমার মনে হয়নি! সে আবার বললো, 'চিত্রশালার প্রতিটি ছবির সাজ পোশাক, ভঙ্গিমা অপূর্ব! বিশেষ করে শাদা পোশাক পরে, হাতে টুপি নিয়ে সুন্দরী তরুণীর যে ছবিখানি আছে সেটা সত্যি অপরূপ!' তার কথায় বেশ আন্তরিকতা ফুটে উঠলো। আমার কাছে সে কেন এসেছে এতক্ষণে তা বুঝতে পারলাম। তাহলে কি আমার সাথে সে বন্ধুত্ব করতে চায়! ফ্যাবেলের কথা আমি যে ম্যাক্সিমকে বলিনি তা বুঝতে পেরে বোধহয় আমার ওপর সে কৃতজ্ঞ হয়েছে।

'মিঃ ডি উইণ্টার আপনার সাজের বিষয় কিছু বলেন নি?' সে আবার প্রশ্ন করলো।

'না। আমি তাঁকে অবাক করে দিতে চাই। এখন কিছু বলবোনা কি সাজ নেব।'

'আমার মনে হয় লণ্ডন থেকে পোশাকটা তৈরী করালে ভাল হবে। যদি ছবির ঐ শাদা পোশাক পরবেন ঠিক করেন তাহলে ভস্, বণ্ডষ্ট্রীট লণ্ডন, এই ঠিকানাটা মনে রাখবেন। ওরা চমৎকার পোশাক তৈরী করে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কাউকে বলে দেবনা।'

'আচ্ছা।'

এবার সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তার আজকের মনোভাব আর সেদিনকার মনোভাবের মধ্যে কী অদ্ভুত ব্যবধান!

সহসা আমার মনে পড়লো জ্যাক ফ্যাবেলের কথা। ফ্যাবেল সম্পর্কে রেবেকার ভাই হয়। কিন্তু ম্যাক্সিম কেন তাকে এত অপছন্দ করে? কেন তাকে ম্যাণ্ডারলেতে আসতে বারণ করে দিয়েছে? বিয়েট্রিস ও তার কথা বেশি কিছু বলতে চায় নি। হাবভাব, চেহারা দেখে তাকে আমারও ভাল লাগেনি। তার চাহনি কি বিশ্রী! ম্যাণ্ডারলে যেন তার কতকালের পরিচিত জায়গা, একেবারে নিজের বাড়ির মত! জেসপারও তাকে দেখে কেমন আনন্দ প্রকাশ করেছিল! কিন্তু ম্যাক্সিম ডানভারসকে সেদিন রেগে যে সমস্ত কথা বলেছিল তার সঙ্গে তো এসবের এতটুকুও সঙ্গতি নেই। রেবেকা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তার সাথেও আমি এই লোকটাকে মেলাতে পারছি না। সবদিক দিয়ে যে অতুলনীয় তার ভাই এমন একটা নগণ্য সাধারণ লোক! এ যেন বড় বিসদৃশ! রেবেকা হয়তো তার এই দূর সম্পর্কীয় ভাইটিকে এখানে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানাতো। ম্যাক্সিম যখন বাড়িতে থাকতো না তখনই হয়তো সে আসতো।

খাবার ঘরে সেদিন দু'জনে বসে খাচ্ছি। খেতে খেতে আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠলো একখানি ছবি। যেখানে আমি বসে আছি ঠিক সেখানটিতে যেন রেবেকা বসে খাচ্ছে। পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠলে ফার্থ এসে রেবেকাকে বললো, 'মিঃ ফ্যাবেল আপনার সাথে কথা বলতে চান।' রেবেকা ম্যাক্সিমের দিকে এক পলক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে ওঘরে চলে গেল। ম্যাক্সিম কোন কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছে। একটু

পরে রেবেকা ফিরে এসে সহজভাবে হালকা সুরে অন্য কথা বলতে লাগলো। ম্যাক্সিমের ক্ষণকাল আগের অপ্রসন্নতা কেটে গিয়ে একটু একটু করে সহজভাবে ফিরে এলো। আবার সে আগের মত হেসে রেবেকার সাথে কথা বলছে!······

'কি ভাবছো?' ম্যাক্সিমের কথায় আমার গভীর তন্ময়তা ভেঙ্গে গিয়ে চমকে উঠলাম। একনিমেষের জন্য যেন আমি আমার আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে রেবেকার আত্মায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিলাম! ম্যাণ্ডারলের ফেলে আসা জীবনে শুধু ভাবনাতেই নয়, মনে প্রাণে ফিরে গিয়েছিলাম! আমার দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললো, 'জান, খেতে খেতে তুমি কেমন অদ্ভুত কাণ্ড করছিলে! প্রথম কান পেতে কি শুনলে। তারপর তোমার ঠোঁট নড়তে লাগলো। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবার মাথা নাড়লে। এক মুহূর্তে এত ব্যাপার ঘটে গেল। ফ্যান্সি ড্রেস বলে কিরকম অভিনয় করবে তারই মহরা দিচ্ছিলে বুঝি?' আমি তার কথায় কোন জবাব না দিয়ে ভাবছি আমার সত্যিকারের মনোভাব জানতে পারলে সে কি বলতো! এক লহমার জন্য সে গত বছরের ম্যাক্স আর আমি রেবেকা হয়ে গিয়েছিলাম একথা জানলে তার মনের অবস্থা কেমন হবে!

'কি হোল? তোমাকে অপরাধীর মত দেখাচ্ছে কেন?'

'না, কিছু হয়নি তো!'

'কি ভাবছিলে বল।'

'কেন বলবো? তুমি কি ভাব আমায় তো কখনও বল না।'

'তুমি তো কোনদিন জানতে চাওনি আমি কি ভাবি।'

'হাঁ, একবার জানতে চেয়েছিলাম।'

'কবে? আমার মনে নেই।'

'সেদিন লাইব্রেরিতে ছিলাম দু'জনে।'

'হতে পারে। আমি কি বলেছিলাম ?'

'বলেছিলে তুমি ভাবছো যে মিডেল সেক্সের বিরুদ্ধে সারেকে মনোনীত করা হবে কিনা।'

ম্যাক্সিম এবার হেসে বললো, 'খুব নিরাশ হয়েছিলে তো ? আচ্ছা, কি ভাবছিলাম তোমার কি মনে হয় ?'

'একেবারে অন্য কথা।'

'কি কথা ?'

'তা জানি না।'

'কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলে থাকি যে আমি খেলার কথা ভাবছিলাম তাহলে সত্যি তাই ভাবছিলাম। আমাদের মন অনেক সহজ সরল, বুঝলে ? কিন্তু মেয়েদের বাঁকা মনের কুটিল গতি বুঝবার সাধ্য কোন পুরুষের নেই। কিছুক্ষণ আগে তোমাকে একেবারে অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল, তা জান ? তোমার মুখের ভাব একেবারে বদলে গিয়েছিল !'

'সত্যি ? কেমন ভাব হয়েছিল ?'

'ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবো না। হঠাৎ যেন তোমাকে কত বয়স্ক, বড় কুটিল মনে হচ্ছিল। আমার একটুও ভাল লাগছিল না।'

'ইচ্ছে করে অমন ভাব আমি করিনি।'

'তা জানি।'

আমার গলা যেন শুকিয়ে আসছে। একটু জল খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমাকে বয়স্ক দেখাক তুমি তা চাওনা ?'

'না।'

'কেন ?'

'তোমাকে তা মানায় না।'

'কিন্তু একদিন তো বয়স আমার বাড়বেই ! চুল পাকবে, কপালেও রেখা পড়বে।'

'তা হোক। তাতে কিছু আসবে যাবে না।'

'তাহলে এখন কেন তোমার ভাল লাগবেনা?'

'একটু আগে তোমার যে রকম মুখের ভাব হয়েছিল তা আমি চাইনা, সত্যি চাই না। তোমার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল, চোখের দৃষ্টিতে কি এক জ্ঞানের আলো, অভিজ্ঞতার জ্বালা ফুটে উঠেছিল! কিন্তু সে জ্ঞানের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন সত্য নেই।'

'কি বলছো তুমি? কোন্ জ্ঞান, কোন্ অভিজ্ঞতা সত্য নয়?' সে এক মূহূর্ত চুপ করে রইলো। ফার্থ এসে প্লেট বদলে অন্য খাবার দিয়ে গেল। ফার্থ চলে গেলে সে খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, 'তোমাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন তোমার মুখে চোখে কেমন একটা সরল সুন্দর ভাব ছিল। আজও তা আছে। আমি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, এ শুধু অনুভব করা যায়। তোমাকে বিয়ে করার ওটাও একটা কারণ ছিল কিন্তু এক মুহূর্ত আগে তুমি যখন আনমনে কি ভাবছিলে সেই ভাবটি তোমার মুখ থেকে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে অন্য একরকম ভাব তোমার মুখে ফুটে উঠেছিল।'

'কি রকম ভাব? আমায় সব খুলে বল।' আমি আগ্রহভরে বলে উঠলাম। একটু দ্বিধা করে সে বললো, 'তাহলে শোন। তুমি যখন খুব ছোট ছিলে তোমার বাবা নিশ্চয়ই তোমাকে কতগুলি নিষিদ্ধ বই পড়তে বারণ করে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। বাবার মত স্বামীও তো গুরুজন। আমার কথাও তাহলে শুনবে, কেমন? আর কোনদিন ওরকম কিছু ভাববে না যার জন্য তোমার সরল, সুন্দর দু'টি চোখের ভাষায় মানুষের বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার শূন্যতা ফুটে ওঠে। আর কোন প্রশ্ন না করে এখন খাওয়া শেষ কর।'

'তুমি আমাকে ঠিক ছ'বছরের মেয়ের মত মনে করে কথা বল কেন ?'

'তাহলে কিরকম ব্যবহার আশা কর ?'

'অন্যলোকেরা তাদের স্ত্রীর সাথে যেমন ব্যবহার করে, যেমন ভাবে কথা বলে।'

'ও। তার মানে সবদিক দিয়ে তোমাকে কোণঠাসা করে রাখবো এই তো ?'

'যাও, সবকিছুতেই তোমার ঠাট্টা।'

'না, ঠাট্টা করছি না। সত্যি বলছি।'

'তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি ঠাট্টা করছো। সত্যি আমি তোমার চোখে যেন একটি ছোট্ট বোকা মেয়ে।'

'হাঁ, একেবারে আজব দেশে এলিস, তাই না ? রিবন, কাঁটা, ক্লিপ সব কিনেছ তো ?'

'ভাল হবেনা বলছি। আমার সাজ দেখে তুমি কেমন চমকে যাবে দেখো !'

'তা হয়তো যাব। এখন আর একটিও কথা না বলে খাও তো লক্ষীমেয়ে। আমাকে অনেক চিঠি লিখতে হবে।' আমার জন্য অপেক্ষা না করে ফার্থকে লাইব্রেরিতে কফি দিতে বলে সে বেরিয়ে গেল। আমি নীরবে খেতে লাগলাম। খাওয়া শেষ হলে চিত্রশালায় ঢুকলাম, সেখানকার ছবিগুলি ভাল করে দেখবো বলে। ডানভারস আমাকে ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। শাদা পোশাক পরা তরুণীর ছবিখানি আমার বড় ভাল লাগে। এই ছবিখানি ম্যাক্সিমের প্রপিতামহের বোন ক্যারোলিন ডি উইণ্টারের ছবি। তিনি নাকি একজন বিখ্যাত হুইগ্ রাজনৈতিক নেতাকে বিয়ে করেছিলেন। অনেক বছর অবধি তিনি লণ্ডনের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী ছিলেন। তাঁর বিয়ের আগে এই ছবিখানি নাকি তখনকার এক বিখ্যাত শিল্পী এঁকেছিলেন। ডানভারসের কথামত

আমি ছবিখানি হুবহু নকল করে লণ্ডনে সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম আমার জন্য এরকম এক সেট্ শাদা পোশাক তৈরী করে, পাঠিয়ে দিতে। আমার মন থেকে যেন একটা দুর্বহ ভার নেমে গেল। উৎসবের দিন এখন যত তাড়াতাড়িই এগিয়ে আসুক না কেন আর আমি ভয় করি না।

দিন যতই এগিয়ে আসছে আমাদের উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে। ভেবেছিলাম ম্যাণ্ডারলেতে এখন প্রতি দিনই বুঝি বড় বড় পার্টির আয়োজন হবে, কত লোকজন আসবে যাবে! কিন্তু ম্যাক্সিম বললো, 'শুধু নাচের উৎসবই যথেষ্ট। আর কোন পার্টির আয়োজন করে দরকার নেই।' তার ভাবগতিক দেখে মনে হোল কেবলমাত্র আমার জন্যই সে এই উৎসবের আয়োজন করেছে। লোকজন, কলরব, হৈ হুল্লোড় সে একেবারেই পছন্দ করছে না। কিন্তু এর আগে ম্যাণ্ডারলেতে উৎসব তো লেগেই থাকতো শুনেছি। লণ্ডন থেকেও কত অতিথি এসে রাতের পর রাত কাটিয়েছে। তবে আজ কেন তার এই ভাবান্তর! আশ্চর্য!...

ম্যাণ্ডারলের হলঘর, ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর, অলিন্দ, আঙ্গিনা, সব নূতন করে সাজানো হোল। রাত দিন অগুণতি লোক কাজ করছে। ফার্থ, রবার্ট, ক্ল্যারিস, এলিস, অন্যান্য সবাই সব সময় ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে। ফ্র্যাঙ্ক রোজ আমাদের সঙ্গে থাচ্ছে, সব ব্যবস্থার তদারক করছে। সকল আয়োজনে ডানভারসের উপস্থিতি আর নির্দেশ দূর থেকেও অনুভব করতে পারছিলাম। আমাকে দেখলেই সে সরে যেত।

ঘন কুয়াশার আবরণে মুখ ঢেকে অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি ভোর হোল। বেলা এগারটার পর কুয়াশা কেটে গিয়ে নির্মেঘ নীলাকাশ সোনার রোদে ঝলমল করে হেসে উঠলো। মালিরা রাশি রাশি ফুলের তোড়া নিয়ে আসছে। রকমারি কত ফুলের মেলা বসেছে যেন! ডানভারস মালিদের নির্দেশ দিচ্ছে কোথায় কোন্ ফুলের তোড়া রাখতে হবে। নিজেও নিপুণভাবে ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখছে। সমস্ত

ঘরগুলি ফুলে ফুলে অপূর্ব শোভাময় হয়ে উঠলো। কোথায় কোন্ ফুল মানাবে, কোন্ জায়গাটা কোন্ রঙের ছোঁয়াচে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে ডানভারসের সে বিষয়ে অদ্ভুত রুচি বোধ!

সে দিন দুপুর বেলা আমি আর ম্যাক্সিম ফ্র্যাঙ্কের ঘরে তার সাথে খেলাম। বসে বসে হালকা কথা বলে কত কি ঠাট্টা কৌতুক করছি তিনজনে। কিন্তু মনে মনে তিনজনেই বোধহয় আরও কয়েক ঘণ্টা পরের ভাবনা ভাবছিলাম। বিয়ের দিন সকালবেলা আমার মনের অবস্থা যেমনটি হয়েছিল আজও ঠিক তেমনি এক অজানা আশঙ্কা আর উত্তেজনায় মনটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি কি সাজ করবো ওরা জানতে চাইলো। বললাম, 'বলবো না। তোমরা দু'জনেই আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।' ম্যাক্সিম বললো, 'ভাঁড়ের মত সাজ করবে নাকি? দেখো লোক হাসিও না যেন।'

'না। সে ভয় নেই।'

'আজব দেশে এলিসের সাজে তোমায় সুন্দর মানাতো!'

'অথবা জোয়ান অব আর্ক।' ফ্র্যাঙ্ক একটু লজ্জিত ভাবে বলে ফেললো। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'অবশ্য আপনি যে রকম সাজই করুন আমাদের তা ভাল লাগবে।'

'তোমাকে আর এত উৎসাহ দিতে হবে না ফ্র্যাঙ্ক। তোমাকেও বলছি, সাজ যদি কিম্ভুত-কিমাকার হয় তাহলে দেখো বী তোমাকে কি রকম ক্ষেপাবে। বী-র নিজের সাজ অবশ্য প্রতিবারই সবার হাসির খোরাক জুগিয়েছে।' ফ্র্যাঙ্ক আমার দিকে চেয়ে বললো, 'একি, আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে?'

'আর খেতে পারছি না।'

'এত ঘাবড়ে গেছ! আসছে কাল কিন্তু এমন সময় সব মিটে গেছে।' ম্যাক্সিম বললো। ফ্র্যাঙ্ক এবার বলে উঠলো, 'সময় তো ঘনিয়ে এলো।

আমাদের এখন যাওয়া দরকার।' হঠাৎ কেমন একটা ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে উঠলো। হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাসির বদলে বুঝি বা চোখে জলই এসে পড়ে। ম্যাক্সিমের দিকে চেয়ে ক্ষীণস্বরে বললাম, 'সবাইকে জানিয়ে দাও যেন কেউ না আসে। আমার বড় ভয় করছে।'

'একি হচ্ছে! ভয় কিসের? মনে সাহস রেখে হাসি মুখে আজকের দিনটা কাটিয়ে দাও। আসছে বছর আর এসব কিছু হবে না। ফ্র্যাঙ্ক, চল যাওয়া যাক।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের অনুসরণ করলাম। ফ্র্যাঙ্কের একলার অনাড়ম্বর কুটিরখানিই যেন এখন আমার একমাত্র শান্তির নিরাপদ আশ্রয়!

বাড়িতে পৌঁছে দেখি বাজনাদাররা এসে গেছে। ফার্থ গম্ভীর মুখে তাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল। বিকেল ফুরিয়ে সেই ক্ষণটি এগিয়ে আসছে আর আমার মন আরও বেশি করে অস্থির হয়ে উঠছে। একটু পরেই বিয়েট্রিসরা এসে পড়লো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিয়েট্রিস বলে উঠলো, 'বাঃ! চমৎকার! একেবারে আগের মতই তো সব ব্যবস্থা হয়েছে দেখছি।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, 'ফুলগুলো কী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে! তুমি সাজিয়েছ বুঝি?'

'না। মিসেস ডানভারস সব করেছে।'

'ও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বললো, 'তোমরা কে কি সাজ করছো? ম্যাক্সিম বুঝি এবারও কোন সাজ নিতে রাজী হওনি?'

'না।' ম্যাক্সিম হেসে জবাব দিল।

'আমার তো মনে হয় তুমি এতে যোগ দিলে আরও মজা হোত। অনেক বেশি আনন্দ পেতো সবাই।'

'ম্যাণ্ডারলের উৎসবে অফুরন্ত আনন্দের এতটুকুও অভাব কোনদিন দেখেছ নাকি?'

'না, তা অবশ্য নয়। তবুও বলবো গৃহস্বামীকেই প্রধান অংশ নেওয়া উচিত।'

'কেন, গৃহকর্ত্রী তো অংশ নিচ্ছেন। তাই কি যথেষ্ট নয়? কৃত্রিম সাজে নিজেকে বহুরূপী বানিয়ে অস্বোয়াস্তি ভোগ করবো কেন বল তো?' আমি গাইলসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি কি সাজ করবেন?'

'ভাবছি আরব দেশীয় ডাকাত সাজবো।'

'ওরে বাপরে!' ম্যাক্সিম চোখ বড় করে বলে উঠলো। বিয়েট্রিস বললো, 'হাঁ, ওকে ঐ সাজে চমৎকার মানাবে।' ফ্র্যাঙ্ক বিয়েট্রিসকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি পোশাক পরবেন মিসেস লেসি?'

'আমার সাজ খুব ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওঁর সাথে মানানসই করে যা হোক একটা পূব দেশীয় ছদ্মবেশ নিলেই চলবে।' এবার আমার দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি সাজবে?' ম্যাক্সিম হেসে বললো, 'ওকে জিজ্ঞেস কোর না। খুব গোপন কথা ওটা। আমাদের কাউকে বলেনি। হয়তো বা লণ্ডনেই পোশাকের অর্ডার দিয়ে বসে আছে।'

'তাই নাকি? ভীষণ ব্যাপার তো!'

আমি বললাম, 'না, এমন কিছু ব্যাপার নয়। শুধু তোমাদের সকলকে অবাক করে দেব বলে কাউকে বলি নি।'

'তুমি কি পরছো বললে না তো ফ্র্যাঙ্ক।' বিয়েট্রিসের এই প্রশ্নবাণে ফ্র্যাঙ্ক খুব সংকুচিত হয়ে পড়লো। সে লজ্জিত ভাবে উত্তর দিল, 'আমি খুব ব্যস্ত আছি বলে কিছু ভাবিনি। কাল রাতে পুরানো একটা ট্রাউজার আর ফুটবল জার্সি জোগাড় করেছি। এক চোখ কানা করে সেই পোশাক পরে জলদস্যু সাজবো ভাবছি।'

'আগে জানলে রোজারের কাছ থেকে তোমার জন্য ডাচম্যানের পোশাক নিয়ে আসতাম। তাতে তোমাকে ভারি চমৎকার মানাতো।'

'না, ওকে আমি ডাচম্যান সাজতে দিলে তো! কেউ তাহলে ওকে আর মানবেই না। জলদস্যু হলে তবু বা একটু ভয় করবে, কি বল?'

'উহু, ফ্র্যাঙ্ককে জল দস্যুর সাজে একদম মানাবে না।'

বেচারা ফ্র্যাঙ্ক। সবাই তাকে নিয়ে মজা করে। গাইলস এবার বললেন, 'মুখে রঙ-চঙ মাখতে কতক্ষণ সময় লাগবে বল তো?' বিয়েট্রিস বললো, 'তা দু'ঘণ্টা তো লাগবেই। তুমি এখন থেকেই সাজতে আরম্ভ কর গিয়ে। আবার এই উৎসবের আয়োজন করেছ বলে তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছি ম্যাক্সিম।'

'যদি ধন্যবাদ জানাতে হয় তো ওকে জানাতে পার, আমাকে নয়।' ম্যাক্সিম একটু হেসে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'না, না, আমি কিছু করিনি। এজন্য একমাত্র লেডি ক্রোয়ানই দায়ী।'

'তোমার সাজ দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছি কিন্তু।'

'দেখবার মত তেমন কিছু বিচিত্র নয়।'

ফ্র্যাঙ্ক এবার বললো, 'মিসেস ডি উইণ্টার বলেন ওঁকে নাকি আমরা চিনতেই পারবো না।' সহসা আমার মনটা খুশিতে ভরে গেল। এত বড় উৎসবের আমিই প্রধান কেন্দ্র, আমিই তো গৃহকর্ত্রী একথা ভাবতে কী ভাল লাগে! আমার সম্মানে এত আয়োজন, আমার দিকেই সকলে আগ্রহভরে তাকাচ্ছে, আমার সাজ সম্বন্ধে কত জল্পনা-কল্পনা ওদের।

সাজ করবার জন্য ওপরে শোবার ঘরে যেতে যেতে আবার নূতন করে অনুভব করলাম ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি ঘর কী অপূর্ব ভাবে সাজানো হয়েছে! ফুল আর আলোর সমারোহে চারদিক সুরভিত, ইন্দ্রপুরীর মত মায়াময়। চিত্রশালার গ্যালারিতে বাজনাদারেরা তাদের যন্ত্র নিয়ে বাজাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। একটা পরম মুহূর্তের জন্য সবাই কী এক

উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছে। ম্যাণ্ডারলের আকাশে বাতাসে আজ আনন্দোৎসবের শিহরণ। এখানকার শান্ত-নিথর পরিবেশ এক নিমেষে কিসের ছোঁয়ায় প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতীত দিনের ম্যাণ্ডারলে কি আজকের মতই জীবন-মুখর থাকতো সব সময়! ম্যাণ্ডারলের যুগ-যুগান্তের ঐতিহ্যের সাথে বুঝি এক হয়ে মিশে আছে উচ্ছল প্রাণ-প্রাচুর্যের দীপ্তি।......

শোবার ঘরে ঢুকে দেখি ক্ল্যারিস আমার জন্য অপেক্ষা করছে। উত্তেজনায় চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। আমি তাকে দরজায় চাবি লাগাতে বললাম। আমরা দু'জন যেন একটা ষড়যন্ত্রের চক্রান্তকারী এমনই সন্তর্পণে চলাফেরা করছি, চুপি চুপি কথা বলছি। ক্ল্যারিস আমাকে পোশাকটি পরতে সাহায্য করতে লাগলো। পরা হয়ে গেলে পেছনে সরে আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললো, 'কী সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে!' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমিও চমকে উঠলাম। এ কে! এতো আমি নই! আমার মত সাধারণ একটি মেয়ের চেহারা যে এভাবে বদলে গিয়ে এমন অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে এযেন চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আয়নার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি। আমার পেছনে ক্ল্যারিসের মুখখানিও দেখতে পাচ্ছি। সে অবাক নয়নে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমার এই বিচিত্র রূপান্তর তাকেও বুঝি নির্বাক করে দিয়েছে।

'মিঃ ডি উইণ্টার আমাকে চিনতে পারবেন তো?' নিজেকে সহসা খুব গর্বিত মনে হোল। এমন সময় কে কড়া নাড়লো।

'কে? এখন ভেতরে এসো না।'

'আমি বিয়েট্রিস। আর কত দেরি? তোমাকে দেখতে এসেছি।'

'না, না, এসো না লক্ষ্মীটি। তোমরা নিচে অপেক্ষা কর। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।'

'বেশি দেরি কোর না। আমরা সবাই অধীর হয়ে আছি তোমাকে দেখবো বলে।'

আমি আবার আয়নার দিকে দেখছি। আয়নার প্রতিবিম্বকে চিনতে পারছি না। অন্য কেউ যেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

'দোর খোল ক্ল্যারিস। এবার আমি নিচে যাব। দৌড়ে দেখে এসো কেউ আবার পথে দাঁড়িয়ে নেই তো!' মেঝেয় লুটিয়ে পড়া শুভ্র পোশাকের এক প্রান্ত হাতে ধরে খুব সন্তর্পণে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ক্ল্যারিস ছুটে এসে বললো, 'তাঁরা সবাই আপনার জন্য হলঘরে অপেক্ষা করছেন।' সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দেখলাম সত্যি সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। শাদা জমকালো পোশাক পরে গাইলস খুব হাসছে কি একটা কথা বলে। তার পোশাকের একদিকে একটা খাপে ছুরি ঝকমক করছে। বিয়েট্রিস সবুজ রঙের অদ্ভুত একটা পোশাক পরেছে, মুখে মুখোস। বেচারা ফ্র্যাঙ্ককে জলদস্যুর সাজে একটুও মানাচ্ছে না। একমাত্র ম্যাক্সিমই স্বাভাবিক সান্ধ্য পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম ম্যাক্সিম বলছে, 'এতক্ষণ ও কি করছে বলতো? ক'টা বেজেছে ফ্র্যাঙ্ক? এখনই তো সবাই এসে পড়বে।'

বেহালা বাজছে। উজ্জ্বল আলোর ছটায় ক্যারোলিন ডি উইণ্টারের আলেখ্যখানি অদ্ভুত প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে! বেহালাবাদকের দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললাম, 'ড্রামারকে বলুন মিস ক্যারোলিন ডি উইণ্টার আসছে বলে ঘোষণা করতে।' উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ড্রাম বেজে উঠতেই চমকে তাকিয়ে দেখি সবাই ড্রামের শব্দে ভীষণ অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। ড্রামার জোরে বলে উঠলো, 'ক্যারোলিন ডি উইণ্টার।' আমি তখনি সিঁড়ির প্রথম ধাপে সরে এসে টুপি হাতে একটু হেসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম ঠিক ছবিখানির মত দাঁড়াবার ভঙ্গি করে। ভেবেছিলাম আমাকে দেখে সবাই

হাততালি দিয়ে বিস্ময় আর আনন্দ প্রকাশ করবে। কিন্তু কেউ হাততালি দিল না, এতটুকুও নড়লো না। তারা সবাই আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে নিশ্চল মূর্তির মত নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে। শুধু বিয়েট্রিস অস্ফুটস্বরে কি বলে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। ম্যাক্সিম স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। তার মুখখানি ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেছে। ফ্র্যাঙ্ক তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কি যেন বলতে গেল। কিন্তু ম্যাক্সিম তাকে ঠেলে দিল। আমি তখন কয়েক ধাপ নেমে এসেছি। কিন্তু এবার বুঝতে পারলাম কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ম্যাক্সিম কেন ওভাবে তাকাচ্ছে! তারা সবাই কেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এসবের অর্থ কি? ম্যাক্সিম সিঁড়ির দিকে একটু এগিয়ে এসে আমার মুখের দিকে তেমনই পলকহীন তাকিয়ে থেকে বললো, 'একি করলে তুমি?' তার মুখ কঠিন, বিবর্ণ। চোখে ক্রোধের দীপ্তি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে, গলার স্বর শুনে আমার শরীর মন ভয়ে দুর্ভাবনায় অবশ হয়ে আসছে। তবুও অনেক কষ্টে ক্ষীণস্বরে বললাম, 'চিত্রশালার ছবি দেখে এই সাজ করেছি।' অসহ্য নীরবতা নেমে এলো। আমরা পরস্পর শুধু তাকিয়ে আছি। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আবারও বললাম, 'কি হয়েছে? কি করেছি আমি? কেউ কিছু বলছো না কেন?' কিছুক্ষণ পর ম্যাক্সিম যখন কথা বললো আমি তার স্বর চিনতে পারলাম না। শান্ত, কঠিন, নিরুত্তাপ স্বরে সে বলছে, 'ওপরে গিয়ে পোশাক বদলে এসো। যে কোন সাধারণ পোশাক পরলেই চলবে।' আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। তার সমস্ত চেহারার মধ্যে শুধু চোখ দু'টিতেই যেন জীবনের স্পন্দন ছিল!

'এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছ? কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না?' কঠিন আদেশের সুরে সে বললো। আমি ফিরে দাঁড়িয়ে বারান্দা দিয়ে একরকম

ছুটেই চললাম শোবার ঘরের দিকে। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। অন্ধের মত চলেছি। হঠাৎ আমার দৃষ্টি ধাক্কা খেল পশ্চিম মহলে যাবার প্রথম দরজাটির সামনে। কে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখি ডানভারস! তার মুখের সেই বিচিত্র ভাব জীবনে ভুলবো না। দুষ্ট অভিষ্ট সিদ্ধ করে শয়তানির বিজয় গর্বিত বিদ্রূপভরা হাসির ছটায় তার মুখখানি কী বীভৎস, বিকৃত দেখাচ্ছে! আমি পাগলের মত ছুটে চলেছি আমার শোবার ঘরের দিকে।

॥ ১৭ ॥

ক্ল্যারিস আমার জন্য শোবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। তার পাংশু মুখখানি কাগজের মত শাদা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে সে কেঁদে ফেললো। আমি কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি পোশাক খুলতে লাগলাম। সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে সাহায্য করছে। আমি বললাম 'কাঁদছো কেন? কেঁদো না আর।' কিন্তু তার দু'গাল বেয়ে জলের ধারা টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে। হাত দু'টো থরথর করে কাঁপছে। একটু শান্ত হয়ে সে বললো, 'আপনি এবার কোন্ পোশাকটা পরবেন?'

'কি জানি। আমি এখন একলা থাকতে চাই ক্ল্যারিস। তুমি কিছু ভেবোনা। আনন্দ কর গিয়ে। আর শোন, কাউকে বোল না এসব কথা।'

'না, বলবো না।' আবার তার কান্না ঝরে পড়লো।

'তোমার এরকম চোখ মুখ দেখলে সবাই কি ভাববে বলতো যাও, ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে ফেল। কান্নার কি হয়েছে?'

কে যেন কড়া নাড়লো। ক্ল্যারিস শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

'কে?' দরজা খুলে বিয়েট্রিস ঘরে ঢুকে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ক্ল্যারিস এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সহসা বড় অবসন্ন মনে হোল নিজেকে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। বিয়েট্রিসের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর বসে পড়লাম। বিয়েট্রিস আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। একটু পরে বললো, 'তোমাকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? অসুস্থ বোধ করছো?'

'না, কিছু হয়নি তো। আলোর জন্য অমন দেখাচ্ছে।'

'কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাক। দাঁড়াও, এক গ্লাস জল এনে দিচ্ছি।' সে উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে আমার মুখের সামনে ধরলো। তাকে খুসি করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলটা আমাকে খেতে হোল। একটু চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে বললো, 'তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তুমি কিছু জানতে না? কেমন করেই বা জানবে?'

'কি জানবো? কি বলছো তুমি?'

'গেলবারের উৎসবে রেবেকাও এই সাজ করেছিল। আজ তোমাকে ঐ বেশে দেখে চমকে উঠে আমি ভেবেছিলাম'—কথাটা শেষ না করে সে আমার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'তোমার তো সে সব জানবার কথা নয়।'

'না, না, আমার জানা উচিত ছিল, জানা উচিত ছিল।'

'না, তোমার জানবার কোন কারণ নেই। সেদিক থেকে তোমার এতটুকুও দোষ নেই। তবে এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমরা সবাই খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম সে কথা সত্যি। এরকম অদ্ভুত যোগাযোগ যে

হতে পারে আমরা কেউ স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি। আর ম্যাক্সিম—'

'থামলে কেন? বল কি বলছিলে।'

'ম্যাক্সিম ভেবেছিল তুমি বুঝি ইচ্ছে করে সব জেনে শুনে একাজ করেছ তাকে অবাক করে দেবে বলে। আমি তাকে বলেছি তুমি জেনে শুনে একাজ করতেই পারনা। এটা নেহাতই একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।'

'কিন্তু আমার বোঝা উচিত ছিল। আমারই দোষ।'

'না, না, এসব কি ভাবছো তুমি! তাকে বুঝিয়ে বললে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওদিককার ব্যবস্থা সব ঠিক করে এসেছি। ফ্র্যাঙ্ক আর গাইলস তাদের বলবে তোমার সাজ পছন্দ হয়নি বলে তোমার মন খারাপ হয়েছে।' আমি কিছু বললাম না। কোলের মধ্যে দু'হাত রেখে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছি। পোশাকের আলমারির কাছে গিয়ে সে বললো, 'কি পরবে?...এই নীল পোশাকটা ভারি সুন্দর। এটাই পর। তাড়াতাড়ি পরে নাও। সবাই এসে গেছে।'

'না। আমি যাব না।'

পোশাকটা হাতে নিয়ে বিয়েট্রিস আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'তোমাকে যেতেই হবে। আমার কথা রাখো লক্ষ্মী বোন আমার।'

'না, আমি যেতে পারবোনা। যা ঘটে গেল তারপর আমার আর যাওয়া চলে না। তাদের আমি এ মুখ দেখাতে পারবো না।'

'কিন্তু কেউ কিছু জানে না, জানতেও পারবে না কোনদিন। আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না বিশ্বাস কর।'

'আমাকে ক্ষমা কর। আমি যেতে পারবোনা।'

'সবাই এসে গেছে। এখন তুমি না গেলে কি ভাববে তারা? কি বলবো আমি?'

'আমি না গেলে কোন ক্ষতি হবে না। তারা কেউ আমাকে চেনে না।'

'ম্যাক্সিমের কথাও কি ভাবছো না? তার কথা ভেবেই না হয় মনকে শক্ত কর। চল।'

'না।'

আবার কড়া নেড়ে উঠলো। বিয়েট্রিস বললো, 'কে?' তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো। গাইলস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

'সকলে এসে পড়েছে। ম্যাক্সিম জানতে পাঠিয়েছে তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন!'

'বল গিয়ে ওর শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু পরে যাবে।'

'আচ্ছা।' আমার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বিয়েট্রিস এবার আমার কাছে এসে বললো, 'তোমাকে একা ফেলে যাই কি করে?'

'আমার জন্য ভেবোনা। তুমি যাও।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তার মুখখানি দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠছে লক্ষ্য করলাম। বিয়েট্রিস বুঝতে পেরেছে আমি কত দুর্বল। সে অন্য প্রকৃতির মেয়ে। আমার মত অবস্থায় পড়লে হয়তো আবার পোশাক বদলে সহজ, স্বাভাবিকভাবে তখনই নিচে নেমে যেত। আমি তো শত চেষ্টা করেও, তা পারলাম না। আভিজাত্য, বংশমর্যাদা, মনের দৃঢ়তা, সমস্ত দিক দিয়েই তার সাথে আমার আকাশ পাতাল ব্যবধান।

ম্যাক্সিমের মড়ার মত শাদা মুখে চোখ দু'টি শুধু জ্বল জ্বল করছে। তার পেছনে গাইলস, বিয়েট্রিস, ফ্র্যাঙ্ক পুতুলের মত নিস্পলক দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ আগেকার সেই অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

না, আর বসে থাকতে পারছি না। বিছানা থেকে উঠে জানলার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এদিক ওদিক আনাগোনা করছে। আর একটু পরে দিনের আলো নিভে এলে গোলাপ বাগানের সব আলো একসাথে জ্বলে উঠবে। বাগানে কতলোক হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে, হাসছে, গল্প করছে। বাতাসের সাথে সাথে গোলাপের ঘন সুবাস আর তাদের কত কথার টুকরো ভেসে আসছে। কে যেন বলছে, 'ঠিক আগেকার মতই সব ব্যবস্থা হয়েছে, তাই না ?'

আরেকজন কে বললো, 'নূতন মিসেস ডি উইণ্টার কিন্তু আমাদের মিসেস ডি উইণ্টারের মত নন। ইনি একেবারে অন্যরকম।'

'আজ এসে অবধি তাঁকে তো একবারও দেখলাম না! গেলেন কোথায় ?'

'কি জানি। আমিও তাঁকে দেখিনি।'

'আমাদের মিসেস ডি উইণ্টার কিন্তু উৎসবের দিনে সব সময় সমস্ত জায়গায় উপস্থিত থাকতেন, কি বল ?'

'হাঁ।'

'শুনলাম নূতন মিসেস ডি উইণ্টার নাকি আজ উৎসবে উপস্থিত হবেন না!'

'সে কি!'

'হাঁ। তাঁর সাজ পছন্দ হয়নি তাই তিনি নামবেন না।' অনেক-গুলি স্বরের খিলখিল হাসির তরঙ্গে বাতাস ভারি হয়ে উঠলো।

'এমন কথা কে কবে শুনেছে! এযে মিঃ ডি উইণ্টারের অপমান!'

'সত্যি, তিনি কেমন করে তাঁকে সহ্য করছেন!'

'আরও শুনলাম এ বিয়ে সুখের হয়নি।'

'তাই নাকি ?'

'হাঁ, সবাই তাই বলে। মিঃ ডি উইণ্টার নাকি এখন বুঝতে পারছেন তিনি কী মারাত্মক ভুল করেছেন। নূতন মিসেস ডি উইণ্টার তো একেবারে সাধারণ মেয়ে।'

'হাঁ, বংশ মর্যাদা বলতেও কিছু নেই। ফ্রান্সে কোথায় কার গভর্নেস না ঐ রকম একটা কিছু ছিলেন।'

'ওমা, সে কি কথা!'

'হাঁ। অথচ রেবেকার কথা ভাবলে'......

তারা কথা বলতে বলতে অন্য দিকে চলে গেল। আমি সেদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছি।

সন্ধ্যার আকাশ ধূসর হয়ে এসেছে। আমার মাথার ওপর শুকতারা জলজ্বল করছে। আনমনে কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। সম্বিত ফিরে আসতেই জানালা থেকে সরে এলাম। মেঝের ওপর সেই শাদা পোশাকটি লুটাচ্ছে। সেটা তুলে আলমারিতে রেখে দিলাম। তারপর বিয়েট্রিস যে নীল পোশাকটি বের করেছিল যন্ত্রচালিতের মত সেটা পরে মুখের প্রসাধন ধুয়ে ফেলে সাধারণ ভাবে চুল আঁচড়ে বারান্দা দিয়ে চলতে লাগলাম। চারধার একেবারে চুপচাপ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে খাবার ঘরের দিক থেকে কথার গুঞ্জন শুনতে পেলাম। তাহলে এখনও তাদের খাওয়া শেষ হয় নি! আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্যারোলিন ডি উইণ্টারের ছবিখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ছবিখানি যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। সহসা আমার মনে পড়লো বিসপ-পত্নীর সেদিনকার সেই কথা, 'মেঘ বরণ একরাশ চুল আর শুভ্র সুন্দর পোশাকে তাঁর সেই রূপ আমি কোনদিন ভুলবো না।' একথা কেন আমার আগে মনে হয় নি! আনমনে সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠে আসতে লাগলাম। বারান্দায় এসে সহসা আমার চোখ পড়লো পশ্চিম মহলের দরজার দিকে।

বাতাসের ঝাপটায় দরজাটি খুলে গেছে। একটু এগিয়ে দেখি এদিকটা একেবারে অন্ধকার। দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচ খুঁজে পেলাম না। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে অনুভব করলাম পশ্চিম মহলের খোলা জানালার পর্দাগুলি পত পত করে উড়ছে। সন্ধ্যার আলো আঁধারী ঘরের মেঝেয় কেমন অদ্ভুত সব ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের একটানা অশ্রান্ত কল্লোল আমার কানে ভেসে আসছে, জলো হাওয়ায় সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবুও সেখানে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সাগরের একটানা সুর কারও গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতন মনে হোল। আমার মনের দীর্ঘশ্বাসও বুঝি ঐ অশান্ত সাগরের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেছে। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ কি মনে হতে দৌড়ে গিয়ে পশ্চিম মহলের দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচে নামতে লাগলাম। এবার তাদের কথা শুনতে পাচ্ছি। খাবার ঘর থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। তাদের উচ্ছল হাসি, কলরবে চারদিক মুখর হয়ে উঠেছে। আমি সন্তর্পণে নিচে নেমে চলেছি উৎসবপ্রাঙ্গণে তাদের মুখোমুখি হবো বলে।

আমার জীবনের সেই প্রথম ও শেষ উৎসবের স্মৃতি মনে জাগলে আজও চোখে ভেসে ওঠে কত ছবি, গোধূলির আলো-আঁধারী পটভূমিকায় যেন কতগুলি অস্পষ্ট রেখা! নাচ, গান, বাজনা, আলো, বাজি, আনন্দ, কোলাহল, হাসি, কলরবের অফুরান কত স্মৃতির মালিকা আজও থেকে থেকে আমার মনকে দোলা দিয়ে যায়। যাদের কোন দিন দেখিনি, চিনি না, তাদেরই অস্পষ্ট মুখচ্ছবি সাগরের বুকে অগুণতি ঢেউয়ের মত আমার মনের মুকুরেও ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। আজও বেশ অনুভব করতে পারি সেদিন আমার মুখের কৃত্রিম হাসি আমার চোখের বোবা ব্যথার সাথে কতই না বেমানান ছিল!

আজও মনে পড়ছে বিয়েট্রিস তার সঙ্গীর হাত ধরে নাচতে নাচতে কেমন করে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে। মনে পড়ছে পাইলসের অনুরোধে তাঁর সাথে আমাকেও একবার নাচতে হয়েছিল। এখনও যেন আমার কানে বাজছে তাঁর কথা। সান্ত্বনা দেবার ছলে বলেছিলেন, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!' ফ্র্যাঙ্ক এক প্লেট খাবার এনে আমাকে তা খাবার জন্য কতবার অনুরোধ জানিয়েছিল! তার কালো চোখ দু'টি কি এক দুশ্চিন্তার নিবিড় ছায়ায় আরও গভীর হয়ে উঠেছে। তার কপালে কয়েকটি রেখার কুঞ্চন, আগে যা কোন দিন দেখিনি। তাকে বড় গম্ভীর, চিন্তিত দেখাচ্ছিল। যন্ত্র চালিতের মত সে আমন্ত্রিতদের সুখ সুবিধা দেখবার জন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে এতটুকুও আনন্দের চিহ্ন নেই, নিছক যন্ত্রের মত সে আপন দায়িত্ব আর কর্তব্য করে যাচ্ছে। তার শুকনো মুখখানির দিকে চেয়ে আমি যেন আমার নিজের দুঃখ অপমানও ক্ষণেকের জন্য ভুলে গেলাম। সেদিনকার আনন্দোৎ-সবের রেশটুকু আজও আমার মনে একটা দুঃস্বপ্নের কুহেলীর মত জেগে আছে।

একভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলাম। কিন্তু আমার কোন অনুভূতি ছিল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে আমি যেন পাষাণ প্রতিমায় পরিণত হয়েছি। আমার পাশে যে নিশ্চল মূর্তিটি দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যেও প্রাণের এতটুকু স্পন্দন ছিল না। কৃত্রিম হাসির মুখোস পরে সে প্রাণহীন অভিনয় করে যাচ্ছে। সে তো আমার ম্যাক্সিম নয়, একেবারে অন্য কেউ! তার চোখের দৃষ্টিতে আমার প্রিয়তমের পরিচিত দৃষ্টিকে খুঁজে পেলাম না। একে আমি চিনি না, জানি না। আমি যাকে ভালবাসি আমার সেই ম্যাক্সিম কোথায় গেছে হারিয়ে! তার শূন্য দৃষ্টি মাঝে মাঝে আমার মুখের

ওপরেও এসে পড়ছে কিন্তু সে দৃষ্টি যেন বহু দূরের, কী এক অজানা ব্যথায় বিহ্বল, উন্মনা! মনে হোল তার মত এমন একলা মানুষ জগতে আর একটিও নেই! আমার সাথে একটি কথাও সে বলেনি, আমার হাতখানি একবারের জন্যও স্পর্শ করেনি। অতিথি অভ্যাগতদের সাথে সে হাসি মুখে কথা বলছে। তার এই নিখুঁত অভিনয় আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারছে না। যাদের আমি কোনদিন দেখিনি, চিনি না, তাদেরই জন্য আমাকে মনের দুঃসহ জ্বালা নিয়েও মুখে হাসির ছলনা মাখাতে হয়েছে! ফ্র্যাঙ্ক আর একবার লেমোনেড নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াতেই ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'না। আমি খাব না।'

'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, একটু বসবেন চলুন ওদিকটায়।'

'না।'

'একটু কিছু মুখে দিন।'

'না, না, আমার ক্ষিদে নেই।'

সবাই নাচছে, কত রকমের সুর তরঙ্গে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠেছে। অতিথি অভ্যাগত সবার মুখে পরিতৃপ্তির আনন্দ। তাদের নাচের ভঙ্গিমায় উচ্ছল প্রাণ প্রাচুর্যের উন্মাদনা। বিচিত্র কত সাজ পোশাকের প্রদর্শনী! কে একজন আমার পাশে এসে অন্তরঙ্গের মত প্রশ্ন করলো, 'আপনারা আমাদের ওখানে কবে আসছেন?'

'যাব একদিন।'

'আজ আমরা সবাই খুব আনন্দ পেলাম। আপনাকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'না, না, তার দরকার নেই। আপনারা আনন্দ পেলেই আমাদের আনন্দ।'

'আপনাকে নাকি ভুল পোশাক পাঠিয়েছে?'

'হাঁ।'

'আপনাকে এই নীল পোশাকেও কিন্তু সুন্দর মানিয়েছে। আচ্ছা, ভুলবেন না যেন আপনারা দু'জনে আমাদের প্রাসাদে একদিন আসছেন।'

'হাঁ, যাব।'

এখন ক'টা বেজেছে? সময় যে আর চলছে না। এ যেন অনন্ত রাত্রি! একই সুরে বাজনা বাজছে, বার বার একই মুখ ফিরে ফিরে আমার সামনে আসছে যাচ্ছে। একবার বিয়েট্রিস কাছে এসে কানে কানে বললো, 'একটু বোস। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তোমাকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'না, আমি ভাল আছি।' আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে আছি। গাইলসের কথায় আমার চেতনা ফিরে এলো।

'বাজি দেখবে এসো।' তাঁর সাথে অলিন্দে বাজি পোড়ানো দেখতে গেলাম। অনেকেই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। এককোণে একটি ছোট ছেলের হাত ধরে ক্ল্যারিসও হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেও সে কেঁদেছিল, সেই তিক্ত স্মৃতি এখন নিঃশেষে ভুলে গেছে।

আমি পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে অন্ধকারের বুকে আলোর ঝিকিমিকি দেখছি। কত রকমের বিচিত্র বাজি অন্ধকার আকাশের বুক চিড়ে আলোর ঝিলিক তুলে চোখ ধাঁধিয়ে আবার তখনই শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। রকেট বাজিগুলি তীরের মত তীব্র গতিতে আকাশের বুকে গিয়ে বিঁধছে আর চারদিক আলোয় আলোয় ঝলমল হয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে বাজি পোড়ানো চললো।

তারপর কখন জানিনা আমরা সবাই আবার ড্রয়িংরুমে ফিরে এলাম। বাইরে অনেক গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবার বুঝি উৎসব শেষে সবার যাবার পালা। কে একজন আমার পাশে এসে বললো, 'আজকের উৎসবের তুলনা হয় না। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'এই উৎসব এক বছর বন্ধ ছিল বলে আমাদের মন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

আবার নূতন সুরে বাজনা বেজে উঠলো। সবাই হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে নাচতে কি একটা গান গাইছে। উৎসব শেষ হয়ে যাবার আগে শেষ বারের মত তারা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে! উঃ! শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চায় না। আবার কে একজন এসে আমার হাত ধরে বললো, 'আসছে মাসের চোদ্দই আপনারা আমাদের ওখানে আসছেন ভুলবেন না যেন।'

'তাই নাকি?'

'হাঁ। মিসেস লেসি আমাদের কথা দিয়েছেন।'

'ও, আচ্ছা।'

বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য সকলে একে অন্যের পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাক্সিম তখন হলঘরের অন্য দিকে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে আবার আমার বিবর্ণ মুখে একটু হাসির প্রলেপ বুলিয়ে নিলাম।

'অনেক দিন পর আজকের সন্ধ্যা বড় আনন্দে কাটলো।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'এই উৎসবটির প্রবর্তন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' কোন উত্তর না দিয়ে বিনীতভাবে একটু হাসলাম।

'আজকে যে আনন্দ পেলাম তার তুলনা হয় না।

'সত্যি?'

ওঃ, মানুষের ভাষায় আর কি কোন শব্দ বা কথা নেই! একই কথা বারবার আমার মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে আসছে। কলের পুতুলের মত প্রত্যেককে আমি মাথা নিচু করে বিদায় অভিবাদন

জানাচ্ছি। ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে দেখি তাকে ঘিড়েও অসংখ্য লোকের ভিড়। এ যে অফুরন্ত জনস্রোত, শেষ হবে কখন কে জানে! কতক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি এবার একটু একটু করে হলঘর খালি হতে আরম্ভ করেছে। সবাই বের হয়ে গেলে ম্যাক্সিমও ঘর থেকে বেরিয়ে বোধ হয় তাদের গাড়িতে উঠিয়ে দিতে এগিয়ে গেল। বিয়েট্রিস এবার আমার কাছে এসে বললো, 'ওঃ, খুব ক্লান্ত লাগছে এখন। যাক উৎসবটা ভালয় ভালয় শেষ হোল তাহলে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছো। এখন গিয়ে শুয়ে পড়, কেমন? সামান্য কিছু খেয়ে নাও।'

'না। খেতে পারবো না।'

'তাহলে এখনি গিয়ে শুয়ে পড়। কাল অনেক বেলা অবধি ঘুমোবে। কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। আর ভেবো না।'

'আচ্ছা।'

'কোন চিন্তা না করে গভীরভাবে ঘুমাও গিয়ে।' আমাকে তার একান্ত কাছে টেনে নিয়ে আমার কপালে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে সে ওদিকে চলে গেল। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে শোবার ঘরে ঢুকলাম।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার সারা গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। ঊষার আধ-আধ আলোর রেখা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আসতে সুরু করেছে। জানালার পর্দাগুলি টেনে দিয়ে ঘর আঁধার করে দিলাম। কিন্তু রাত্রি শেষের অস্ফুট আলোর ছিঁটে ফোঁটা জানালার সার্সি দিয়ে ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাড়াতাড়ি পোশাকটা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পা দু'টো অবশ হয়ে আসছে, শিরদাঁড়া অসহ্য ব্যথায় কন্‌কন্ করছে। সোজা হয়ে শুয়ে গায়ে চাদর টেনে চোখ বুজে রইলাম। ক্লান্ত দেহের সাথে তাল রেখে আমার অবসন্ন মনটাও যদি ঘুমিয়ে পড়তে পারতো! কিন্তু কোথায়

ঘুম! চোখ বুজে আছি তবুও চোখের সামনে ভেসে উঠছে গত কয়েক ঘণ্টার ছবি একের পর এক! নাচ গানের সুরেলা রেশটুকুও বারবার কানে বাজছে, হাজার হাজার মুখ চোখের সামনে ভিড় করে আসছে আর যাচ্ছে। চোখ দু'টোকে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অভিশপ্ত উৎসবের সমস্ত দৃশ্যপট তেমনই চোখের ওপর ভাসতে লাগলো। হঠাৎ মনে পড়লো ম্যাক্সিম তো এখনও শুতে আসেনি! আর কখন আসবে? আমার পাশে তার শুভ্র ফেন-নিভ শয্যা তেমনই কঠিন, শীতল!

ভোরের আলোয় এখনই ঘর যাবে ছেয়ে। আলো আঁধারী ছায়ার মায়া এখনই যাবে টুটে! পাখিদের মিষ্টি মধুর কলতানে ম্যাণ্ডারলের আকাশ বাতাস ভরে উঠবে। সূর্যের হলদে আলোর ঝিলিমিলি শুভ্র পর্দার বুকে বুকে কত বিচিত্র আলপনা আঁকবে আর একটু পরেই! আমার বিছানার পাশে ছোট ঘড়িটি টিকটিক করে সময় জানাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ঘড়ির কাঁটা কেমন করে পলে পলে এক একটি প্রহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কালরাত্রির অবসানে আর একটি দিনের সুরু হোল ম্যাণ্ডারলের জীবনে। কিন্তু ম্যাক্সিম এখনও কেন এলো না! বিনিদ্র প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে ছটফট করতে করতে ব্যাকুল হয়ে কেবলই ভাবছিলাম সে এলো না কেন?

॥ ১৮ ॥

চোখের ওপর হাত দিয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো জানি না। যখন জাগলাম তখন বেলা এগারটা বেজে গেছে। পাশের বিছানা সমস্ত রাত্রির অবহেলায় তেমনি শূন্য পড়ে আছে। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম দেখে বুঝলাম ক্ল্যারিস এসে ঘর গুছিয়ে আমার জন্য চা রেখে চলে গেছে।

দেওয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিছানাতেই চুপচাপ বসে রইলাম। শরীর ও মন দুইই বিকল মনে হচ্ছে। ম্যাক্সিমের শূন্য বিছানার দিকে চেয়ে আবার নূতন করে মনে পড়লো কালকের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি! বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় ছটফট করে উঠলো। ক্ল্যারিস চা দিতে এসে শূন্য বিছানা দেখে কি ভাবলো কে জানে! তারা সবাই মিলে এবিষয়ে না জানি কত রসাল আলোচনা করবে! আমি কত দুর্বল সে সত্যটাই আবার মনে প্রাণে অনুভব করলাম। লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনা, অপবাদ, নিন্দা সহ্য করতে পারবো না বলেই কাল শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে না থেকে সেই অবাঞ্ছিত উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমার ভীরু শঙ্কিত মনের লজ্জা, অপমান ঢাকবার জন্যই আমি ঐ পথ বেছে নিয়েছিলাম। ম্যাক্সিমের জন্য, বিয়েট্রিসের জন্য, ম্যাণ্ডারলের মান রাখবার জন্য তো আমি উৎসবে যোগ দিইনি! সবাই ভাববে আমি তার সাথে ঝগড়া করেছি, আমাদের দু'জনের মধ্যে ভালবাসা নেই, এই ভাবনা আমি সইতে পারিনি বলেই আপন মনের অভিমান অপমান ভুলে গিয়ে সবার মাঝে হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়াতে এতটুকু দ্বিধা করিনি! আমি না গেলে তারা বলাবলি করতো, 'তাদের মনের মিল হয়নি। তারা সুখী হয়নি।' আমার মত অতি

সাধারণ, নগণ্য মেয়ের তুচ্ছ অহংকার বাঁচাবার জন্যই আমি অতবড় দুঃসাহসের কাজ করতে পেরেছি।

ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলাম অন্য কেউ যদি জানতে না পারে তাহলে আমি আর ম্যাক্সিম ম্যাণ্ডারলের দুই প্রান্তে দু'জন চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়েও বুঝি থাকতে পারবো! আমাকে যদি সে ভালবাসতে না পারে, আমার অতবড় ভাগ্য বিপর্যয়ও বোধহয় আমি সইতে পারবো যদি আমরা দু'জন ছাড়া জগতের আর কেউ একথা না জানতে পায়। আমার নিজের দীনতায়, আপন বেদনাতেও আমি অটল, অনড় থাকতে পারবো কিন্তু স্বামী আমাকে ভালবাসে না অন্যের মুখে মুখে সেই কথার আলোচনা শোনার মত এতবড় লাঞ্ছনা, অপমান মরে গেলেও বুঝি সহ্য করতে পারবো না! কিন্তু আজ আর আমার মনে এতটুকুও মোহের আবরণ নেই। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছি আমাদের বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে! আমার ভাগ্য-দেবতার একি নিষ্ঠুর পরিহাস! আমাদের কথা কাল ওরা যা বলছিল তার প্রতিটি কথা সত্য, বড় কঠিন, নিষ্ঠুর সত্য! আমাদের মিলন সত্যি সার্থক হয়নি। আমরা দু'জন দু'জনের সত্যিকারের সাথী, জীবনের সমব্যথী হতে পারিনি। আমার মত অনভিজ্ঞ সাধারণ মেয়ে কোনদিক দিয়েই ম্যাক্সিমের উপযুক্ত হতে পারেনা একথা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। আমি তাকে প্রাণভরে অন্ধের মত ভালবেসেছি কিন্তু তাতে তার কিছু আসে যায় না। আমার ভালবাসায় তার মন ভরে ওঠেনি। তার মন আরও কি চায়। আমাকে বিয়ে করার আগে সে যা পেয়েছিল, যার জন্য তার জীবন ভরে উঠেছিল আমি তাকে তা দিতে পারছি না বলেই হয়তো এমন অনর্থ ঘটলো! মিসেস ভ্যানহপারেব মত লোকও সেদিন বলেছিল, 'আমার মনে হচ্ছে এজন্য তুমি একদিন অনুতাপ করবে। তুমি মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছ।' তখন আমি তাঁর কোন কথায় কান দিইনি বরং

মনে প্রাণে তাঁকে কত ঘৃণা করেছি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তাঁর কথা কত সত্যি! তিনি আরও বলেছিলেন, 'তুমি বুঝি ভাবছো মিঃ ডি উইণ্টার তোমাকে ভালবেসেছেন? মোটেই তা নয়। ঐ বিরাট প্রাসাদে একলা আর বাস করতে পারছেন না, তাই!' তাঁর প্রতিটি কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। এতবড় খাঁটি কথা হয়তো তিনি জীবনে আর কোন দিন বলেননি। ম্যাক্সিম আমাকে ভালবাসেনি, আজও ভালবাসে না, বাসবেও না কোন দিন। আমাকে যতটুকু আদর সোহাগ করেছে, ভালবেসে অন্তর ঢেলে তা করেনি। সহজাত অনু-প্রেরণায় একটি পুরুষ একটি মেয়েকে যতটুকু কাছে টেনে নেয় তার বেশি সে কিছু দেয়নি! আমার ম্যাক্সিম সে নয়, সে রেবেকার ম্যাক্স! এখনও সে রেবেকার কথা ভাবছে, মনে প্রাণে তাকেই ভালবাসছে। আমাদের দু'জনের মাঝখানে রেবেকা যে অপরিচয়ের বিরাট সেতু গড়ে তুলেছে তা কোনদিন ভাঙ্গবে না। ম্যাণ্ডারলের অনুপরমাণুতে নিবিড়ভাবে জড়ানো রয়েছে তার স্মৃতি! তার অঙ্গের মদির সুবাস এখনও বুঝি ম্যাণ্ডারলের বাতাসে বাতাসে জড়িয়ে আছে। তারই ব্যবস্থা মত আজও ম্যাণ্ডারলের ঘরকন্নার আয়োজন, তারই পছন্দ মত খাবার আজও আমাদের সকলকে খেতে হচ্ছে। তার পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, প্রসাধন সামগ্রী সব কত যত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এখনই যেন সে ফিরে এসে আবার সব ব্যবহার করবে! ম্যাণ্ডারলের সর্বময়ী কর্ত্রী আজও রেবেকা! আজও সে মিসেস ডি উইণ্টার! আমি কে? কেন এখানে এসেছি? ম্যাক্সিমের দিদিমা সেদিন কেঁদে বলেছিলেন, 'রেবেকা কোথায়? আমি তাকে দেখতে চাই। তোমরা তাকে কি করেছ?' তিনি আমাকে চেনেন না, আমার কথা একবারও ভাবেন নি। কেনই বা ভাববেন! আমি কে? আমি তাঁর কাছে অজানা অতিথির মত। আমি ম্যাক্সিমের কেউ নই, ম্যাণ্ডারলের ওপর আমার কোন অধিকার নেই। প্রথমদিন

বিয়েট্রিসও সহজ সরলভাবে বলে ফেলেছিল, 'তুমি তার চাইতে একেবারে অন্যরকম।' মুখচোরা লাজুক ফ্র্যাঙ্ক আমার প্রশ্নের উত্তরে সেদিন শান্ত গম্ভীর স্বরে যা বলেছিল আজও তা আমার কানে এসে তীরের মত বিঁধছে, 'হাঁ, তার মত সুন্দরী আমি জীবনে আর দেখিনি।'

রেবেকা, রেবেকা, রেবেকা, কেবলই রেবেকা! শয়নে, স্বপনে, নিদ্রা, জাগরণে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি। আমার সকল ভাবনা, চেতনা সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার সুন্দর সুঠাম অপরূপ প্রতিটি ভঙ্গিমা যেন আমার কত চেনা! একরাশ কালো কুচ্‌কুচে চুলের মাঝে শুভ্র সুন্দর অনুপম একখানি মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে অনুক্ষণ জলজ্বল করছে। তার অনিন্দ্য মুখখানির অপরূপ হাসিটুকুও যেন আমার কত পরিচিত। তার মধুর স্বর বীণার তারে মিষ্টি আলাপের মত আমার কানে ঝঙ্কার তুলছে। তার অঙ্গের মদির সুগন্ধ যেন আমায় মাতাল করে দিচ্ছে। রেবেকা, রেবেকা, শুধুই রেবেকা! রেবেকার নাগপাশ থেকে আমার মুক্তি কোথায়! তার সাথে আমি প্রতিদ্বন্দিতা করবো কেমন করে? রেবেকার চিরযৌবন, সে যে চির নূতন। তাকে আমি কোনদিন পরাজিত করতে পারবো না, তাকে তার অধিকার থেকে এতটুকুও নড়াতে পারবো না।

না, না, আর আমি ভাবতে পারিনা। এসব ভাবতে ভাবতে কি পাগল হয়ে যাব! বিছানা থেকে উঠে জানালার পর্দাগুলি সব টেনে তুলে দিলাম। সূর্যের অবারিত আলোর ছটায় ঘর ভরে গেল। দরজার কাছে আসতেই দেখলাম একটুকরো কাগজের মত কি দেখা যাচ্ছে। তুলে দেখি বিয়েট্রিসের চিঠি, আমাকে লেখা। খুব তাড়াতাড়ি পেন্সিলে লিখেছে, 'তোমাকে অনেক ডেকেও কোন সাড়া পাইনি। হয়তো ঘুমোচ্ছিলে। গাইলসের আজ ক্রিকেট খেলা আছে বলে এত সকালে চলে যাচ্ছি। কালকে সে যা হৈ হুল্লোড় করেছে তাতে কি করে

আজ আবার খেলবে ভগবানই জানেন! আমার পা দু'টোও বড় ব্যথা করছে। ফার্থ বললো ম্যাক্সিম খুব ভোরে চা খেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে। তোমরা দু'জনে আমাদের ভালবাসা নেবে। কালকের আনন্দের জন্য তোমাদের দু'জনকেই আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ও বিষয়ে তুমি কিছু ভেবো না আর, কেমন?—তোমারই বী।' চিঠির ওপরে সময় লেখা আছে সাড়ে ন'টা। এখন সাড়ে এগারটা বেজেছে। এতক্ষণে ওরা বাড়িতে পৌঁছে গেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পর ওরা খেলার মাঠে যাবে দু'জনে। বেশ আছে ওরা! বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ কুড়ি বছর কাটিয়ে আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছেও কত সুখী। কত সহজ, সরল ওদের জীবন! স্বামী পুত্র সংসার আর আনন্দ কোলাহল নিয়ে বিয়েট্রিসের জীবনের দিনগুলি পালকের মত হালকা হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর আমি! বিয়ের তিনমাসের মধ্যেই জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি ঘটে গেল আমার জীবনে! স্বপ্ন গেল মিলিয়ে, এখন শুধুই বুকভরা শূন্যতা নিয়ে সমস্ত জীবনটা কাটাবো কেমন করে! আর যে ভাবতে পারিনা। দুর্ভাবনার ভারে আমার অবসন্ন মন আরও অবসন্ন হয়ে উঠলো। এখনই তো ওরা ঘর পরিষ্কার করতে আসবে। ক্ল্যারিস হয়তো ম্যাক্সিমের শূন্য বিছানা লক্ষ্যও করেনি। আমি দু'হাত দিয়ে বিছানার চাদর একটু দুমড়ে দিলাম যাতে ওরা মনে করে সে এখানেই ঘুমিয়েছে। ওরা সত্যি কথা জানতে পারলে আমার যে লজ্জা আর অপমানে মরতে বাকি থাকবে।

ক্লান্ত শরীরটাকে কোন রকমে টেনে নিয়ে স্নান করে পোশাক বদলে নিচে নেমে এলাম। হলঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। বাজির পোড়া টুকরোগুলি পরিষ্কার করে ফেলবার জন্য মালিরা চারিধার ঝাড় দিচ্ছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কালকের উৎসবের কোন চিহ্নও আর থাকবে না। উৎসবের আয়োজন করতে কতদিন ধরে কত আড়ম্বর

হোল কিন্তু সব শেষ হয়ে যেতে কতটুকুই বা সময় লাগলো! রবার্ট খাবার ঘরের টেবিল পরিষ্কার করছিল। আমি তাকে বললাম, 'মিঃ ডি উইণ্টারকে দেখেছ?'

'তিনি তো খুব সকালে চা খেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন জান?'

'না, তা তো বলতে পারছি না।'

আমি এবার বসবার ঘরের দিকে চললাম। ঘরে ঢুকতেই জেসপার আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার কাছে ছুটে এলো। আমাকে যেন ও অনেককাল পরে দেখেছে এমনি ভাব। কাল হয়তো ও ক্ল্যারিসের সাথে ঘুমিয়েছে। একরাত্রির ব্যবধান বুঝি আমারই মত ওর কাছেও কত দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

ম্যাক্সিম হয়তো ফ্র্যাঙ্কের ওখানে আছে এই আশায় অফিসে ফোন করলাম। দু'মিনিটের জন্য হলেও তার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে, আমার কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কালকের ঘটনায় আমার কোন অভিসন্ধি ছিল না সে কথাই বুঝিয়ে বলবো। কে একজন কর্মচারী বললো, 'মিঃ ডি উইণ্টার তো এখানে নেই। মিঃ ক্রলে আছেন। আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন।'

'কি হয়েছে মিসেস ডি উইণ্টার?' সেই মুহূর্তে ফ্র্যাঙ্কের চিন্তিত স্বর ভেসে এলো।

'ম্যাক্সিম কোথায়?'

'কি জানি, তাকে তো আমি দেখিনি।'

'ওখানে একবারও যায় নি?'

'না তো।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি তাকে সকালবেলা খাবার সময় দেখেন নি?'

'না। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'কাল তার কেমন ঘুম হয়েছিল?'

উত্তর দিতে একটু দ্বিধা করেই ভাবলাম এ জগতে ফ্র্যাঙ্কই আমার একমাত্র বন্ধু যাকে কোন কথা লুকোবার নেই।

'কাল রাতে সে শুতে আসে নি।'

ওদিক থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কোন কথা শোনা গেল না। তারপর খুব আস্তে সে বললো, 'ও, বুঝেছি।' আবারও একটু চুপ করে থেকে বললো, 'এরকম একটা কিছু ঘটবে আশঙ্কা করেছিলাম।' আমি অস্থির স্বরে বলে উঠলাম, 'কাল সবাই চলে যাবার পর সে কিছু বলেছিল?'

'আমি তো একটু পরেই চলে এসেছিলাম। তারপরের খবর মিসেস লেসি হয়তো বলতে পারবেন।'

'ওরা আজ সকালে চলে গেছে। বিয়েট্রিস আমাকে চিঠি লিখে গেছে। ম্যাক্সিমকে ওরাও দেখেনি।'

'ও।' ফ্র্যাঙ্কের এরকম সংক্ষিপ্ত উত্তর আমার একটুও ভাল লাগলো না। কেমন একটা অমংগলের ইঙ্গিত যেন তার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আমি আবার বললাম, 'কোথায় গেছে সে? আপনার কি মনে হয়?'

'ঠিক বলতে পারছি না। হয় তো সমুদ্রের দিকে বেড়াতে গেছে।'

'কিন্তু তার সাথে আমার যে এখনই দেখা হওয়া দরকার। কালকের ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।' ফ্র্যাঙ্ক এবার কোন উত্তর দিল না। এতদূর থেকেও আমি তার চিন্তিত গম্ভীর মুখখানি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'সে ভেবেছে আমি সব জেনে শুনে ইচ্ছে করেই অমন ব্যাপার করেছি।' উচ্ছ্বসিত কান্নায় আমার স্বর ভেঙ্গে গেল। কাল রাতেও যে অদম্য কান্নার বেগ চেপে

রাখতে পেরেছিলাম আজ এই মুহূর্তে তাকে আর বাধা দিয়ে রাখতে পারলাম না। ঝর ঝর করে অঝোর ধারায় জল ঝরে পড়ছে আমার দু'গাল বেয়ে। রুদ্ধস্বরে বললাম, 'সে আমাকে কত ছোট ভাবলো।'

'না, না, এ সব আপনি কি ভাবছেন!' ওদিক থেকে তার ব্যাকুল স্বর ভেসে এলো।

'আপনি তো তার সে সময়কার দৃষ্টি দেখেন নি! আমার মত তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সারাক্ষণ তাকে লক্ষ্য করেন নি। আমার সাথে একটি কথাও সে বলেনি, আমার দিকে একবারও তাকায় নি।'

'কথা বলবার সুযোগ ছিল না, তাই। চারদিকে অত কোলাহল, লোকজন। আমি তাকে ভাল করেই চিনি মিসেস ডি উইণ্টার। আমাকে বিশ্বাস করুন'...তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'এজন্য তাকে আমি এতটুকুও দোষ দিচ্ছি না। আমার কোন অভিযোগ নেই। যদি তার ধারণা হয়ে থাকে আমি সব কিছু জেনে শুনে ইচ্ছা করে ওরকম সাজ করেছি তাহলে সে আমার ওপর রাগ করতেই পারে। সেটাই খুব স্বাভাবিক। এজীবনে হয়তো সে আর আমার মুখ দেখবে না।'

'না, না, এসব বলবেন না। আমি এখনই আপনার কাছে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে আপনাকে আমি সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারবো।'

'না, না। আপনাকে আসতে হবে না। যা ঘটে গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। হয়তো এমন হয়ে ভালই হোল। অনেক আগেই আমার যা জানা উচিত ছিল এখন এই ঘটনা স্পষ্ট করে তা বুঝিয়ে দিল। তাকে বিয়ে করবার সময়েই আমার জানা উচিত ছিল......'

'কি বলছেন আপনি?' ওদিক থেকে তার উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল। অবাক হয়ে ভাবলাম ফ্র্যাঙ্ক কেন এত ব্যাকুল হয়ে উঠছে! ম্যাক্সিম আমাকে ভাল নাবাসলে তার কি ক্ষতি?

'তাদের দু'জনের কথা…তার এবং রেবেকার কথা বলছি।' রেবেকা নামটি উচ্চারণ করে মনে হোল আমি যেন কারও কাছে আমার জীবনের মস্ত বড় এক অন্যায়ের স্বীকারোক্তি করছি। ফ্র্যাঙ্ক চুপ করে আছে। ওদিক থেকে তার দীর্ঘশ্বাসও যেন শুনতে পাচ্ছি। একটু পরে তার চিন্তাকুল, ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, 'কি বলতে চান আপনি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ম্যাক্সিম আমাকে ভালবাসে না। সে রেবেকাকে ভালবাসে। তাকে সে ভুলতে পারেনি। এখনও দিন রাত তারই কথা ভাবে। আমাকে সে কোন দিন ভালবাসতে পারবে না।' আমার কথা শুনে ফ্র্যাঙ্ক খুব চমকে উঠে কি বলে উঠলো। আমি সব বুঝতে পেরেছি জেনে হয়তো খুব আঘাত পেয়েছে। আমি আবার বললাম, 'আমার মনের অবস্থা, আমার অনুভূতি হয় তো এখন কিছুটা বুঝতে পারবেন।'

'আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি, এক্ষুণি যাচ্ছি। আপনার সাথে আমার জরুরী কথা আছে। শুনুন, মিসেস ডি উইণ্টার, মিসেস ডি উইণ্টার…' সে ব্যাকুলভাবে আমাকে ডাকছে। ফোন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি তার মুখোমুখি হতে চাইনা। কি বলে সে আমায় সান্ত্বনা দেবে? আমার মনে আর এতটুকুও মোহের আবরণ নেই। কারও কোন সান্ত্বনায় আমার মন আর মানবে না। আমার দু'চোখ বেয়ে তখনও অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছিল। অস্থির মনে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছি। সহসা মনে হোল আর কোন দিন আমি ম্যাক্সিমকে দেখতে পাব না। সে কোথায় চলে গেছে। আর কোন দিন বুঝি ফিরে আসবে না!……

জানালার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিবর্ণ রডোড্রেনডনেরা ঝরে ঝরে পড়ছে। এবছরের মত তারা বিদায় নিল। সাগরের বুক থেকে ঘন কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে

ওপরের দিকে উঠছে। ওদিককার অরণ্য তাই আর দেখা যাচ্ছে না। বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিবিড় কুয়াশার আড়ালে সূর্য তার মুখ লুকিয়েছে। মনে হোল কি এক অজানা অমংগলের কালো ছায়া যেন ম্যাণ্ডারলের আকাশ থেকে সব আলো কেড়ে নিয়েছে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে আমি ম্যাণ্ডারলের আঙ্গিনা পার হয়ে অরণ্যের দিকে এগোতে লাগলাম। কুয়াশার ঘন আস্তরণ গাছের গায়ে আঘাত খেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আমার মাথায় ঝড়ে পড়লো। জেসপার কখন এসে আমার পায়ের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজকের বিশ্রী, গুমোট আবহাওয়া তাকেও বিমর্ষ করে দিয়েছে। অরণ্যের শেষ প্রান্তে মাটির কোলে উত্তাল সাগর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। তার একটানা কল্লোল এখান থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সমুদ্রের নোনা স্বাদ বুকে নিয়ে ধূসর কুয়াশার এক ঝলক আমার গা ঘেঁষে ম্যাণ্ডারলের দিকে ধেয়ে চললো। ম্যাণ্ডারলের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম পশ্চিম মহলের বড় শোবার ঘরে একটি জানলার সার্সি ভেতর থেকে খোলা রয়েছে। কে একজন সেখানে দাঁড়িয়ে আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে আছে! মূর্তিটি আবছা ছায়ার মত। চমকে উঠে ভাবলাম ম্যাক্সিম নয়তো! মূর্তিটি একটু নড়ে উঠলো। তারপর একখানি হাত জানালার সার্সি বন্ধ করতে বেরিয়ে এলো। তখন বুঝতে পারলাম এ আর কেউ নয়, ডানভারস! আমাকেই সে লক্ষ্য করছিল। হয়তো আমার আর ফ্র্যাঙ্কের কথাবার্তাও তার ঘরের ফোনের মধ্য দিয়ে সব শুনেছে। কাল রাত্রে ম্যাক্সিম শুতে আসে নি তাও কি সে জানে? সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সে যা কামনা করেছে তাই তো ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হোল! তার জয়, রেবেকার জয়!

কাল সন্ধ্যেবেলায় পশ্চিম মহলের দোর গোড়ায় সেই নিশ্চল মূর্তির মড়ার মত শাদা মুখে অদ্ভুত, অর্থ পূর্ণ তিক্ত হাসির ছটা মনে পড়তেই

আমার আরও মনে পড়লো ডানভারসও তো আমার মত রক্ত-মাংসে গড়া এই পৃথিবীরই মানুষ! সে রেবেকার মত মৃত নয়। রেবেকার মুখোমুখি না হতে পারলেও ডানভারসের সাথে তো বোঝাপড়া করতে পারি। একথা মনে হতেই বাড়ির দিকে চলতে সুরু করলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা পশ্চিম মহলে ঢুকে নির্জন অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে রেবেকার শোবার ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ডানভারস তখনও জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে নাম ধরে ডাকতেই সে ফিরে দাঁড়ালো। কান্নায় তার চোখ দু'টি লাল টকটকে হয়ে মুখখানি ফুলে গেছে। রক্তশূন্য শাদা মুখে গভীর কালো ছায়া। আমার দিকে চেয়ে ভারি গলায় সে বললো, 'কি? কি হয়েছে?' আমি তাকে এ অবস্থায় দেখবো ভাবিনি। ভেবেছিলাম কালকের মতই তার চোখেমুখে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ভরা হাসির ঝিলিক দেখবো। কিন্তু তার সেই ক্রুর, কঠিন প্রতিহিংসার ভীষণ মূর্তি আজ কোথায় গেল মিলিয়ে! এ যে এক অসহায় বৃদ্ধার ক্লান্ত, পীড়িত প্রতিমূর্তি! তার এ অবস্থা আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে কি করবো, কি বলবো ভেবে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি। সে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। অসহ্য নীরবতায় কতক্ষণ কেটে গেল। এক সময় তার স্বর শুনতে পেলাম, 'খাবার তালিকা রোজকার মত টেবিলের ওপরে রেখে এসেছি।' তার কথায় যেন একটু সাহস পেলাম মনে। বললাম, 'আমি খাবারের কথা বলতে আসিনি। কেন এসেছি আপনিও তা জানেন।' সে কোন উত্তর দিল না।

'আপনি যা চেয়েছিলেন তাই করতে পেরেছেন। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। এখন সুখী হয়েছেন তো?' আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আপনি কেন এখানে এসেছেন? ম্যাণ্ডারলে আপনাকে চায়নি। কোন

দিন চায় না। আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা বেশ ছিলাম। কেন এলেন আপনি?'

'ভুলে যাচ্ছেন আমি মিঃ ডি উইণ্টারকে ভালবাসি। আমাকে তিনি বিয়ে করেছেন।'

'না, সত্যি যদি ভালবাসতেন তাহলে তাঁকে বিয়ে করতেন না।' এসব কি বলছে সে! কান্নায় ভেজা ভারি গলায় সে বলে যেতে লাগলো, 'প্রথম প্রথম ভাবতাম আপনাকে আমি ঘৃণা করি, মনে প্রাণে ঘৃণা করি। কিন্তু এখন আর আমার সে ভাব নেই।'

'কেন? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি?'

'আপনি মিসেস ডি উইণ্টারের স্থান অধিকার করতে চেয়েছিলেন।' আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মূর্তিমতী বিষাদ প্রতিমার মত সে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'ম্যাণ্ডারলের জীবন ধারা আগের মত একভাবে চলেছে। আমি এতটুকুও পরিবর্তন করিনি। আপনার ওপরেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। তবুও কেন আপনি আমার ওপর এত বিরূপ হয়ে আছেন প্রথম দিন থেকে?' সে কোন উত্তর করলো না। আমি আবার বলতে লাগলাম, 'অনেকেই তো দু'বার বিয়ে করে। কিন্তু আপনি এমনভাবে বলছেন যেন মিঃ ডি উইণ্টার আমাকে বিয়ে করে খুব অন্যায় করে ফেলেছেন, কারও ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন! অন্য সবার মত আমাদেরও কি সুখী হবার অধিকার নেই?'

'মিঃ ডি উইণ্টার সুখী নন। যে কেউ তা বুঝতে পারে। তাঁর চোখের দিকে তাকালে আপনিও বুঝতে পারবেন তিনি এখনও কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন! তাঁর মৃত্যুর পর দিন থেকে এই যন্ত্রণার সুরু হয়েছে!'

'না, না, এ সত্য নয়। তিনি সুখী হয়েছেন। বিয়ের পর আমরা যখন বাইরে ছিলাম তখন তিনি কত হেসেছেন, কত আনন্দ করেছেন'···

'হাঁ, তিনিও তো রক্তমাংসে গড়া পুরুষ মানুষ। মধুযামিনীতে কোন পুরুষই নিরানন্দ থাকে না। তাছাড়া মিঃ ডি উইণ্টারের বয়স এখনও তো ছেচল্লিশও পূর্ণ হয় নি।' কাঁধ বেঁকিয়ে তিক্ত স্বরে শ্লেষ ভরে সে বলে উঠলো।

'কোন স্পর্দ্ধায় এমন কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন?' তার কথায় আমার সমস্ত অন্তর জ্বলে উঠলো। আমি আর সহ্য করতে না পেরে তার কাছে গিয়ে তাকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'কাল আপনিই আমাকে ঐ পোশাক পরতে বাধ্য করেছিলেন। আপনি না বললে আমি স্বপ্নেও অমন সাজের কথা ভাবতে পারতাম না। মিঃ ডি উইণ্টারকে আঘাত করবার জন্য, দুঃখ দেবার জন্যই আপনার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র। কিন্তু কেন? তাতে কি লাভ আপনার?' আমার হাতের মুঠো থেকে সে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিল। তার শাদা মুখখানি এবার রাগে, অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। উত্তেজিতভাবে সে বলে উঠলো, 'তিনি দুঃখ পেলে আমার কি? আমার কথা তিনি একবারও কি ভেবেছেন যে আমি তাঁর মনের দিকে চাইবো? মিসেস ডি উইণ্টারের স্থান অধিকার করে আপনি তাঁরই সব জিনিস স্পর্শ করছেন, ব্যবহার করছেন দেখে আমার কেমন লাগে সে কথা কি তিনি একবারও ভেবেছেন? তাঁর বসবার ঘরে লেখবার টেবিলের সামনে বসে তাঁরই কলম দিয়ে আপনি লিখছেন, ম্যাণ্ডারলে আসা অবধি বাড়ির যে ফোনে তিনি তাঁর জীবনের কত কথা আমাকে বলতেন সেই ফোনে আপনিও যখন কথা বলেন তখন আমার সমস্ত অন্তর জ্বলে পুড়ে যায়। আমি সইতে পারি না, কিছুতেই সইতে পারি না। তাঁর হাসিমাখা সুন্দর মুখখানি অনুক্ষণ আমার চোখের ওপর ভাসে। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব আর সৌন্দর্য নিয়ে আজও তিনি ম্যাণ্ডারলের সর্বময়ী কর্ত্রী, আজও তিনিই মিসেস ডি উইণ্টার। তাঁর মত অনন্যা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দশমাস যেতে না

যেতেই যিনি আবার আপনার মত অল্পবয়সী, অতি সাধারণ একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনতে পারেন, আজীবন তাঁর এমন দুঃখ পাওয়াই উচিত! আমি তাঁর চোখ দেখেছি, মুখের ভাব দেখেছি। হাঁ, তিনি নিজেই নিজের নরক সৃষ্টি করছেন। মিসেস ডি উইণ্টার তাঁকে দিনরাত লক্ষ্য করছেন একথা তিনিও জানেন, অনুভব করতে পারেন। তাঁর ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিশোধ একদিন তিনি নেবেন। তিনি এজীবনে একদিনের জন্যও এতটুকু অন্যায় সহ্য করেননি। জীবনে কাউকে পরোয়া করেননি, ভয় করেননি। পুরুষের মতই তাঁর মনের দৃঢ়তা আর বুদ্ধি। শিশুকাল থেকে আমি তাঁকে আমার নিজের সন্তানের মত করে মানুষ করেছি।'

'না, না, আমি আর শুনতে চাইনা। আমাকে কেন এসব বলছেন? আমি কিছু জানতে চাইনা, জানতে চাইনা।' আমি পাগলের মত বলে উঠলাম। আমার কথায় কান না দিয়ে সে আপন মনে প্রলাপ বকে যেতে লাগলো, 'তখন তার বয়স বার বছরও পূর্ণ হয়নি, কী অপরূপ সুন্দরই না ছিলেন দেখতে! ছবির মত সুন্দর! সবাই তাঁর দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকতো! মাত্র বার বছর বয়সে তাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস সবই অসাধারণ ছিল। অমন অদ্ভুত প্রাণ প্রাচুর্য কোনদিন আর কারও মাঝে দেখিনি! চোদ্দ বছর বয়সে তিনি চার ঘোড়ার গাড়ি একা চালাতে পারতেন। মিঃ জ্যাক তাঁর হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম কেড়ে নেবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নেমে আসতেন। তাদের দু'জনের মত অমন সুন্দর জুড়ি আর কোনদিন দেখিনি। প্রাণ প্রাচুর্যে, ব্যক্তিত্বে তাঁরা দু'জন দু'জনের উপযুক্ত সঙ্গী ছিলেন।'

দু'চোখ ভরে আতঙ্ক আর বিস্ময় নিয়ে আমি হতচেতনের মত তার দিকে তাকিয়ে আছি। তার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি লেগে

আছে। কঙ্কালের মত ফ্যাকাশে মুখখানি আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে! একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলতে আরম্ভ করলো, 'কোনদিক দিয়ে তাঁর সাথে অন্য কারও এতটুকু তুলনা হয় না। যখন যা ইচ্ছা হোত তিনি তাই করতেন। কোন বাধা নিষেধ মানতেন না। তাঁর অদ্ভুত সাহস ছিল। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবার সবচেয়ে তেজী, বদরাগি ঘোড়া একা সামলাতে পারতেন। বড় হয়েও খেয়ালখুশি মত তিনি জীবনকে উপভোগ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরাজয় হোল···মানুষের কাছে নয়···ঐ সাগরের কাছে! সাগর তাঁকে গ্রাস করে নিল, পরাজিত করলো'···বলতে বলতে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, মুখখানি কান্নার আবেগে বিকৃত হয়ে গেল। আমি কি করবো, কি বলবো ভেবে না পেয়ে অসহায় দর্শকের মত তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাকে এমন আকুলভাবে কাঁদতে দেখে আমার শরীরটাও কেমন অস্থির করে উঠলো। ক্ষীণস্বরে বললাম, 'আপনি সুস্থ নন। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।' আমার কথায় সে এবার রাগে ফেটে পড়লো। উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, 'আপনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন না কেন? আমি একা থাকতে চাই। আপনার সামনে কেঁদে ফেলেছি বলে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই জানবেন। ঘরে দরজা বন্ধ করে আমি কাঁদি না, মিঃ ডি উইণ্টারের মত রাত্রিতে না ঘুমিয়ে রাতের পর রাত ঘরময় পাগলের মত পায়চারি করে বেড়াই না। আমি তাঁর মত কাপুরুষ নই।'

'আর কিছু জানতে চাইনা। চুপ করুন! চুপ করুন।'

'না, না, কেন চুপ করবো? আপনার ধারণা তাঁকে আপনি সুখী করতে পেরেছেন, তাই না? আপনার মত সাধারণ, অল্পবয়সী, অনভিজ্ঞ মেয়ে তাঁকে সুখী করবে! জীবনের কতটুকু জানেন আপনি? আপনার কোন্ গুণ আছে? মিসেস ডি উইণ্টারের স্থান অধিকার করতে পারবে আপনার মত মেয়ে? কোনদিক দিয়েই যে তাঁর সাথে আপনার তুলনা

চলতে পারে না! আপনাকে দেখে ম্যাণ্ডারলের চাকর বাকরেরাও কত হাসাহাসি করেছে তা জানেন?'

'না, আমি কিছু জানতে চাইনা। দয়া করে এবার চুপ করুন। ঘরে যান।'

'ঘরে যাব? কেন? না, যাবনা। ওঃ, ম্যাণ্ডারলের কর্ত্রী আমাকে ঘরে যাবার আদেশ করছেন! তারপর? তারপর কি হবে? মিঃ ডি উইণ্টারের কাছে দৌড়ে গিয়ে বুঝি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন? সেদিন যেমন মিঃ জ্যাকের আসবার কথা জানিয়েছিলেন আজও তাঁকে সব বলবেন, আমি কি তা জানি না?'

'সে কথা আমি বলিনি।'

'মিথ্যে কথা। আপনি ছাড়া আর কে বলবে? আপনি ছাড়া আর কেউ সে কথা জানে না। সেদিন থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনাদের দু'জনকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। মনে প্রাণে কামনা করছি তিনি যেন আরও কষ্ট পান, আরও-কষ্ট! তিনি দুঃখ পেলে আমার কি। মিঃ জ্যাকের উপর আগের মতই তিনি ঈর্ষা পোষণ করেন। তাইতো এখনও তাঁর ওপর এত রাগ! মিসেস ডি উইণ্টারের সাথে যাঁরাই মেলামেশা করতেন মিঃ ডি উইণ্টার তাঁদের প্রত্যেককে ঈর্ষা করতেন। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। শুধু হাসতেন আর বলতেন, 'আমি যেমন খুশি চলবো।' কোন পুরুষ তাঁকে একবার দেখলেই তাঁর জন্য পাগল হয়ে যেত। তাঁর কত বন্ধু বান্ধব ছিল। তিনি তাদের নিয়ে সাগরে নৌকোবিহার করতে যেতেন, সাগরপারের কুটিরে তাদের সাথে বনভোজন করতেন। তারা সবাই তাঁকে ভালবাসা জানাতো। তিনি হাসতেন আর আমাকে সব কথা বলতেন। এসব তাঁর কাছে নিছক খেলার মত ছিল। পুরুষের ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর মনে এতটুকুও দাগ কাটতে পারতো না। তাঁকে পাওয়ার জন্য সবাই পাগল

হয়ে উঠতো। একে অন্যের ওপর ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতো! মিঃ ডি উইন্টার, মিঃ জ্যাক, মিঃ ক্রলে কে না তাঁকে ভালবাসতেন আর পরস্পরকে ঈর্ষা না করতেন?'

আমি এবার পাগলের মত চীৎকার করে উঠলাম, 'আর বলবেন না। চুপ করুন, চুপ করুন!' একান্ত কাছে সরে এসে আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'আপনি কোনদিন তাঁর সমান হতে পারবেন না। তাঁর স্থান অধিকার করতে পারবেন না। তিনি চিরদিন ম্যাণ্ডারলের কর্ত্রী থাকবেন, তিনিই সত্যিকারের মিসেস ডি উইন্টার। আপনি কে? কেউ নন। আপনি এখানে একেবারে অবাঞ্ছিত। এখানে আপনাকে কেউ চায় না, কেউ ভালবাসে না। তাহলে কেন আপনি তাঁর অধিকার তাঁকেই ছেড়ে দিচ্ছেন না! কেন চলে যাচ্ছেন না?'

আমি তার কাছ থেকে দৌড়ে সরে এসে জানালার দিকে চলে এলাম। অজানা এক আতঙ্কে আমার শরীর থর থর করে কাঁপছে। সেও সরে এসে খুব শক্ত করে আমার হাত ধরে আবার বলতে লাগলো, 'কেন চলে যাচ্ছেন না? কেন? আমরা কেউ আপনাকে চাইনা। মিঃ ডি উইন্টারও আপনাকে চান না। তিনি কোনদিন আপনাকে ভালবাসেননি, ভালবাসতে পারবেন না। আমার মিসেস ডি উইন্টার বেঁচে আছেন, চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আপনারই মরে যাওয়া উচিত'......বলতে বলতে সে আমাকে জানালার দিকে ঠেলে দিল। আবছা কুয়াশায় ম্যাণ্ডারলের আঙ্গিনা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে আবার বলছে, 'নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখান থেকে লাফিয়ে পড়া কত সহজ, তাইনা? আপনার শরীরের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগবে বলে অনুভবও করতে পারবেন না। কত সহজে কত সুন্দরভাবে সব শেষ হয়ে যাবে! কেন লাফিয়ে পড়ছেন না? চেষ্টা করুন, লাফ দিন।'

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক কুয়াশা ঢুকে আমার চোখ মুখে ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। আমার মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি··· দু'হাত দিয়ে জানালা আঁকড়ে ধরে আছি।

'ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে ঠেলে ফেলে দেবনা। কিছু করবোনা। আপনি নিজেই লাফিয়ে পড়তে পারবেন। এখানে থেকে আপনার কি লাভ? আপনি সুখী হতে পারেননি, পারবেনওনা কোনদিন। মিঃ ডি উইন্টার আপনাকে ভালবাসেন না। তবে কেন এভাবে বেঁচে থাকা? এখান থেকে লাফ দিয়ে পড়ুন, একনিমেষে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

কুয়াশায় ঢাকা আঙ্গিনার দিকে আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছি। সে তখনও ফিসফিসিয়ে বলছে, 'দেরি করছেন কেন? লাফ দিন, লাফ দিন'···

ঘন কুয়াশার আরও একটা আবরণ আমার চোখের সামনে থেকে ম্যাণ্ডারলের আঙ্গিনাকে মুছে দিল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, চারধারে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! আমার মাথায় একটি চিন্তাই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে, এখান থেকে লাফ দিলে চোখের পলকে সব শেষ হয়ে যাবে! ম্যাক্সিম আমাকে ভালবাসে না, কোনদিন ভালবাসবে না······মনে প্রাণে রেবেকাকে অনুভব করবার জন্য সে আবার একা হতে চায়।···আমাকে সে চায়না···তবে কেন···'কি করছেন? লাফ দিচ্ছেন না কেন? কোন ভয় নেই। শুধু একবার লাফ দিন'—তার অদ্ভুত স্বর আমাকে একটু একটু করে যেন সম্মোহিত করে ফেলছে! চোখ বন্ধ করলাম। নিচের দিকে আর তাকাতে পারছি না। মাথা ঘুরছে···একি হচ্ছে আমার! কোথায় চলে যাচ্ছি! সব যেন ভুলে যাচ্ছি, আমার মন থেকে সব মুছে যাচ্ছে। আর আমাকে ম্যাক্সিমের কথা, রেবেকার কথা ভাবতে হবেনা, আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে···চোখ বুজে আমি দু'হাত আলগা করে

দিলাম···আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে···আর এক লহমার মধ্যেই আমি······

সহসা চারদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কী এক ভীষণ শব্দ সমস্ত ম্যাণ্ডারলেকে কাঁপিয়ে দিল। জানালার কাঁচ ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে কেঁপে উঠলো। চমকে উঠে চোখ মেলে তার দিকে তাকালাম। আবার সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের গুরু গম্ভীর আওয়াজ! আবার, আবার······। ম্যাণ্ডারলের আকাশে বাতাসে সেই প্রচণ্ড শব্দের অনুরণন হতে লাগলো। অরণ্যের পাখিরা ভয় পেয়ে সেই শব্দের সঙ্গে তাদের ব্যাকুল কলরব মিলিয়ে দিল। ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'কি হোল? ও কিসের শব্দ?' ডানভারস এবার তার কঠিন মুঠো শিথিল করে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। একটু পরে তাকে বলতে শুনলাম, 'রকেটের শব্দ। জাহাজের বিপদ-সংকেত! ম্যাণ্ডারলের উপসাগরে কোন জাহাজ ডুবি হয়েছে নিশ্চয়।'

নিথর, নিস্পন্দ হয়ে আমরা দু'জনেই কুয়াশাচ্ছন্ন আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে আছি।...কয়েক মুহূর্ত পর শুনতে পেলাম কে যেন দ্রুত পায়ে অলিন্দের দিকে এগিয়ে আসছে।

॥ ১৯ ॥

একটু পরেই বুঝতে পারলাম ম্যাক্সিম এদিকে দৌড়ে আসছে। তাকে দেখতে না পেলেও তার গলা শুনতে পেলাম। দৌড়তে দৌড়তে সে ফার্থকে ডাকছিল। ফার্থ হলঘর থেকে সাড়া দিয়ে অলিন্দে নেমে গেল। শুনলাম ম্যাক্সিম তাকে বলছে, 'কুয়াশার জন্যই ওরা পথ ভুল করেছে। আজ আর জাহাজটাকে সরাতে পারবে না। নাবিকদের জন্য

খাবার তৈরী করতে বলে দাও। আর মিঃ ক্রলেকে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দাও।' ডানভারস জানালা থেকে সরে এসেছে। তার মুখখানি আবার ভাবলেশহীন কঠিন হয়ে গেছে। নির্বিকার স্বরে সে বললো, 'আমাকে এখন নিচে যেতে হবে। হাতটা সরিয়ে নিন, জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি।' আমি আচ্ছন্নের মত সরে এলাম। জানালা, সার্সি বন্ধ করে, পর্দাগুলি টেনে দিয়ে সে ঘরের চারদিকে ভাল করে তাকালো কোন কিছু অগোছালো আছে কিনা দেখে নিতে। বিছানার ওপর আরেকটি আচ্ছাদন বিছিয়ে দিল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বললো, 'মিঃ উইণ্টার হয়তো বেলা একটার মধ্যে ফিরবেন না। আপনাদের যখন ইচ্ছে হবে খেতে চাইবেন।' তারপর পেছন ফিরে সে কাঠের পুতুলের মত নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমিও নিচে নেমে এলাম। গভীর ঘুমের পর হঠাৎ জেগে আমি যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চলছি। ফ্রার্থ খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছিল। আমাকে আসতে দেখে সে থেমে বললো, 'মিঃ ডি উইণ্টার একটু আগে এসেছিলেন। তিনি আবার সাগরের দিকে গেলেন। ওখানে একটা জাহাজডুবি হয়েছে। একটু এগিয়ে গেলেই তাঁকে দেখতে পাবেন।'

'ও, আচ্ছা।' আমি এবার অলিন্দের দিকে চলেছি। কুয়াশার ঘন আস্তরণ ক্রমে আকাশের দিকে উঠছে। এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে পশ্চিম মহলের দিকে তাকালাম। বন্ধ জানালাগুলির দিকে তাকিয়ে সহসা কেন জানি না মনে হোল ওগুলো আর বুঝি খুলবে না, চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে! মাত্র পাঁচ মিনিট আগে আমি তো ওখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। এখান থেকে কত উঁচু দেখাচ্ছে! আমার পায়ের তলায় পাথর কী কঠিন আর মসৃন! একবার পায়ের নিচে আর একবার মাথার ওপর সেই জানালার দিকে তাকাচ্ছি

আর ভাবছি কয়েক মুহূর্ত আগে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম! সহসা আমার মাথা ঘুরে উঠলো, সমস্ত শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো। চোখের সামনে সবকিছু আবছা হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি হলঘরে গিয়ে একটা সোফায় বসে পড়লাম। আমার হাত দু'টো ঠাণ্ডা হয়ে অবশ হয়ে আসছে তবুও দু'হাত দিয়ে হাটু শক্ত করে ধরে স্থির হয়ে বসে রইলাম। একটু পরে ক্ষীণস্বরে ডাকতে চেষ্টা করলাম, 'ফার্থ, ফার্থ, কোথায় তুমি?' ফার্থ তখনই দৌড়ে এলো। আমার দিকে চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে বললো, 'কি হয়েছে? অসুস্থ বোধ করছেন?'

'এক গ্লাস জল…'

'দিচ্ছি।' আমার সমস্ত শরীর তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। ফার্থ দৌড়ে এক গ্লাস জল আর ব্রাণ্ডি এনে আমার সামনে রাখলো।

'ক্লারিসকে ডেকে দেব?'

'না, না, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। বড় গরম লাগছিল তাই…'

'হাঁ, আজ কী অসহ্য গুমোট!' জলের সাথে কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খেয়ে ফেললাম। ফার্থ আবার বললো, 'লাইব্রেরিতে ঠাণ্ডা লাগবে। ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন।'

'না, না, তার দরকার হবেনা। তুমি কিছু ভেবো না।' সে আমার দিকে আর একবার চিন্তিতভাবে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চুপচাপ বসে আছি। চারদিক নিঃশব্দ, নিঝুম। কালকের অতবড় উৎসবের কোন চিহ্নও কোনদিকে নেই। আজ ভাবতেও অবাক লাগছে যে কাল আমি এই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। উচ্ছল আনন্দ-কলরবে মুখর ম্যাণ্ডারলে মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার ব্যবধানে এখন কী শান্ত, নিথর! চেয়ার থেকে উঠে আবার অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালাম। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে ম্যাণ্ডারলের নিবিড় অরণ্যের সবুজ নিশানা ঐ যে দেখা যাচ্ছে। ধূসর আকাশের বুকে

ম্লান সূর্য ক্ষণে ক্ষণে উঁকি ঝুঁকি মারছে। কোথা থেকে একটি ভ্রমর গুণ-গুণিয়ে এলো আমার মুখের কাছে। একটু পরেই সহসা তার গুঞ্জন থেমে গেল। হয়তো কোন ফুলের বুকে মধুর সন্ধান পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আঙ্গিনা থেকে ভিজে ঘাসের সোঁদা গন্ধে বুক ভরে এক ঝলক পাগলা হাওয়া আমার চোখে মুখে তার পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় পৌণে একটা বাজে। কাল ঠিক এমন সময়ে আমি আর ম্যাক্সিম ক্র্যাঙ্কের সাথে তার ছোট্ট বাগানটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধান! তখন তারা দু'জনেই আমার সাজ নিয়ে কত হাসি তামাসা করছিল। আমি বলেছিলাম, 'দেখো তোমাদের দু'জনকেই কেমন অবাক করে দিই।' নিজের সেই কথাগুলি মনে করে আজ চব্বিশ ঘণ্টা পরে লজ্জায় মরে যাচ্ছি! সহসা আমার নূতন করে মনে পড়লো ম্যাক্সিম তো কোথাও চলে যায়নি! আমার সেই আশঙ্কা মিথ্যা হয়েছে। তার শান্ত, স্বাভাবিক স্বর এইতো কিছুক্ষণ আগেও শুনেছি। সে ভাল আছে, আমার ম্যাক্সিম ভাল আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার দুঃসহ দহনে আমি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি, আমার সমস্ত জীবন শূন্যতায় ভরে উঠেছে সেই অব্যক্ত অনুভূতিকেও যেন ক্ষণিকের জন্য নিঃশেষে ভুলে গেলাম। ম্যাক্সিম ভাল আছে, নিরাপদে আছে এই কথাটিই আমার সমস্ত মনকে ছেয়ে রইলো। অন্ধকার বনপথ ধরে সাগরবেলার দিকে চলতে লাগলাম। কুয়াশার আবরণ ছিন্ন করে দিনের আলো এখন ঝলমল করে হেসে উঠেছে।

সাগর পারে এসে দেখতে পেলাম জাহাঁজটা উপসাগরের কোলে একদিকে একটু হেলে পড়ে আছে। সেই টিলার ওপর বেশ ভিড় জমেছে। জাহাজ ডুবির খবর এরই মধ্যে হাওয়ার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকে নৌকো করে জাহাজের চারধারে ঘুরে ঘুরে

দেখছে। সাগরের বুকে কুয়াশা তখনও কাটেনি। তাই আকাশের নীলে সাগরের নীল যেখানটিতে এক হয়ে মিশে গেছে সেই দিগন্তরেখাটি আর দেখা যাচ্ছে না। একটা মোটর বোট করে একরকম পোশাক পরা কয়েকজন লোক এসে পারে নামলো। আমিও ঐ খাড়া পাহাড়টার গা বেয়ে উঠতে লাগলাম ওদিকে যাবার জন্য। কত লোক সেখানে জমা হয়েছে। কিন্তু ম্যাক্সিমকে তো দেখতে পাচ্ছিনা। ফ্র্যাঙ্ক একজন উপকূলরক্ষীর সাথে কথা বলছে দেখতে পেলাম। তাকে দেখে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আগেও আমি ফোনে তার সাথে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলছিলাম! এখন তার সামনে যাব কেমন করে? কিন্তু আর ফেরবার উপায় ছিল না। আমাকে দেখে ফেলে সে ওখান থেকেই হাত নাড়ছে। আমি তার দিকে নেমে চললাম। উপকূল রক্ষীটি আমাকে চিনতো। আমাকে দেখে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে সে বললো, 'আপনিও এসেছেন! কী ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে গেল! এখন জাহাজটাকে এখান থেকে সরানোই খুব মুস্কিল হবে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে কি হবে?' প্রশ্ন করলাম।

'একজন ডুবুরীকে নিচে নামানো হবে জাহাজটার তলা ভেঙ্গেছে কিনা দেখতে। ভেঙ্গে থাকলে তার কারণ কি। ঐ যে লাল টুপী পড়া লোকটি দেখছেন, সেই হোল ডুবুরী।' সেই খোঁয়াটে রঙের মোটর বোটে লাল টুপী পরা একটি লোক বসে আছে দেখলাম। এদিক ওদিকে নৌকো থেকে অনেকে জাহাজটার ছবি তুলে নিচ্ছে। পাহাড়াওয়ালা আবার বললো, 'ডুবুরীকে এখনই নামাবে। সাগরের গভীরে প্রবাল-প্রাচীরে ধাক্কা লেগেই নিশ্চয় জাহাজটা উল্টে গেছে।' ফ্র্যাঙ্ক আমার দিকে চেয়ে বললো, 'রকেট জ্বালিয়ে জাহাজটা যখন বিপদ সংকেত জানাচ্ছিল, আমি তখন এদিকেই আসছিলাম।'

কুয়াশার ঘন আঁধারে পথ হারিয়ে ঐ জাহাজটা আচমকা ম্যাণ্ডারসের সাগরজলে দুর্ঘটনা ঘটালো বলেই এখন আমাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, সমস্ত নিঃশেষে ভুলে থাকতে হবে। একটি ছেলে কোথা থেকে দৌড়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'নাবিকরা সবাই ডুবে গেছে ?'

'না। এযাত্রা সবাই বেঁচে গেছে', রক্ষীটি উত্তর দিল। ফ্র্যাঙ্ক আমার দিকে চেয়ে বললো, 'কাল রাত্রে এই দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা কিছুই টের পেতাম না।'

'ঐ যে ডুবুরী নামছে মিসেস ডি উইণ্টার! দেখুন, দেখুন,'—রক্ষীটি উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলো। সেই ছোট ছেলেটি বলে উঠলো, 'আমি দেখবো। ডুবুরীকে দেখবো। কোথায় সে ?' ফ্র্যাঙ্ক ওদিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ঐ যে ডুবুরী লোহার টুপী মাথায় দিয়ে সাগরে নামতে যাচ্ছে দেখ।'

'ও ডুবে যাবেনা ?' ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো।

'বোকা ছেলে! ডুবুরীরা কি ডোবে নাকি ? ঐ যে দেখ জলের মধ্যে সে কেমন মিলিয়ে গেল।' জলের ওপর কয়েকটি বুদ্বুদ ফুটে উঠে আবার তখনই সব স্থির হয়ে গেল। আমি এবার ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ম্যাক্সিম কোথায় ?'

'একজন আহত নাবিককে নিয়ে কেরিথে গেছে। জাহাজটা ধাক্কা খেতেই সেই নাবিক বেচারা পাগলের মত পারে লাফিয়ে পড়েছিল। পাহাড়ের কঠিন গায়ে আঘাত লেগে তার শরীর কেটে ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। ম্যাক্সিম তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে।'

'কখন গেছে ?'

'আপনি আসবার কয়েক মিনিট আগে। এ সমস্ত ব্যাপারে তার তুলনা নেই। বিপদগ্রস্তকে কি ভাবে সাহায্য করবে তাই ভেবে সে একেবারে অস্থির হয়ে যায়।'

'হাঁ। দরকার হলে তিনি তাঁর গায়ের পোশাকও অন্যকে খুলে দিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। এরকম লোক আরও কয়েকজন যদি এদেশে জন্মাতেন!' রক্ষীটি বলে উঠলো।

তারপর আমরা চুপচাপ জাহাজটির দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। লোকেরা একে একে সব চলে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক বললো, 'ডুবুরী উঠে না আসা পর্যন্ত কিছু হবে না। এখন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। খাবার সময়ও তো হয়েছে।' আমি তার কথার কোন উত্তর দিলাম না। একটু যেন দ্বিধা করে সে আবার বললো, 'আপনি কি করবেন?'

'আরও কিছুক্ষণ থাকবো ভাবছি।'

'এখন কিছু দেখবার নেই। আমার সাথে খাবেন চলুন। তারপর আবার আসবেন।'

'না। আমার ক্ষিদে পায়নি।'

'ও, আচ্ছা। আমি অফিসেই থাকবো। কোন দরকার হলে জানাবেন।'

'আচ্ছা।' ফ্র্যাঙ্ক চলে গেল। জানি না সে কিছু মনে করেছে কিনা। কিন্তু কি করবো আমি? তার সাথে একলা থাকলে আমার আবার সেসব তিক্ত কথা মনে পড়বে। আমি তা চাই না। এখানে এই খাড়া পাহাড়টার গায়ে হেলান দিয়ে একলা বসে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনা হয়ে সময় কাটাতে চাই।

'মিঃ ক্রলেও ভারি ভাল লোক,' পাহাড়ওয়ালা বলে উঠলো। তার কথায় আমার চমক ভাঙ্গলো।

'উনি তো মিঃ ডি উইণ্টারের ডান হাত।'

সেই ছোট্ট ছেলেটি কোথায় চলে গিয়েছিল। আবার দৌড়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'ডুবুরী কখন আসবে?'

'এখনও তার ওঠবার সময় হয়নি।' রক্ষী উত্তর করলো।

'চার্লি, চার্লি, কোথায় গেলে দুষ্টু ছেলে,' বলতে বলতে একটি মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'মা, আমি ডুবুরী দেখেছি।' তার মা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। সে আমাকে চেনে না। বোধ হয় ছুটির দিনে তারা এখানে বেড়াতে এসেছে। মেয়েটি রক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'সবাই বলছে জাহাজটা নাকি এখন কয়েক দিন ওখানেই পড়ে থাকবে?'

'ডুবুরী কি বলে তার ওপর সব নির্ভর করছে।' রক্ষী উত্তর দিল।

'মা, আমি ডুবুরী হবো, কেমন?'

'আচ্ছা। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোর।' আমাদের দিকে তাকিয়ে তার মা হেসে জবাব দিল। রক্ষীটি তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন আমাকে যেতে হবে।' আমাকে অভিবাদন জানিয়ে সে কেরিথের দিকে চলতে লাগলো।

'এসো চার্লি। তোমার বাবা আবার কোথায় গেলেন', বলে মেয়েটি এগিয়ে চললো। ছেলেটি মায়ের পেছনে নাচতে নাচতে চলেছে। ওদিক থেকে খাঁকি পোশাক পরা রোগা মত একজন লোক তাদের দেখে হাত নাড়ছে। নিশ্চয় ছেলেটির বাবা। সহসা ইচ্ছে হোল আমার পরিচয় ভুলে আমিও যদি ওদের সঙ্গে যেতে পারতাম! ওরা কত সুখী। কত সহজ সরল ওদের জীবন! আর আমি! বাড়ি ফিরে এখন একলা শূন্য মনে ম্যাক্সিমের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।' তারপর ঘরে এলেও হয় তো সে আমার দিকে তাকাবে না, একটি কথাও বলবে না। এসব ভাবতে ভাবতে সেখানেই বসে রইলাম। আমার একটুও ক্ষিদে পায় নি। একটু একটু করে বেলা বাড়ছে, নূতন করে আরও অনেক লোক আসতে আরম্ভ করেছে। জাহাজটাকে

ঘিরে সারি সারি নৌকো দেখা যাচ্ছে। ডুবুরী একবার ভেসে উঠে আবার ডুব দিল।

শাদা শাদা হালকা মেঘের দল আকাশময় ছড়িয়ে আছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারদিক কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে বেজে গেছে। এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। পাহাড় পেরিয়ে ওদিককার উপসাগরের দিকে চললাম। সেদিনকার মত আজও এদিকটা পরিত্যক্ত, নির্জন। শান্ত নিস্তরঙ্গ সাগরকে স্বচ্ছ আয়নার মত দেখাচ্ছে। ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘের আড়ালে সূর্য মুখ লুকিয়েছে। উপসাগরের কোলে এসে দেখতে পেলাম বড় দু'টি টিলার মাঝখান দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে যাওয়া শীর্ণ ঝরণাটির এক পাশে বেন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে কি যেন ঘষছে হাত দিয়ে। ঝরণার শান্ত জলে আমার ছায়া দেখে সে চমকে আমার দিকে তাকালো। তারপর ত্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে তাতে কতগুলি শামুক রাখলো। আমার দিকে চেয়ে তার সেই অবোধ হাসি হেসে বললো, 'শামুক খান?' আমি তাকে নিরাশ করতে চাই না বলে বললাম, 'আচ্ছা, দাও।' সে আমার হাতে মুঠো ভরে শামুক দিল। আমার দিকে কয়েক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আবার বললো, 'জাহাজটা দেখেছেন?'

'হাঁ। পারে ধাক্কা লেগে ওটা উল্টে গেছে, তাই না?' সে কোন উত্তর না দিয়ে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়েই রইলো। আমি আবার বললাম, 'মনে হচ্ছে ওর তলাটা ফুটো হয়ে গেছে।' তার চোখে মুখে সেই অবোধ ভঙ্গির এতটুকুও পরিবর্তন নেই। সে এবার বিড় বিড় করে বললো, 'একেবারে, তলিয়ে গেছে। আর কোনদিন ফিরে আসবে না।' আমি বললাম, 'জোয়ার আসলে দড়ি দিয়ে জাহাজটাকে টেনে তোলা হবে।' সে কোন উত্তর না দিয়ে শূন্য

দৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর বললো, 'এতদিনে তাঁকে মাছেরা খেয়ে ফেলেছে, তাই না ?'

'কার কথা বলছো বেন ?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম। সাগরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বললো, 'আমি তাঁর কথা বলছি।'

'মাছেরা কি জাহাজ খেতে পারে নাকি ?' আমি হেসে ফেললাম। সে আমার দিকে তেমনই তাকিয়ে আছে। 'এবার আমাকে যেতে হবে', বলে আমি হাঁটতে লাগলাম।

বনপথ দিয়ে চলতে চলতে মনে হোল সেই কুটিরটি তো ওখানেই শান্ত নিরালা পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন ফিরে সেদিকে আর তাকালাম না। এরই মধ্যে সমস্ত আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। সাগরের বুক থেকে দমকা হাওয়া উঠে এসে আমার চোখে মুখে এক ঝাপটা দিয়ে গেল। গাছ থেকে একটা শুকনো ঝরা পাতা আমার মাথার ওপর পড়লো টুপ করে। অকারণেই আমি কেঁপে উঠলাম। পেছন থেকে সাগরের মৃদু কল্লোল একটানা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনা যাচ্ছে। সংকীর্ণ বনপথ ধরে আস্তে আস্তে চলেছি। পা দু'টো আর যেন চলতে চায় না। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে, বুকটা কি এক অব্যক্ত ব্যথায় টন টন করে উঠছে। অরণ্য শেষ হয়ে আঙ্গিনা দিয়ে আসতে আসতে দূর থেকে বাড়িটাকে অপরূপ এক মায়া-পুরী বলে মনে হচ্ছিল। এমন সুন্দর বুঝি আর কোনদিন মনে হয়নি। সহসা এই প্রথম আমার মনে হোল এতো আমারই বাড়ি, ম্যাণ্ডারলে একান্তই আমার! মনটা বেশ গর্বিত হয়ে উঠলো যেন। ঐ যে সবুজ ঘাসের আস্তরণে ফুলের টবগুলি ছবির মত সাজানো রয়েছে, একটা চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে, আঙ্গিনার নূতন কাটা ঘাস থেকে মাটির সোঁদা গন্ধ বাতাসের সাথে মিশে আছে, বাদাম গাছের ডালে বসে কোকিল মধুর সুরে গান ধরেছে, এই যে একটা রঙীন

প্রজাপতি আমার সামনে দিয়ে উড়ে গেল, সমস্ত মিলিয়ে ম্যাণ্ডারলে যে একান্তই আমার!

খাবার ঘরে ঢুকে রবার্টকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিঃ ডি উইণ্টার এসেছিলেন?'

'হাঁ। দু'টোর একটু পরে এসে খেয়ে আবার তখনি বেরিয়ে গেছেন।'

'কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?'

'না।'

আমার ভেতরটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। এখন কিছু খেতে পারবো বলে মনে হোল না। রবার্টকে বললাম, 'আমার জন্য শুধু এক কাপ চা লাইব্রেরিতে নিয়ে এসো।' তারপর লাইব্রেরিতে গিয়ে জানালার ধারে বসে রইলাম। জেসপার কোথায় গেল? ও আমার কাছে না থাকলে বড় একলা মনে হয়। হয়তো ম্যাক্সিমের সঙ্গে গেছে। জেসপারের মা তার বাস্কেটে শুয়ে আছে চুপচাপ। কোন কাজে মন বসাতে পারবো না জেনেও 'টাইমস' খুলে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। কি একটা অঘটন ঘটবে বলে আমি যেন প্রতীক্ষায় বসে আছি। মনের গভীরে কাল থেকে যে অশান্তি তোলপাড় করছিল তার সঙ্গে আরও একটা অসোয়াস্তিকর অনুভূতি আমার মনকে ছেয়ে ফেললো। মাত্র কাল রাতে যে মেয়েটি উৎসবের সাজ পরেছিল আজ সে কোথায় গেছে হারিয়ে। অনেকদিন আগে যেন সে সব ঘটনা ঘটে গেছে। আমি যেন অন্য কেউ, একেবারে নূতন মানুষ! কেবলি মনে হতে লাগলো এখন থেকে আমার জীবন ধারা বুঝি সম্পূর্ণ নূতন খাতে বইবে!

রবার্ট চা, টোষ্ট এবং আরও অনেক খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সকালবেলা শুধু এককাপ ঠাণ্ডা চা খেয়েছিলাম। তাই এখন খেতে ইচ্ছে না করলেও ক্ষিদের তাড়নায় দু'কাপ চা, অনেকগুলি খাবার খেয়ে

ফেললাম। একটু পরে রবার্ট আবার এসে বললো, 'কেরিথের হারবার মাষ্টার ক্যাপ্টেন সার্লে মিঃ ডি উইণ্টারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান।'

'তাঁকে বলে দাও তিনি যেন আবার পাঁচটার সময় ফোন করেন।' রবার্ট বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এসে বললো, 'আপনার অসুবিধা না হলে তিনি আপনার সাথে এখানে এসে কথা বলতে চান। খুব নাকি জরুরী দরকার।'

'ও। আচ্ছা, তাঁকে আসতে বলে দাও।' ক্যাপ্টেন সার্লে আমার সঙ্গে কি এমন জরুরী কথা বলবেন? অজানা আশঙ্কায় মনটা ভারি হয়ে উঠলো।

পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাপ্টেন সার্লে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, 'আপনি বসুন। উনি তো এখনও ফেরেন নি।'

'হাঁ, আমিও শুনেছি তিনি কেরিথে গেছেন মিঃ ক্রলেকেও ফোন করে পেলাম না।'

'আচ্ছা, জাহাজটাকে টেনে তোলা যাবে তো?'

'জাহাজটার তলায় খুব বড় একটা ফুটো হয়ে গেছে। ওটা একেবারেই অকেজো হয়ে গেল। সে কথা যাক। আমি এসেছি মিঃ ডি উইণ্টারকে একটা জরুরী খবর জানাতে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না কেমন করে আপনাদের সেই খবরটি দেব।' ক্যাপ্টেন সার্লে এবার আমার চোখের দিকে সোজা ভাবে তাকালেন।

'কেন, কি এমন খবর?'

'আপনাকে বলতেও আমার সংকোচ হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের দু'জনের একজনকেও আমি বিরক্ত করতে চাই না। আমরা সবাই ডি উইণ্টারকে বড় ভালবাসি। ম্যাণ্ডারলের এই

বিখ্যাত পরিবারটি পুরুষানুক্রমে এদেশের লোকেদের কত যে উপকার করেছে তার তুলনা নেই! যে কথা আজ জানাতে এসেছি সামান্য উপায় থাকলেও আপনাদের তা জানাতে না হলেই খুব খুশি হতাম। 'কিন্তু'—একটু থেমে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিচু গলায় আবার বলতে লাগলেন, 'জাহাজটার তলা পরীক্ষা করবার জন্য আমরা ডুবুরীকে সাগরের নিচে পাঠিয়েছিলাম। সে অদ্ভুত একটা আবিষ্কার করেছে। জাহাজটার একপাশে ছোট্ট একটি নৌকো পড়ে থাকতে দেখেছে। সেটা কোন জায়গায় এতটুকুও ভাঙ্গেনি! ডুবুরী এখানকার স্থানীয় লোক, তাই সে তখনই চিনতে পেরেছে যে নৌকোটি স্বর্গগতা মিসেস ডি উইণ্টারের নৌকো।' আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, 'তাঁকে এই খবরটা না জানালে তো কোন ক্ষতি নেই। আপনি তাকে কিছু জানাবেন না।'

'তাঁকে না জানাতে হলে আমিই বেশি খুশি হতাম। কিন্তু ব্যাপারটা যে এখানেই শেষ নয়। ডুবুরী নৌকোর ভেতরে আরও একটা আবিষ্কার করেছে। নৌকোর কেবিনের দরজা, জানালা খুব শক্তভাবে বন্ধ ছিল। একটা পাথর দিয়ে আঘাত করে জানালা ভেঙ্গে সে ভেতরে ঢুকে দেখলো কোথাও কোন জায়গায় সামান্য ভাঙ্গা বা ফুটো নেই। কিন্তু কেবিনটি জলে ভর্তি। তারপর সে যা দেখলো তা আরও ভয়াবহ'— ক্যাপ্টেন সার্লে একটু থেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'সে দেখলো কেবিনের মেঝেয় একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। এখন বোধহয় আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমি মিঃ ডি উইণ্টারের সাথে দেখা করতে চাই।' আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সহসা কেমন অস্থির অস্থির করে উঠলো সমস্ত শরীর। কোনওরকমে বললাম, 'তাহলে আর একজন কেউ তার সঙ্গে ছিল মনে হচ্ছে।'

'কি জানি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু কে ছিল? এতদিনের মধ্যেও তার কোন খোঁজ হোল না? মিসেস ডি উইন্টারের দেহই বা কয়েকমাস পরে অন্য জায়গায় পাওয়া গেল কি করে?'

'আমিও তো ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না। এই খবর এখনই ঝড়ের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

'আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁকে এ খবর জানাবেন না।'

'কিন্তু তা যে হবার নয় মিসেস ডি উইন্টার। আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।' তাঁর কথা শেষ হতেই ম্যাক্সিম ঘরে ঢুকলো। 'আপনি এখানে? কি ব্যাপার?' খুব অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করলো। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তার মুখোমুখি হবার সাহসটুকুও আমার আর অবশিষ্ট নেই। আমি হলঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জেসপার কোথা থেকে ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। তাকে একটু আদর জানিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসে পড়লাম। আমার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণ এসেছে। এখন দুর্বল হলে চলবে না। লজ্জা, ভয়, সংকোচ, দৈন্যতা, ক্লান্তি, সব এখন ক্ষণিকের জন্য হলেও মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে। একটুখানি শক্তির জন্য, দৃঢ়তার জন্য সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে প্রার্থনা করছি। এভাবে তন্ময় হয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম খেয়াল নেই। গাড়ির শব্দ কানে যেতেই বুঝতে পারলাম ক্যাপ্টেন সার্লে বিদায় নিলেন। লাইব্রেরিতে এসে দেখি ম্যাক্সিম জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে তার একখানি হাত তুলে নিয়ে আমার গালে ছোঁয়ালাম। সে তখনও কিছু বললো না। চুপি চুপি বললাম, 'আমি সব শুনেছি।' সে কোন উত্তর দিল না। তার হাতখানি কী ঠাণ্ডা! আমি আবার বললাম, 'তুমি তো একা নও। আমিও তোমার সঙ্গে সব দুঃখ ভাগ করে নেব। একদিনের মধ্যেই আমি অনেক বড় হয়ে গেছি, অনেক অভিজ্ঞ হয়েছি। আমাকে তুমি

আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।' কোন উত্তর না দিয়ে এবার সে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে তার বুকে টেনে নিল। তার প্রশস্ত বুকে মুখ লুকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে বললাম, 'তুমি আমায় ক্ষমা করেছ তো?' এবার সে কথা বললো। যেন অনেক দূর থেকে তার স্বর ভেসে এলো।

'ক্ষমা! কেন? কি করেছ তুমি?'

'কাল রাতের কথা বলছি। তুমি ভেবেছ আমি ইচ্ছে করে অমন করেছিলাম।'

'ও, এই কথা! কাল তোমার ওপর রাগ করেছিলাম সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।' আর কোন কথা না বলে সে আমাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো। তার বুকে মুখ লুকিয়ে আমি বললাম, 'আমরা আবার নূতন করে জীবন আরম্ভ করবো, কেমন? আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে না জানি। সেই অসম্ভব দাবিও আমি করবো না। আমাকে তোমার বন্ধু, তোমার সমব্যথী হবার অধিকারটুকু শুধু দাও। আর কিছু চাইনা আমি।' দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানি তুলে ধরে সে অপলক তাকিয়ে রইলো। তার কপালে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'আমাকে তুমি কতখানি ভালবাস?' এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর দেব! তার ব্যথাকাতর মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু। তার চোখে মুখে অব্যক্ত যন্ত্রনার আভাস ফুটে উঠেছে। আবার সে ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলো, 'দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। নূতন করে জীবন সুরু করে সুখী হবার ক্ষীণ আশাটুকুও আর নেই।'

'না, না, এসব কি বলছো তুমি!'

'হাঁ, সব শেষ হয়ে গেছে। যা ঘটবার তা ঘটেছে।'

'কি ঘটেছে? কি বলছো?'

'আমার মনের মধ্যে এতদিন যে আশঙ্কা বাসা বেঁধে ছিল তাই ঘটেছে। যে দুঃস্বপ্ন রাতদিন আমাকে অনুসরণ করেছে তাই ফলেছে। তোমার আমার জীবন সুখের জন্য নয়। আমাদের দু'জনের জীবনই বড় অভিশপ্ত।' সে এবার ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়লো। আমি তার পায়ের কাছে মেঝের ওপর বসলাম। দু'হাত জড়িয়ে ধরে আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আবার সে বললো, 'রেবেকার জয় হয়েছে।' তার একথায় আমি চমকে উঠলাম। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। সে বলে চললো, 'তার ছায়া আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। আমার কাছ থেকে তোমাকে কতদূরে সরিয়ে নিয়েছে। একটা চরম সর্বনাশের আশঙ্কাকে বুকের মধ্যে পুরে রেখে দিনরাত আমি যে অসহ্য জ্বালা ভোগ করেছি তোমায় তা বোঝাবো কেমন করে? এমনি করে তোমাকে আমি আমার বুকে জড়িয়ে ধরতেও পারিনি এতদিন! জান, মৃত্যুর আগে তার সেই চোখের দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারি না। আর তার ঠোঁটের কোণে ইঙ্গিত ভরা সেই তিক্ত মৃদু হাসির একটুখানি ঝিলিক! সে জানতো একদিন এমন সর্বনাশ ঘটবেই! সে জানতো একদিন তারই জয় হবে!'

'এসব কি বলছো তুমি? তোমার কথা যে আমি বুঝতে পারছি না।' আকুলভাবে বলে উঠলাম।

'তার নৌকো পাওয়া গেছে।'

'হাঁ, আমি তা জানি। ক্যাপ্টেন সার্লে আমাকে সব বলেছেন। নৌকোর মধ্যে কঙ্কালের কথা ভেবে এমন অস্থির হয়েছ?'

'হাঁ।'

'রেবেকার সঙ্গে সেদিন আর কেউ ছিল। সে কে তাই এখন খুঁজে বের করতে হবে, তাইনা?'

'না, না, তা নয়। তুমি বুঝবে না'……

'কিন্তু আমি তোমার দুশ্চিন্তার অংশ সমানভাবে নিতে চাই। বল, আমাকে সব খুলে বল।'

'রেবেকা সেদিন একাই ছিল। কেউ তার সঙ্গে ছিল না।' আমি তার চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি। আমার সকল অনুভূতি যেন একটু একটু করে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ....

'কেবিনের মেঝেতে যে কংকাল পাওয়া গেছে সেটা রেবেকার।'

"না, না, তা কেন হবে!' আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলাম।

'যাকে সমাধি দেওয়া হয়েছে সে রেবেকা নয়। অজানা, অখ্যাত একটি মেয়ের দেহ সেটা।' সেদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। রেবেকা ডুবে যায়নি। আমি...আমিই তাকে হত্যা করেছি। আমি তাকে সাগর-পারের সেই কুটিরে গুলি করে হত্যা করেছি। তারপর তার দেহ নৌকোর কেবিনে রেখে দরজা জানালা বন্ধ করে সেই নৌকো সাগরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছি। ঐ কঙ্কাল রেবেকার, আর কারও নয়...শোন, আমার চোখের দিকে তাকাও। বল, এখনও কি আমাকে ভালবাস? বল, বল...'

॥ ২০ ॥

চারিদিক নিঝুম, নিথর। ম্যাক্সিমের হাতের ঘড়িটি শুধু আমার কানের কাছে টিক টিক করে বেজে চলেছে। মানুষের কোন অঙ্গ যখন চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায় তখন হয়তো তার কোন অনুভূতি থাকে না, একটু একটু করে সেই চরম অনুভূতি আসতে থাকে। ম্যাক্সিমের বুকে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছি। কিন্তু ব্যথা, বেদনা, ভয়, দুর্ভাবনার সমস্ত

অনুভূতি যেন আমার মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। কোন কিছু চিন্তা করবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। আমার মন নেই, হৃদয় নেই, চেতনা নেই, সমস্ত সত্তা হারিয়ে শূন্য মনে কাঠের পুতুলের মত তার আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে আছি।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম মনে নেই। সহসা সে আমাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে আবেগভরে চুমু খেতে লাগলো। এমন করে আর কোনদিন সে আমায় জড়িয়ে ধরেনি, চুমু খায়নি। দু' হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইলাম। সে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি—সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসি'......

তার মুখ থেকে যে কথাটি শোনবার জন্য এতদিন আমার মন ব্যাকুল হয়ে ছিল সে কথাই সে বলছে। যে কথা শোনবার জন্য আমার সমস্ত অনুপরমাণু দিনরাত উৎকর্ণ হয়ে থাকতো আজ এতদিন পরে আমার প্রিয়তম আমাকে জড়িয়ে ধরে সেই কথাটিই বলছে! চোখ খুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার নাম বলতে বলতে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত সে আমার সর্বাঙ্গে চুমু দিচ্ছে! আমি নিঃসাড় হয়ে তার সেই আকুল আলিঙ্গনের নিবিড় বাঁধনে বন্দী হয়ে আছি। আমার জীবনের পরম লগ্ন আজ এসেছে, আমার কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তবুও আমি এত শান্ত, এত নির্বিকার কেন! ম্যাক্সিম এই প্রথম আমাকে বলছে ভালবাসার কথা, এই প্রথম সমস্ত অন্তর ঢেলে আমাকে আদর করছে তবুও আমি কেন এত নিষ্প্রাণ, এত উদাসীন!

সহসা সে থেমে গেল। আমাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'না, আমারই ভুল হয়েছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে···তুমি এখন আর আমায় ভালবাস না। কেনই বা

ভালবাসবে! সব ভুলে আমিই বাঁধনহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আর এমন হবেনা কোনদিন।'

হঠাৎ যেন এই কঠিন আঘাতে সমস্ত অনুভূতি, চেতনা আবার আমার মধ্যে ফিরে এলো। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে বললাম, 'না, না ওকথা বোল না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আমার জীবনের চাইতেও তোমাকে আমি বেশি ভালবাসি।'

'না, আমাকে তুমি আর ভালবাসতে পার না।'

'না, না, অমন কথা বোল না। আবার তুমি আমায় আদর কর, চুমু দাও, দাও····'

'না, না।'

'এখন আমরা দু'জন দু'জনকে আর হারাতে পারি না। আমাদের দু'জনের মাঝে আর কোন ছায়া নেই, গোপনতা নেই। আমাদের দু'জনের জীবন এক হয়ে মিশে গেছে। এসো, আমার কাছ থেকে এত দূরে সরে থেকো না। এসো।'

'না, আর সময় নেই। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মেয়াদ হয়তো। যা ঘটে গেল তারপর দু'জনে কাছাকাছি হয়ে কি লাভ? তারা তাকে খুঁজে পেয়েছে।'

'তাতে কি হয়েছে? কি করবে তারা?'

'কেবিনের সব কিছুই প্রমাণ করবে যে ঐ কঙ্কালটি রেবেকার। তারপর······তারপর যাকে রেবেকা বলে সমাধি দেওয়া হয়েছে তার কথা তাদের মনে পড়বে।'

'তাহলে তুমি কি করবে?' চুপি চুপি প্রশ্ন করলাম।

'জানি না। কিচ্ছু জানি না।' উদ্‌ভ্রান্তের মত সে উত্তর দিল। লুপ্ত চেতনা, অনুভূতি একটু একটু করে ফিরে আসছে আমার মনে, আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। হাত দু'টো আগের মত আর ঠাণ্ডা

নেই। ম্যাণ্ডারলের পরিচিত অপরিচিত সকল মুখ চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুতের মত এই দুঃসংবাদ ম্যাণ্ডারলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না জানি কী ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করবে! তারা জানবে যাকে রেবেকা বলে সমাধি দেওয়া হয়েছে সে রেবেকা নয়। রেবেকার কঙ্কাল ঐ নৌকোর কেবিনে পাওয়া গেছে। রেবেকা ডুবে যায়নি! ম্যাক্সিম তাকে হত্যা করেছে! সাগরপারের সেই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে তাকে হত্যা করে নৌকোতে তার দেহ বয়ে নিয়ে গিয়ে ম্যাক্সিম সেই নৌকো সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই নির্জন পরিত্যক্ত কুটির, তার ছাদে বৃষ্টির একটানা টুপটাপ শব্দ, একের পর এক ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মণ্টিকার্লোয় একদিন গাড়িতে আমার পাশে বসে সে বলেছিল, 'একবছর আগেকার একটি ঘটনা আমার সমস্ত জীবনকে বদলে দিয়েছে। আবার নূতন করে জীবন সুরু করতে হবে।' তার সে সময়কার নীরবতা, ভাব বৈচিত্র্য, সবই আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে। সে তখন একদিনও রেবেকার নাম উচ্চারণ করেনি! সেই পরিত্যক্ত কুটিরের দিকে যেতে তার আপত্তির অর্থ আজ আর আমার বুঝতে বাকি নেই। সেদিন সে বলেছিল, 'আমার মত অবস্থায় পড়লে তুমিও ওদিকে যেতে চাইতে না।'

রেবেকার মৃত্যুর পর লাইব্রেরি ঘরে তার অশ্রান্ত পায়চারি করবার ছবি আমার মনের আরশিতে পরিষ্কার ভেসে উঠলো। মিসেস ভ্যানহপারের সেই কথা আজও আমার কানে বাজছে, 'লোকে বলে তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর আঘাত সামলে উঠতে পারেননি।' কালকের অভিশপ্ত উৎসবের ঘটনাগুলি পর পর আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভাসতে লাগলো।

'আমি রেবেকাকে হত্যা করেছি। বনের মধ্যে ঐ কুটিরে আমিই তাকে গুলি করে মেরেছি।' ম্যাক্সিমের এই সাংঘাতিক কথাগুলি

আমার মর্মে মর্মে বিঁধে রয়েছে যেন। আমি ব্যাকুলভাবে বলে উঠলাম, 'তা হলে এখন আমরা কি করবো? কি বলবো?' সে কোন উত্তর দিল না। পাথরের নিশ্চল মূর্তির মত শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আবার বললাম, 'আর কেউ জানে?'

'না।'

'আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না?'

'না, শুধু তুমি আর আমি।'

'ফ্র্যাঙ্ক? তুমি ঠিক জান সে কিছু জানে না?'

'কি করে জানবে? সেই দুর্যোগের রাতে আমি ছাড়া আর কেউ বাইরে ছিল না।' সে এবার কপালে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো, আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম। তার হাত দু'খানি মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললাম, 'শোন, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে ভালবাসি। বিশ্বাস কর।' সে এবার আমাকে কাছে টেনে নিয়ে শান্তভাবে আদর করলো। আমার হাতের ওপর তার ঠোঁটের মৃদু পরশ বুলিয়ে দিল। তারপর আমার হাত দু'খানি তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে বলতে লাগল, 'দিনের পর দিন এই চরম সর্বনাশের আশঙ্কা মনের মধ্যে আগলে রাখতে রাখতে আমি পাগল হয়ে যাব ভাবতাম। সেই অভিশপ্ত দিন থেকে কাল পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। সকলের অকৃত্রিম সহানুভূতির উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়েছি। ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি লোকের সামনে শোকের ভান করে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। ডানভারসকে বিদায় করে দেব ভেবেও বিদায় দিতে পারিনি হয়তো সে কিছু সন্দেহ করবে এই ভয়ে। শুধু ফ্র্যাঙ্ক তার আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত আমার পাশে পাশে থেকেছে, আমাকে লক্ষ্য করেছে। সে বলেছে, 'তুমি কিছুদিনের জন্য

বাইরে চলে যাও। এখানকার সব দায়িত্ব আমি নিলাম।' গাইলস, বী আমার জন্য কত ব্যস্ত হয়েছে। বী কেবলই বলতো, 'তোমাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে। ডাক্তার দেখাও।' এভাবে দিনের পর দিন সকলের সহানুভূতি, ভাবনা, ব্যাকুলতা নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। নিজেকে প্রতারণা করে আমি আর সবাইকেও প্রতারিত করেছি প্রতি মুহূর্তে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার সে বলতে আরম্ভ করলো, 'একদিন তোমাকে প্রায় সব বলে ফেলেছিলাম। যেদিন তুমি জেসপারের পেছন পেছন সেই কুটিরের দিকে গিয়েছিলে সেদিন এঘরে বসে তোমাকে সব বলতে যাব এমন সময় ফ্রার্থ চা, খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো।'

'হাঁ, আমার মনে আছে সে কথা। কিন্তু সেদিন কেন বলনি? আরও আগে জানালে এতদিন ধরে আমাদের দু'জনের মাঝে এতখানি ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠতে পারতো না।'

'তুমি কত দূরে দূরে থাকতে! আমার এত কাছে কোনদিন তো আসনি। জেসপারকে সঙ্গে নিয়ে আপন খেয়াল খুশি মত ম্যাণ্ডারলের বনে উপবনে সাগরপারে ঘুরে বেড়াতে। আজকের মত এত কাছে আর কবে এসেছ?'

'তবুও কেন বলনি আমায়? কেন বলনি?'

'ভেবেছি আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি। আমি তোমার চাইতে বয়সে কত বড়। তাই আমাকে তোমার সাথী বলে ভাবতে পারছো না। আমাকে তোমার ভাল লাগে না।'

'তুমি সব সময় রেবেকার কথা ভাবছো একথা জেনেও আমি কেমন করে তোমার কাছে যাব? তুমি এখনও তাকে ভালবাস তা জেনে কেমন করে আমি তোমার ভালবাসা চাইবো?' সহসা আমাকে আকুল ভাবে জড়িয়ে ধরে সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি বলছো তুমি? কি বলছো?'

'তুমি যখনই আমাকে স্পর্শ করতে, আদর করতে আমি ভাবতাম তুমি বুঝি রেবেকার সাথে আমার তুলনা করছো। আমি তোমার পাশে থাকলেও তুমি তারই কথা ভাবছো! রেবেকাই দিনরাত তোমার সমস্ত মন জুড়ে ছিল!' তার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে মনে হোল সে আমার কথা কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। কেন সে অমন করে তাকাচ্ছে! আমি আবার বললাম, 'বল, সত্যি কিনা। যা বলেছি তা ঠিক কিনা।'

'ওঃ ভগবান!' বলে সে আমাকে একটু আমাকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবিরাম পায়চারি করতে লাগলো।

'কি হোল? এরকম করছো কেন?'

এবার সে আমার সামনে এসে উত্তেজিতভাবে বললো, 'তুমি ভেবেছ আমি রেবেকাকে ভালবাসি? তাকে হত্যা করার মূলে তার প্রতি আমার ভালবাসা? ওঃ! শোন, আমি তাকে ঘৃণা করতাম, প্রাণভরে ঘৃণা করতাম। আমাদের বিয়ে প্রথম থেকেই একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। তার মত দুশ্চরিত্রা, কুটিল প্রকৃতির মেয়ে বোধহয় জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এমন কোন অন্যায় কাজ নেই যা সে করতে পারতো না। আমরা কেউ কাউকে ভালবাসিনি, এক মুহূর্তের জন্যও সুখী হইনি। ভালবাসা, কমনীয়তা, শালীনতা, মানুষের এ সমস্ত সহজাত সূক্ষ্ম বোধ ও অনুভূতি এক কণাও তার মধ্যে ছিল না। এক কথায় সে হয়তো স্বাভাবিক মানুষই ছিল না।' আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এসব কি বলছে সে!

'কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল অতুলনীয়। তার সাথে একবার যার পরিচয় হোত সে-ই ভাবতো রেবেকার মত কোমল স্বভাবের সুন্দর এবং গুণী মেয়ে আর একটিও নেই! বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে কি

রকম ব্যবহার করতে হয় তা সে বেশ ভাল করেই জানতো। যাকে যে কথাটি বললে খুশি হবে তাকে ঠিক সেই কথাটি বলতো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হলে এক নিমেষের মধ্যে তোমাদের দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠতো। গান, বাজনা, অঙ্কন বিদ্যা, প্রতিটি বিষয়ে নিখুঁত আলোচনায় তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। তুমিও দু'এক দিনের মধ্যে তার গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে যেতে, তাকে পুজো করতে।' পায়চারি করতে করতে সে বলে চলেছে, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি।

'তাকে বিয়ে করবার পর সবাই বলতো আমার মত ভাগ্যবান পুরুষ জগতে আর নেই। রূপে, গুণে, চালচলনে সে ছিল সত্যি অতুলনীয়। আমার দিদিমা, যাঁকে খুশি করা সত্যি দুঃসাধ্য ছিল, তিনিও প্রথম থেকেই রেবেকার গুণমুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বলতেন, 'আদর্শ স্ত্রীর মধ্যে যে তিনটি গুণ থাকা দরকার রেবেকার তা সবই আছে। বংশ মর্যাদা, বুদ্ধি আর সৌন্দর্য। তোমার ভাগ্যে তাই লাভ হয়েছে।' আমিও তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আমার মনের একান্তে কেমন একটা সন্দেহ উঁকি মারছিল। তার চোখের দৃষ্টিতে আমি কি যে দেখেছিলাম'—

এতদিন মনে মনে রেবেকার যে মূর্তিখানি এঁকে রেখেছিলাম এখন তা প্রাণবন্ত হয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। উদ্দাম গতিতে সে জীবনকে উপভোগ করছে। ঘোড়ায় ছুটছে, নৌকো বাইছে! কত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে। সাগর বেলায় বেচারা বেনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার দিনটির স্মৃতি মনে পড়লো। সেদিন সে বলেছিল, 'আপনি খুব ভাল। তাঁর মত নন। আপনি আমাকে পাগলা গারদে দেবেন না তো? তাঁকে দেখলে সাপের কথা মনে হোত।'

অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে ম্যাক্সিম আবার বলতে লাগলো, 'আমাদের বিয়ের পাঁচ দিন পর আমি তার স্বরূপ, তার সত্যিকারের

প্রকৃতি চিনতে পারলাম। মন্টিকার্লোর সেই পাহাড়ে তোমাকে এক দিন বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম মনে পড়ে? সেদিন পুরানো স্মৃতি মনে করে কয়েকটি মুহূর্ত সেখানে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। হাঁ, বিয়ের পাঁচদিন পর আমরা দু'জনে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। হাসতে হাসতে সে আমাকে সেদিন তার জীবনের যে সব নোংরা কাহিনী শোনালো এ জীবনে আর কাউকে সে সব কথা বলতে পারবো না। তখন বুঝতে পারলাম আমি কী সর্বনাশ করেছি, কাকে বিয়ে করেছি! সৌন্দর্য, বুদ্ধি আর বংশ মর্যাদার বিচিত্র সমাবেশই বটে! উঃ!' কী এক গভীর হতাশা আর বেদনায় এবার সে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। কিছুক্ষণ নীরব, নিস্পন্দ থেকে সহসা সে হাসতে আরম্ভ করলো…অট্টহাসি! তার বুকের জমাট বাঁধা কান্না আর বেদনা যেন এই উদ্দাম হাসির স্রোতে বাঁধনহারা হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। আমি তার এই বুক কাটা হাসি সহ্য করতে না পেরে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলাম, 'এ কি হোল তোমার! এরকম করছো কেন? কি হোল?' কোন উত্তর না দিয়ে হাসি থামিয়ে আমার দিকে সে তাকিয়ে রইলো। একটু পরে আবার বলতে সুরু করলো, 'আমি সেদিনই তাকে মারতে যাচ্ছিলাম। তাহলে খুব সহজেই সব শেষ হয়ে যেত। সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই সব শেষ হয়ে যেত।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে পায়চারি করতে লাগলো। তারপর বললো, 'সেইখানে বসেই সেদিন সে আমার সঙ্গে কয়েকটি সর্ত করলো। বললো, 'আমি তোমার ম্যাণ্ডারলের সব দায়িত্ব নিলাম। তোমার ম্যাণ্ডারলেকে আমি সকল দেশের সেরা, অপূর্ব, সুন্দর, দর্শনীয় করে তুলবো। নানা দেশ থেকে দর্শকেরা আসবে ম্যাণ্ডারলে দেখে তাদের জীবন স্বার্থক করতে। তারা বলবে সমস্ত ইংলণ্ডে আমাদের মত ভাগ্যবান, সুখী, আদর্শ দম্পতি আর একটিও নেই! কেমন মজা, তাই না?' দু'হাত দিয়ে

একটি টাটকা ফুলের কোমল পাপড়িগুলি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে। তার ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপভরা তিক্ত হাসির রেশটুকু লেগেই ছিল। না, আমি তাকে মারলাম না। কোন কথা না বলে শুধু লক্ষ্য করতে লাগলাম তার কথা বলার ভঙ্গি, তার অদ্ভুত সেই হাসি। সে জানতো আমি তার সর্তে রাজী হবো। সে জানতো আমাদের বিয়ে যে একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে সে কথা আমি কাউকে বলতে পারবো না। তার জীবনের যে সব জঘন্য কাহিনী আমাকে সে বলেছে সেসব কথা আমার জীবন গেলেও কার কাছে প্রকাশ করে হেয় হতে পারবো না তা সে বুঝেছিল। আমার অহংকার, আত্মসম্মান সবার ওপরে তা সে জানতো। আমার দুর্বলতা সে ঠিক বুঝে নিয়েছিল। জানতো বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে উপস্থিত হয়ে আমি আমার পরিবারের মর্যাদা, ম্যাণ্ডারলের ঐতিহ্যকে সবার কাছে ছোট করতে পারবো না কোনদিন।'

সহসা সে আমার সামনে এসে দু'হাত বাড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে বললো, 'তুমি আমাকে ঘৃণা কোরছো, তাই না? আমার লজ্জা অপমান ব্যথা তুমি বুঝবে না, বুঝতে পারবে না'—

কোন কথা না বলে তার হাত দু'খানি আমার বুকের ওপর তুলে নিলাম। তার লজ্জা অপমান বেদনার কথা সত্যি আমি ভাবছি না। এখন একটি কথাই শুধু আমার সমস্ত মনকে, আমার সকল ভাবনাকে ছেয়ে রেখেছে। ম্যাক্সিম রেবেকাকে ভালবাসতো না, কখনও ভালবাসেনি! তারা দু'জনে এক মুহূর্তের জন্যও সুখী হয় নি। ম্যাক্সিম অনর্গল বলে যাচ্ছে। তার মনের সকল বোঝা আমার কাছে উজাড় করে দিচ্ছে। আমিও শুনছি কিন্তু এখন সব কথাই যেন বড় অর্থহীন আমার কাছে। সে বলছে, 'আমি ম্যাণ্ডারলের কথাই ভেবেছি। আমার ম্যাণ্ডারলে সবার আগে। তারপর আর সব। ম্যাণ্ডারলে আমার জীবনের

চেয়েও বেশি প্রিয়। এক টুকরো মাটির জন্য, জন্মভূমির জন্য এমন গভীর ভালবাসার মূল্য কেউ দিতে চায় না, কেউ বোঝে না এর কী আকর্ষণ, কতখানি মাধুর্য!'

'আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা, তোমার ব্যথা, বিশ্বাস কর।' তার হাত দু'খানি গভীর আবেগে আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলাম।

'সত্যি? তুমি বুঝতে পারছো আমার ক্ষতবিক্ষত মনের কথা? বুঝতে পারছো?'

'হাঁ, আমি যে তোমায় ভালবাসি।'

আমার মন এখন একটা পালকের মত হালকা হয়ে গেছে। মনের সকল বোঝা এক নিমেষে নেমে গেছে। ম্যাক্সিম কোনদিনও রেবেকাকে ভালবাসে নি! সে আবার বলতে লাগলো, 'পেছনে ফেলে আসা সেই অভিশপ্ত দিনগুলির তিক্ত স্মৃতি আর আমি মনে করতে চাই না। তোমাকে বলতেও সংকোচ হচ্ছে আমার, কী দারুণ লজ্জা, অপমান আর ছলনার ওপর ছিল আমাদের বিবাহিত জীবনের সেই বিষাক্ত ভিত। এত বড় মিথ্যা অভিনয় বুঝি আর কেউ কোনদিন করেনি। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কি চাকর-বাকরদের সামনেও আমাকে মিথ্যার চরম অভিনয় করতে হয়েছে দিনের পর দিন। নিজেকে ঠকিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমি অন্যদেরও ঠকিয়েছি। তারা সবাই তাকে ভালবাসতো, ভক্তি করতো। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল! কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না যাকে তারা প্রাণ ঢেলে ভালবাসছে, শ্রদ্ধা করছে সে-ই আড়ালে তাদের সবাইকে কত ঘৃণা করছে, কত উপহাস করছে, ব্যঙ্গ করছে। ম্যাণ্ডারলেতে তখন একটা না একটা উৎসব লেগেই থাকতো। আমার হাত ধরে সুন্দর মুখে স্নিগ্ধ হাসির প্রলেপ বুলিয়ে সে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাতো। কথার চাতুর্যে, ব্যবহারের মাধুর্যে

সকলকে মুগ্ধ করে ফেলতো। একমাত্র আমিই শুধু বুঝতাম অপরূপ সুন্দর একখানি মুখোসের আড়ালে কতখানি শয়তানি, কতখানি হিংস্রতা আর কুটিলতা আত্মগোপন করে কী নিখুঁত অভিনয় করে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে সে লণ্ডনে চলে যেত। পাঁচ ছ'দিন পর আবার ফিরে আসতো। আমি আমার সর্ত রেখেছিলাম। তাকে তার খেয়াল খুশি মত চলতে দিয়েছিলাম। আজকে যে ম্যাণ্ডারলে দেখছো এর সব কিছু তারই পরিকল্পনা, তারই রুচি মত গড়ে উঠেছে। ম্যাণ্ডারলের বন, বাগান, হ্যাপিভ্যালির এজেলিয়া, সবই তার আপন হাতের সৃষ্টি। আমার বাবার আমলে এসব কিছুই ছিল না। তখনকার ম্যাণ্ডারলে বন্য প্রকৃতির অজস্র সম্ভারে আপন সৌন্দর্যে আপনি পূর্ণ ছিল। রেবেকা প্রকৃতির সেই লীলানিকেতনকে আধুনিক সজ্জায় সাজিয়ে দর্শনীয় করে তুলেছে। ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি ঘরের রূপ বদলে গেছে তার আধুনিক রুচির যাদুস্পর্শে! আজও দর্শকেরা যে সব আসবাবপত্র দেখে মুগ্ধ হয় তার সমস্তগুলিই রেবেকার নির্দেশ মত কেনা হয়েছিল। ম্যাণ্ডারলের আজকের সৌন্দর্য, আজকের খ্যাতির মূলে সবই তার কৃতিত্ব।'

কোন কথা না বলে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আছি। আমি চাই সে এভাবে অবিরাম কথা বলে তার রুদ্ধ মনের সকল বেদনা, যন্ত্রণা আর ঘৃণা আমার কাছে উজাড় করে দিয়ে মনের সকল ভার নিঃশেষে হালকা করে দিক। সে আবার বলতে লাগলো, 'এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মিথ্যা, ছলনা আর প্রবঞ্চনাকে পাথেয় করে আমরা দিন কাটাতে লাগলাম। আমি তার সমস্ত অনাচার সহ্য করলাম শুধুমাত্র ম্যাণ্ডারলের কথা ভেবে। লণ্ডনে গিয়ে সে যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করতো, কিন্তু তাতে আমার ম্যাণ্ডারলের কিছু ক্ষতি হোত না। প্রথম কয়েক বছর সে খুব সাবধানে চলতো। তার

বিরুদ্ধে একটি কথাও কেউ বলবার সুযোগ কোনদিন পায়নি। কিন্তু তারপর একটু একটু করে সে বেপরোয়া হতে লাগলো। মানুষ যেমন করে প্রথম নেশা করে তারপর দিনের পর দিন নেশায় মাতাল হতে আরম্ভ করে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে তেমনি করে রেবেকা উশৃঙ্খলতার দিকে নেমে চললো খেয়াল খুশির পিছল পথ বেয়ে, কোন বাধা নিষেধ মানলো না। সে তার বন্ধুদের এখানে আমন্ত্রণ করে আনতে লাগলো। সাগরপারের সেই কুটিরে মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে পিকনিক, আনন্দ-উৎসব করতে আরম্ভ করলো। একদিন আমি শিকার থেকে ফিরে দেখি ছ'সাত জন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে সেখানে সে আনন্দে মত্ত। এই সব লোকদের আগে কোনদিন দেখিনি। আমি তাকে সাবধান করে দিলাম। কিন্তু আমার কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে একটু হেসে সে বললো, 'আমার যা খুশি করবো। তোমার তাতে কি?' আমি তাকে বললাম এসব বন্ধুদের সঙ্গে সে লণ্ডনে দেখা করতে পারে। কিন্তু ম্যাণ্ডারলে আমার, সম্পূর্ণই আমার। সেখানে এসব অনাচার চলবে না। তার সর্ত সে ভুলে যাচ্ছে একথাও মনে করিয়ে দিলাম। সে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলো। তারপর···হাঁ তারপর সে ক্র্যাঙ্কের দিকে মন দিল। ক্র্যাঙ্কের মত বিশ্বস্ত, লাজুক, সচ্চরিত্র লোক খুব কম আছে। তার মত লোকের দিকেও শয়তানির কুনজর পড়লো। একদিন ক্র্যাঙ্ক আমায় বললো সে আর এখানে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত সে আর গোপন রাখতে পারলো না তার চলে যাওয়ার কারণ। আমাকে সে সব বললো। রেবেকা সব সময় তাকে অনুসরণ করতো, তাকে তার কুটিরে রাত কাটাবার জন্য অনুরোধ করতো। বেচারা ক্র্যাঙ্ক রেবেকার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝতে পারলো না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমরা দু'জনে আদর্শ সুখী দম্পতি! আমি রেবেকাকে এই কথা জানিয়ে আর একবার সাবধান করে

দিলাম। সে তখন রেগে আগুন হয়ে আমাকে যা খুশি কুৎসিত গালাগালি করলো। সে এক নারকীয় দৃশ্য! তারপর দিন সে লণ্ডনে চলে গেল। একমাস পরে ফিরে এসে প্রথম কয়েক দিন একটু শান্ত রইলো। ভেবেছিলাম এবার তার একটু শিক্ষা হয়েছে হয়তো।

'বী আর গাইলস একবার শনি রবিবারের ছুটিতে এখানে থাকতে এলো। বী রেবেকাকে পছন্দ করতো না তা বুঝতে পারতাম। সেদিন গাইলস রেবেকার সঙ্গে নৌকো করে বেড়াতে গেছে। বী আর আমি আঙ্গিনায় বসে আছি। যখন তারা ফিরে এলো গাইলসের ভাব ভঙ্গি আর রেবেকার চটুল চাহনি দেখেই বুঝতে পারলাম রেবেকা এবার গাইলসের দিকে মন দিয়েছে। বীও তাকে লক্ষ্য করছে দেখলাম। আর রেবেকা খাবার টেবিলের সামনে তার সুন্দর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে স্বর্গের অপ্সরীর মত গর্বিত ভাবে বসে আছে।'

আমার এতদিনকার ভুল ধারণা একটু একটু করে ভেঙ্গে যাচ্ছে যে সব ধাঁধার কোন সমাধান না করতে পেরে মনে কত অশান্তি ভোগ করেছি আজ সমস্তই আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুর অর্থ আজ জলের মত তরল হয়ে আসছে। রেবেকার কথা উঠলেই ফ্র্যাঙ্কের অদ্ভুত উদাসীন ব্যবহার, বিয়েট্রিসের এড়িয়ে যাবার ভান, সব কিছুর অর্থ এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তাদের সেই নীরবতা আর ঔদাসীন্যকে আমি আন্তরিক সহানুভূতি আর শোকের প্রকাশ বলে মনে করেছি। রেবেকা সম্বন্ধে তাদের চরম ঔদাসীন্য এবং নির্বিকার ভাবের মূল কারণ যে কতখানি লজ্জা, অপমান আর ঘৃণা আজ তা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পেরে অবাক হয়ে ভাবছি আমার মনে এই সন্দেহ একবারের জন্যও কেন উঁকি মারেনি! শুধুমাত্র লজ্জা

আর সংকোচের জন্যই আমার এতবড় ভুল এতদিন ভাঙেনি। সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর একটা কল্পনা গড়ে তুলে আমার মত চরম অশান্তি জীবনে আর কে কবে ভোগ করেছে? জীবনের সব চেয়ে প্রিয়জনের কাছ থেকে এতদূরে সরে গেছে? লজ্জা, সংকোচ কাটিয়ে একবার যদি আমি তাকে অতীত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতাম তাহলেই সব কথা জানতে পারতাম। আমার বিবাহিত জীবনের মূল্যবান চার পাঁচটি মাস তাহলে এভাবে এক অব্যক্ত অশান্তির মধ্যে বিফলে কেটে যেত না!

ম্যাক্সিম আবার বলছে, 'বী আর গাইলস তারপর থেকে আর একদিনও এখানে রাত কাটায়নি। আমিও তাদের কোনদিন থাকতে বলিনি। বী কোনদিন এবিষয়ে একটি কথাও আমাকে বলেনি। কিন্তু আমার মনে হয় আমার জীবনের এই চরম লজ্জা আর অপমানের কথা কিছুটা সে বুঝতে পেরেছিল। ফ্র্যাঙ্কও হয়তো খানিকটা অনুমান করেছিল। রেবেকা তার চলাফেরা, হাবভাবে আবার কিছুদিনের জন্য একটু সংযত হয়ে রইলো। কিন্তু আমি ম্যাণ্ডারলে থেকে কোথাও বাইরে গেলেই বড় দুর্ভাবনা হোত আমার অনুপস্থিতিতে না জানি কি অঘটন ঘটে যায়। একবার একটা অপবাদ রটনা হলে আমার ম্যাণ্ডারলের সমস্ত গৌরব আর সম্মান যে ধুলায় লুটাবে।'

তার কথা শুনতে শুনতে মনে হোল আমি যেন আবার সেই নিরালা কুটিরটির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। বেনের নির্বোধ চোখের অসহায় দৃষ্টি আর কাতরোক্তি মনে পড়লো। 'আমাকে আপনি পাগলা গারদে দেবেন না তো?' অন্ধকার বনপথে গাছের আড়ালে একটি অভিসারিকা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে! তার পোশাক মৃদু হিমেল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ম্যাক্সিম বলে চলেছে, 'তার দূর সম্পর্কের এক ভাই আমার অনুপস্থিতিতে এখানে আসতে লাগলো। ফ্র্যাঙ্ক তাকে আসতে দেখতো। তার নাম জ্যাক ফ্যাবেল।'

'আমি তাকে চিনি। তুমি যেদিন লণ্ডনে গিয়েছিলে সেদিন সে এসেছিল।'

'তুমিও তাকে দেখেছো? একথা কেন বলনি আমায়? ফ্র্যাঙ্ক আমাকে বলেছিল।'

'আমি তোমাকে ইচ্ছে করেই বলিনি। ভেবেছিলাম তার প্রসঙ্গ তোমাকে রেবেকার কথা মনে করিয়ে দেবে।'

'ওঃ ভগবান! যে কথা দিনরাত কাঁটার মত বিঁধছে সেই কথা মনে করিয়ে দেবার ভয়!' সে আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বললো, 'ফ্যাবেল তার সঙ্গে কুটিরে রাত কাটাতে আরম্ভ করলো। বাড়িতে বলে যেত নৌকো করে সাগরে বেড়াতে যাচ্ছে, রাত্রে আর ফিরবে না। আমি তাকে আর একবার সাবধান করে দিলাম। বললাম ফ্যাবেলকে ম্যাণ্ডারলের ত্রিসীমানায় কোথাও দেখলে আমি তাকে গুলি করে মারবো। লোকটা অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির, অতীত জীবনে তার অনেক কুকীর্তি ছিল। অমন বাজে লোকের দূষিত স্পর্শে আমার ম্যাণ্ডারলে কলুষিত হচ্ছে একথা ভাবতেই আমি পাগলের মত হয়ে যেতাম। তার এতবড় ধৃষ্টতা আমি আর সহ্য করবো না বলে দিলাম। কিন্তু অন্য বারের মত এবারেও সে আমার কথা গ্রাহ্য করলো না। সেই লোকটা প্রায়ই আসতে লাগলো। তারপর একদিন সে লণ্ডনে চলে গেল। কিন্তু সেদিনই আবার ফিরে এলো। আমি সে রাত্রে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে তার ঘরে খাওয়া সেরে সেখানে বসেই কাজ করছিলাম। রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে দেখলাম তার স্কার্ফ, দস্তানা হলঘরের চেয়ারে পড়ে আছে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসলো কেন ভেবে অবাক হলাম। বসবার ঘরে গিয়েও তাকে দেখতে পেলাম না। বুঝলাম এসেই আবার সেই কুটিরে চলে গেছে। এতবড় কেলেঙ্কারি আর যেন সহ্য করতে পারবো না বলে মনে হোল। ভাল হোক মন্দ হোক

একটা মীমাংসা আমাকে করতেই হবে আজ। তাদের দু'জনকেই আজ বন্দুক দেখিয়ে শাসিয়ে দিয়ে আসবো স্থির করে সোজা সেই কুটিরের দিকে চললাম। কেউ জানতে পারেনি আমি কখন বাড়ি ফিরেছি। বাগানের মধ্য দিয়ে বনপথ ধরে চললাম। দূর থেকে জানালা দিয়ে আলোর রেখাও দেখতে পেলাম। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে দেখি রেবেকা একাই শুয়ে আছে। তাকে খুব অসুস্থ, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কেমন যেন অস্বাভাবিক চেহারা। আমি ফ্যাবেলের কথা বলতে আরম্ভ করলাম। সে নীরবে শুনে যেতে লাগলো। আমি বললাম, 'আমাদের দু'জনের এই নারকীয় মিথ্যা প্রবঞ্চনার জীবন আর চলতে পারেনা। তুমি লণ্ডনে যথেচ্ছাচার করতে পার, যে কোন লোকের সঙ্গে থাকতে পার। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এখানে এসব চলবেনা, আজ শেষবারের মত তা জানিয়ে যাচ্ছি।' একমুহূর্ত সে চুপ করে রইলো। তারপর একটু হেসে বললো, 'আমার যদি এখানেই যথেচ্ছাচার করতে ভাল লাগে, তাহলে?' আমি বললাম, 'তোমার জঘন্য ঘৃণিত প্রস্তাবের সর্ত আমি রেখেছি কিন্তু তুমি তা রাখনি। তুমি ভেবেছ আমার ম্যাণ্ডারলেকে নরকে পরিণত করতে পার তোমার খেয়াল খুশি মত, তাই না? অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। এত বড় অনাচারের আজই শেষ।' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে বললো, 'তোমার কথাই সত্যি। এতদিনকার পুরানো জীবনের আজই শেষ হবে। আমার জীবনের নূতন অধ্যায় আজ থেকে সুরু হবে ম্যাক্স।' তাকে অদ্ভুত রুগ্ন আর ফ্যাকাশে মনে হোল। পায়চারি করতে করতে আবার সে বললো, 'কিন্তু ভেবে দেখেছো কি আমার বিরুদ্ধে আইন আদালত করা তোমার পক্ষে কত কঠিন? বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে হলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কি প্রমাণ আছে? তোমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এমনকি চাকর-বাকরেরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আমাদের বিবাহ

সার্থক হয়েছে, আমরা আদর্শ দম্পতি, তাই না? আমার বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও কিন্তু বলবে না।'

'কেন, ফ্র্যাঙ্ক? বিয়েট্রিস? তারা বলবে।' আমি বললাম। উপহাসের হাসি হেসে এবার সে বললো, 'ফ্র্যাঙ্ক কি বলবে? তার অভিযোগের উপযুক্ত প্রতিবাদ করবার মত বুদ্ধি আমার আছে। আর বিয়েট্রিস? ফুঃ! ক্ষণিক মোহের ভুলে যে স্বামী দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে, আদালতে দাঁড়িয়ে তাকে লোকচক্ষে হেয় করবে বিয়েট্রিস? নিতান্ত সাধারণ হিংসুটে স্ত্রীর মত? না ম্যাক্স, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই তুমি দাঁড় করাতে পারবেনা শত চেষ্টা ক ।' আমাকে লক্ষ্য করে সে তেমনি অবজ্ঞার হাসি হাসতে লাগলো। রপর আবার বললো, 'ভুলে যাচ্ছ কেন, ড্যানী আদালতে দাঁড়িয়ে আ সপক্ষে কি না বলতে পারে? তারপর আর সবাই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে জানি আমাদের মত সুখী আর আদর্শ দম্পতি লণ্ডনে আর একটিও নে কে না জানে একথা? তাদের এতবড় বিশ্বাসকে ভাঙ্গতে পার এমন কি প্রমাণ তোমার হাতে আছে?' এবার টেবিলের একপাশে বসে পা দোলাতে দোলাতে সে বলতে লাগলো, 'আমাদের দু' অভি সার্থক নিখুঁত হয়নি? পরস্পরকে ভালবাসার অভিনয় সত্যি আমরা অপূর্ব করেছি, কি বল?' আমার সর্বাঙ্গ জলে পুড়ে যাচ্ছিল। আমি সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সে এবার ফিস ফিস করে বলছে, 'ড্যানী আর আমি এ দু'জনে মিলেই তোমার এই সদিচ্ছাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিতে পারি, তা জান? এমন অবস্থায় তোমায় ফেলবো যে জগতের কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।' সহসা সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললো, 'এখন আমার একটি ছেলে হলে তুমি বা অন্য কেউ কি করে প্রমাণ করবে যে সে তোমারই ছেলে নয়? তোমারই নাম নিয়ে সে এই ম্যাণ্ডারলেতে দিনদিন বড় হয়ে উঠবে! তখন তুমি

কি করবে ? কিছুই করতে পারবে না। তুমি মরে গেলে ম্যাণ্ডারলে তো তারই হবে। তুমি কেমন করে তা বাধা দেবে ? তোমার প্রিয় ম্যাণ্ডারলের জন্য একজন উত্তরাধিকারী তুমিও নিশ্চয় মনে মনে কামনা করছো ? আমার ছেলেকে ঐ বাদাম গাছের তলায় দোলনায় দুলতে দেখলে, আঙ্গিনায় খেলতে দেখলে,হ্যাপিভ্যালিতে প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটতে দেখলে তোমারও কত ভাল লাগবে, তাই না ? তোমারই চোখের সামনে সে বেড়ে উঠবে। তোমার মৃত্যুর পর ম্যাণ্ডারলে হবে আইনত তারই একথা ভেবে তোমার বুক আনন্দে উত্তেজনায় এখনই কি ফুলে ফুলে উঠছে না ?' কথা শেষ করে সে হাসতে আরম্ভ করলো। মনে হোল এই হাসি বুঝি আর থামবে না। একটু পরে বললো, 'কি মজা ! একটু আগে তোমাকে আমি বলছিলাম যে আমার জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হচ্ছে। এখন বুঝতে পারছো তো কেন ওকথা বলেছিলাম ? দেখবে সবাই এ খবরে কত খুশি হবে। তারা বলবে, 'আমরা এই সুখবর পাবার আশাতেই ছিলাম মিসেস ডি উইন্টার।' আমি আদর্শ স্ত্রী ছিলাম, এখন আদর্শ মা হবো। তারা কেউ এজীবনেও বুঝতে পারবে না, জানতে পারবে না'......

'আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে তেমনই মৃদু মৃদু হাসছিল। যখন তাকে মারলাম তখনও সে হাসছিল ! আমি তার বুকে গুলি করলাম। সে প্রথমে পড়ে যায় নি। আমার দিকে তাকিয়ে তেমনই মৃদু হেসে, চোখ দু'টি বড় বড় করে অপলক তাকিয়ে থেকে তারপর মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো'—

ম্যাক্সিম যেন ফিস ফিস করে আপন মনে কথা বলছে। তার হাত দু'খানি বরফের মত ঠাণ্ডা। আমি তার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। ক্লান্ত ভাবলেশহীন স্বরে সে আবার বলতে লাগলো, 'ভুলে গিয়ে-ছিলাম যে মানুষকে গুলি করলে চারদিক রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাকিয়ে

দেখি ঘরময় রক্ত, চারিদিক লালে লাল। সাগর থেকে জল টেনে এনে রক্তের দাগ পরিষ্কার করতে হোল। ঝড়ের বেগে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছিল। কুটিরের জানালাগুলি সেই দমকা হাওয়ায় ঝটপট নড়ছিল। তারপর আমি তাকে নৌকোয় বয়ে নিয়ে গেলাম। তখন রাত প্রায় বারটা। ঘন অন্ধকার চারদিক, তার ওপরে ঝড়ো হাওয়ার কী দাপা-দাপি! তাকে নৌকোর কেবিনের মেঝেয় শুইয়ে দিলাম। তারপর নৌকোর পেছনে ডিঙ্গি নিয়ে স্রোতের উল্টো দিকে নৌকো বেয়ে সাগরের মাঝে পাড়ি জমালাম। প্রবল স্রোতের টানে আর দমকা হাওয়ার দাপটে নৌকো অনেক কষ্টে একটু একটু করে এগিয়ে চললো। ঝাপটা হাওয়ায় পাল ছিঁড়ে গেল। কেবিনের মধ্যে ঢুকে দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে একটা বড় পেরেক দিয়ে নৌকোর তক্তায় তিনটে গর্ত করে কেবিনের দু'টো ছিপি খুলে দিলাম। হু হু করে জল আসতে লাগলো। তারপর ডিঙ্গিতে উঠে নৌকোটাকে ছেড়ে দিলাম। আস্তে আস্তে নৌকোটা ডুবে যেতে লাগলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুদ্বুদের মত সাগরের অতলে মিলিয়ে গেল। যখন ফিরে এলাম তখনও বৃষ্টি পড়ছিল, ঝড়ো হাওয়া মাতামাতি করছিল।'

ম্যাক্সিম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আর কিছু বলবার নেই। বয়ার ওপর ডিঙ্গিটা রেখে আমি অন্ধকার বনপথ ধরে বাড়িতে চলে এলাম। তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। বিছানার ওপর চুপচাপ বসে রইলাম। আমার তখন কোন অনুভূতিই ছিল না। এমন সময় ডানভারস দরজার কড়া নাড়লো। সে রেবেকার জন্য চিন্তা করছিল। আমি তাকে চিন্তা না করে ঘুমোতে যেতে বললাম। তারপর দরজা বন্ধ করে জানালার ধারে বসে বসে সারারাত বৃষ্টির একটানা শব্দ আর উপসাগরের কোলে উত্তাল সাগরের আছড়ে আছড়ে পড়ার কান্নার মত করুণ সুর কান পেতে শুনতে লাগলাম।'

আমি তার ঠাণ্ডা হাত দু'খানি তেমনই শক্ত করে ধরে বসে আছি। দু'জনে অনেকক্ষণ কোন কথা বললাম না। তারপর সে আবার বলল, 'নৌকোটা বেশিদূর নিয়ে যেতে পারিনি বলেই আজ এই অঘটন ঘটলো। ওঃ, কী ভুলই করেছি। আমি জানতাম একদিন এমন সর্বনাশ ঘটবে। সেই মৃতদেহটি সনাক্ত করবার সময় আমার বার বার এই অমঙ্গল আশঙ্কাই হয়েছিল। আমি জানতাম এ শুধু শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করা! জানতাম রেবেকাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। তোমাকে পেয়েও আমার জীবনের অভিশাপ ঘুচলো না। তোমাকে গভীর ভাবে ভালবেসেও আমার সুখ হোল না। রেবেকা জানতো শেষ অবধি তারই জয় হবে। অন্তিম মুহূর্তে তার সেই বিচিত্র হাসি আমি আমরণ ভুলবো না।'

'কিন্তু সে আর নেই। সে এখন তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। তবে কেন এত ভাবছো?' একটু সামলে নিয়ে বললাম।

'তার দেহ কেবিনের মেঝেয় পড়ে আছে। ওটাই আমার কাল।'

'তুমি বলবে ঐ দেহ রেবেকার নয়, অন্য কারও।'

'না, তা হয় না। তার প্রতিটি জিনিস সেখানে পড়ে আছে। পাহাড়ের কঠিন গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকোটি উল্টে যায়নি একথা তারা বুঝবে।'

'তাহলে কি বলবে তুমি?'

'কাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় ডুবুরী আবার নামবে। তারা নৌকো তুলবার ব্যবস্থা করেছে। তাদের সঙ্গে আমিও থাকবো।'

'তারপর? নৌকো তুলে কি করবে তারা?'

'কেরিথে নিয়ে যাবে। একজন ডাক্তার ডাকবে।'

'ডাক্তার? ডাক্তার কি করবে?'

'জানি না।'

'তারা যদি বুঝতে পারে কঙ্কালটি রেবেকার তাহলে তোমাকে বলতে হবে আগের মৃতদেহ তুমি ভুল করে সনাক্ত করেছিলে। বলবে সে সময় তুমি অসুস্থ ছিলে, তোমার মাথার ঠিক ছিল না। তাই অতবড় ভুল হয়েছিল।'

'হাঁ, তাই বলবো।'

'তোমার বিরুদ্ধে তারা কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। সে রাত্রে কেউ তো তোমাকে দেখেনি। তুমি তখন শুতে গিয়েছিলে। সত্যি ঘটনা তুমি আর আমি ছাড়া জগতের আর কেউ জানে না। তাহলে কেন এত ভাবছো?' সে কোন উত্তর দিল না। আমি আবার বললাম, 'তারা ভাববে রেবেকা যখন কেবিনের মধ্যে কিছু একটা আনবার জন্য ঢুকেছিল তখনই পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে বা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় নৌকোটা উল্টে গিয়ে ডুবে গেছে, তাই না?'

'কি জানি! কিছু জানি না। আর কিছু ভাবতে পারছি না আমি। ওঃ!'

সহসা পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠে আমাদের চমকে দিল।

॥ ২১ ॥

ম্যাক্সিম পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমার মনের মধ্যে তখন কেবলই একটা ভাবনা তোলপাড় করছিল। ম্যাণ্ডারলের সকলে এই খবর কি এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে? পাশের ঘর থেকে তার স্বর শুনতে পাচ্ছি। আমার পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠে অসহ্য ব্যথা অনুভব করলাম। ফোনের শব্দ আমার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

হাতে হাত রেখে তারই পাশে স্থির হয়ে বসে তার বুকে মাথা রেখে এতক্ষণ কী এক বিচিত্র স্বপ্নাবেশের মধ্যে ডুবে ছিলাম যেন। তার ফেলে আসা জীবনের দীর্ঘ কাহিনী আমার কানের মধ্য দিয়ে মর্মে গিয়ে বিঁধেছে। মনে হয়েছে আমিও যেন তার সঙ্গে ছিলাম সেই চরম দুর্যোগের রাতে। ছায়ার মত সেদিন তার প্রতিটি কাজে আমিও বুঝি ছিলাম তার সঙ্গী। আমার মনের গহনে আর একটি ভাবনাও অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে। রেবেকাকে সে ভালবাসতো না, কোনদিন ভালবাসেনি! সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করেছে। ভবিষ্যতের সমস্ত দুর্ভাবনা নিয়েও আমার মন এখন কত হালকা হয়ে গেছে। এখন রেবেকাকে ভয় করবার, ঈর্ষা করবার কোন কারণ নেই। আমি তাকে ঘৃণা করতেও পারছি না। তাকে মন্দ জেনেও ঘৃণা করতে পারছি কই! সে আর আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ম্যাণ্ডারলে এখন আমার, সম্পূর্ণ ই আমার। ঐ কুয়াশার মতই ম্যাণ্ডারলের ওপর তার এতদিনকার প্রভাব একনিমেষে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমার শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে সে আর আমাকে অনুসরণ করবে না কোনদিন। ম্যাক্সিম তাকে ভালবাসেনি। তার নাগপাশ থেকে, বিষাক্ত স্মৃতির জালা থেকে আমি চিরতরে মুক্তি পেয়েছি। তাকে আর আমার ভয় নেই। ম্যাক্সিম এখন একান্তই আমার, আমার প্রিয়তম, আমার স্বামী। জীবন সম্বন্ধে আমি আর অনভিজ্ঞ নই। আমাদের সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমরা দু'জনে মিলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, তার ফলাফল একত্রে ভোগ করবো। জগতের কোন শক্তি আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবে না। আমাদের জীবনের কিছুই হারিয়ে যায়নি। আবার আমরা নূতন করে জীবন সুরু করবো, সুখী হবো। না, না, রেবেকার জয় হয়নি। সে পরাজিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে।

ম্যাক্সিম ঘরে ঢুকে বললো, 'কর্ণেল জুলিয়ান ফোন করেছিলেন। ক্যাপ্টেন সার্লের সঙ্গে তিনিও কাল থাকবেন।'

'কর্ণেল জুলিয়ান! কেন, তিনি কেন আসবেন?'

'তিনি যে কেরিথের ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হবে।'

'আর কি বললেন তিনি?'

'কঙ্কালটি কার তা আমি জানি কিনা জিজ্ঞেস করলেন।'

'তুমি কি বললে?'

'বললাম আমি কিছু জানিনা। বললাম রেবেকা একাই নৌকোতে ছিল বলে জানতাম।'

'তিনি আর কি বললেন?'

'বললেন এজকোম্বে গিয়ে সেই মৃতদেহটি সনাক্ত করবার সময় আমার ভুল হওয়া সম্ভব কিনা।'

'ওকথাও বললেন?'

'হাঁ।'

'তুমি কি বললে?'

'বললাম ভুল হতে পারে।'

'তাহলে কাল কর্ণেল জুলিয়ান, ক্যাপ্টেন সার্লে আর একজন ডাক্তার থাকবেন, তাই না?'

'ইন্সপেক্টর ওয়েলসও থাকবেন।'

'ইন্সপেক্টর ওয়েলস! তিনি কেন?'

'কোন মৃতদেহ পাওয়া গেলে তাঁকে থাকতে হয়।' কোন উত্তর না দিয়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। সেও অপলক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো। এবার সে জানালার ধারে সরে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে আগের মতই শাদা শাদা ছেঁড়া মেঘের দল

ভেসে বেড়াচ্ছে। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে। পাশের ঘরে আবার ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠলো। একটিবার আমার দিকে তাকিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে খুব আস্তে আস্তে বললো, 'যা ভেবেছিলাম তাই হোল।'

'কি? কি হোল?' অজানা আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে।

'কাউন্টি ক্রনিক্যালের সাংবাদিক ফোন করে জানতে চাইছিল মিসেস ডি উইণ্টারের নৌকো পাওয়া গেছে কিনা।'

'তুমি কি বললে?'

'বললাম একটা নৌকোর সন্ধান পাওয়া গেছে বটে। তবে সেটা মিসেস ডি উইণ্টারের নাও হতে পারে।' কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বললো, 'আরও জিজ্ঞেস করলো নৌকোর কেবিনের মধ্যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে এ খবর সত্যি কিনা।'

'এরই মধ্যে এত খবর রটে গেল?'

'হাঁ। দুঃসংবাদ হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে। কি করে তাকে বাধা দেবে? কাল সকালের মধ্যেই সবাই জেনে যাবে।'

'তুমি কঙ্কালের কথা কি বললে?'

'আমি কিছু জানিনা বলে দিলাম। কোন পত্রিকায় বিবৃতি দেবনা তাও জানিয়ে দিলাম। আমাকে আর বিরক্ত না করলেই সুখী হবো তাও বলেছি।'

'তুমি তাদের রাগিয়ে দিলে তারা যে তোমার বিরুদ্ধে লিখবে।'

'কি করবো? আমি পত্রিকায় কোন বিবৃতি দেব না। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি বাধ্য নই।'

'কিন্তু তাদের আমাদের স্বপক্ষে রাখা দরকার।'

'না, তার কোন দরকার নেই। যদি আমাকে যুঝতে হয় তাহলে আমি একাই যুঝবো। সংবাদপত্রের সাহায্য, সহানুভূতি আমি চাই না।'

'এখন তাহলে কি করবো আমরা? কাল সকাল পর্যন্ত এরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে শুধু কেবল অপেক্ষা করবো?'

'হাঁ। কিছুই আর করবার নেই।'

তারপর দু'জনে লাইব্রেরিতেই বসে রইলাম। ম্যাক্সিম একটা বই নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো। মাঝে মাঝে মাথা তুলে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছিল পাশের ঘরে আবার ফোন বেজে উঠলো কিনা। খাওয়ার সময় হলে রোজকার মত আমরা খেতে বসলাম। কাল এমন সময়ে সেই অপূর্ব শাদা পোশাকটি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজের বিচিত্র রূপান্তর অবাক হয়ে শুধু দেখছিলাম। সেসব আজ শুধুই দুঃস্বপ্ন, স্মৃতির অপভ্রংশ মাত্র। গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখে ফার্থ আমাদের খাবার পরিবেশন করলো। সেও হয়তো সব জেনেছে। খাওয়া শেষ হলে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসলাম। মেঝের ওপর পায়ের কাছটিতে তার হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছি। একটি কথাও কেউ বলছি না। চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে আমার মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, সোহাগ করে কত কি বলছে। আগের সেই নির্বিকার ম্যাক্সিম এ-তো নয়! সমস্ত অন্তর ঢেলে আমাকে সে আজ আদর করছে। আর আমাদের মাঝে কোন ব্যবধান নেই।...ভাবতে খুব অবাক লাগলো আমাদের ভবিষ্যত এত অন্ধকার, অনিশ্চিত জেনেও কেমন করে এই মুহূর্তে এত গভীর সুখ অনুভব করতে পারছি? এ যেন বিচিত্র এক সুখানুভূতি। নিবিড় সুখের কী এক প্রশান্তি আমার শরীর আর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে! এই পরম অনুভূতিকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধুই সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়।

আমরা দু'জন দু'জনকে আজ কত কাছে, কত নিবিড় করে পেয়েছি, অন্তর দিয়ে অন্তর অনুভব করছি।

পরদিন সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখি কচি সবুজ ঘাসের বুকে বিন্দু বিন্দু শিশির রূপোর কণিকার মত চিকচিক করছে। বাসি গোলাপের পাপড়িগুলি ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে ভিজে মাটির নরম বুকে। হাওয়ায় মাটির সোঁদা ভিজে ভিজে গন্ধের আভাস। হয়তো রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ম্যাক্সিম কখন উঠে চলে গেছে জানতেও পারিনি। রোজকার মত স্নান সেরে ন'টার সময় চা, খাবার খেতে নিচে নেমে এলাম। কালকের উৎসবের জন্য ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে আমার নামে এক গাদা চিঠি এসেছে। দু'একটায় চোখ বুলিয়ে সব চিঠি সরিয়ে রেখে দিলাম। চা খাওয়ার পর বসবার ঘরে গেলাম। জানালাগুলি বন্ধ আছে বলে ঘরের ভেতর কেমন একটা গুমোট ভাব। ঘরে ঢুকেই সব দরজা জানালা খুলে দিলাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকতে ঘরটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। ফুলদানিতে শুকনো ফুলগুলি মেঝের ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। চারদিক অগোছালো, ধুলোময়। ঘণ্টা বাজাতেই একজন পরিচারিকা এলো। গম্ভীরভাবে তাকে বললাম, 'আজ সকালে এ ঘর পরিষ্কার করা হয়নি কেন? জানালাগুলিও খোলা হয়নি। শুকনো ফুলের ঝরা পাপড়িতে মেঝে ভরে আছে।' সে ভয় পেয়ে ক্ষীণ স্বরে বললো, 'আমি এখনই পরিষ্কার করে দিচ্ছি।'

'ভবিষ্যতে এরকম যেন না হয়, বুঝলে?'

'আচ্ছা।' ঘর পরিষ্কার করে, গুছিয়ে সে চলে গেল। কেমন করে এত কড়া কথা বলতে পারলাম তা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আগে তো কোনদিন এ ভাবে জোর দিয়ে ওদের একটি কথাও বলতে পারিনি। লেখবার টেবিলে সেদিনকার খাবার তালিকা রয়েছে। কালকের

অবশিষ্ট কয়েকটি খাবার আজকের তালিকায় রাখা হয়েছে দেখে সেই কয়টি খাবারের নিচে দাগ কেটে রবার্টকে ডাকলাম। রবার্ট এলে তাকে বললাম, 'মিসেস ডানভারসকে এসব খাবার বদলে টাটকা খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে দাও। কালকের বাসি খাবার কেন দিয়েছে?'

'আচ্ছা।'

ম্যাক্সিম এখনও কেন আসছে না! এতক্ষণ কি করছে? দুর্ভাবনায় আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যা-ই ঘটুক, আমাকে এখন শক্ত হয়ে ধীর, স্থির, শান্ত ভাবে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। একটু পরে কে দরজার কড়া নাড়লো।

'কে? ভেতরে এসো।' খাবারের তালিকা হাতে নিয়ে ডানভারস ঘরে ঢুকলো। তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তার চোখের কোলে কালি পড়েছে।

'কি ব্যাপার মিসেস ডানভারস?'

'রবার্টকে দিয়ে এটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন কেন বুঝলাম না।'

'কালকের বাসি খাবার আজ দেবেন না, রবার্টকে তাই বলতে বলেছি। ওগুলো ফেলে দিন। এতদিন এত অপচয় হোল, আজও একটু হলে কিছু ক্ষতি হবে না।' সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কোন উত্তর দিল না। আমি আবার বললাম, 'টাটকা গরম খাবার দেবেন।'

'কিন্তু রবার্টের মারফত এসব নির্দেশ পেতে আমি অভ্যস্ত নই। মিসেস ডি উইন্টার দরকার হলে নিজে আমাকে ফোনে বলে দিতেন।'

'তিনি কি করতেন না করতেন আমার তা জানবার দরকার নেই। আপনার মনে রাখা উচিত যে আমিই এখন মিসেস ডি উইন্টার। আমি যদি রবার্টকে দিয়ে খবর পাঠাবো মনে করি তাহলে তাই করবো।' এমন সময় রবার্ট ঘরে ঢুকে বললো, 'কাউন্টি ক্রনিক্যাল থেকে ফোন এসেছে।'

'বলে দাও কেউ বাড়ি নেই।'

'আচ্ছা।'

ডানভারসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দাঁড়িয়ে আছেন যে! আর কি বলবার আছে?' কোন উত্তর না দিয়ে একভাবে সে দাঁড়িয়েই রইলো দেখে আবার বললাম, 'কিছু বলবার না থাকলে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

'কাউণ্টি ক্রনিক্যাল থেকে ফোন এসেছিল কেন?' গম্ভীর স্বরে সে প্রশ্ন করলো।

'তা আমি কেমন করে জানবো?'

'ফার্থ কেরিথ থেকে শুনে এসেছে মিসেস ডি উইণ্টারের নৌকো পাওয়া গেছে, তা কি সত্যি?'

'জানি না।'

'ক্যাপ্টেন সার্লে কাল এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলেন। ফার্থ শুনে এসেছে ডুবুরী মিসেস ডি উইণ্টারের নৌকো খুঁজে পেয়েছে।'

'হতে পারে। মিঃ ডি উইণ্টার আসলে তাঁকেই এসব কথা জিজ্ঞেস করবেন।'

'তিনি আজ এত ভোরে উঠেছেন কেন?'

'তিনিই তা বলতে পারবেন।' আমার দিকে অপলক তাকিয়ে তেমনই শান্ত স্থির স্বরে আবার বললো, 'নৌকোর কেবিনে নাকি একটি কঙ্কাল পাওয়া গেছে! মিসেস ডি উইণ্টার তো একা ছিলেন। তাহলে ঐ কঙ্কাল কার?'

'আমাকে কেন এ সব প্রশ্ন করছেন? আমি কিছু জানি না।'

'জানেন না?' অবিশ্বাসের তিক্ত হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলো, 'আচ্ছা,

আপনার ইচ্ছে মত খাবারের ব্যবস্থা করবো।' আরও কয়েকটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

না, তাকেও আর আমার ভয় নেই। রেবেকার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতাও নিঃশেষ হয়েছে। আমার কোন ক্ষতিই সে আর করতে পারবে না। কিন্তু কঙ্কালটির সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পেরে সে যদি ম্যাক্সিমের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কি হবে? আবার দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলাম। ম্যাক্সিম এতক্ষণ কি করছে? সংবাদপত্রের সাংবাদিকই বা কেন আবার ফোন করলো?

উঃ! বুকের ব্যথাটা আবার বুঝি টনটনিয়ে উঠলো। স্থির হয়ে একখানে বসে থাকতেও পারছি না। উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালাম। মালিরা এখন বাগানে ঘাস কাটছে, জল দিচ্ছে। না, ঘরের এই চার দেওয়ালের মধ্যেও আর টিকতে পারছি না। ঘর থেকে বেরিয়ে অলিন্দে গিয়ে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগলাম। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় ফার্থ এসে বললো, 'মিঃ ডি উইন্টার ফোন করছেন।' সেই ছোট ঘরে গিয়ে রিসিভারটা তুলতে আমার হাত থর থর করে কাঁপছে। ওদিক থেকে তার গলা ভেসে এলো। 'হাঁ, আমি ম্যাক্সিম, ফ্র্যাঙ্কের এখান থেকে কথা বলছি। শোন, একটার সময় ফ্র্যাঙ্ক আর কর্নেল জুলিয়ানকে নিয়ে খেতে যাব।'

'আচ্ছা।' আমি আবার অলিন্দে এসে ফার্থকে আরও দু'জনের জন্য খাবার তৈরী রাখতে বলে দিলাম। ওখানে কি হোল এখনও কিছু জানি না। ওঃ! সময় যে আর চলে না! অধীর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছি কেবল।

একটা বাজবার কিছু আগে ম্যাক্সিমের সঙ্গে তারা ঘরে ঢুকলো। 'কেমন আছেন মিসেস ডি উইন্টার?' আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত, গম্ভীর স্বরে কর্নেল বললেন। ম্যাক্সিম বললো, 'তোমরা বোস। আমি হাত

ধুয়ে আসছি।' 'আমিও হাত ধুয়ে আসছি', বলে ফ্র্যাঙ্কও চলে গেল। কর্নেল জুলিয়ান আমার পাশে এসে বললেন, 'যে অঘটন ঘটে গেল তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনাদের দু'জনের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।' আমি চুপ করে আছি। একটু পরে তিনি আবার বললেন, 'এক বছর আগে আপনার স্বামী একটি মৃত দেহ সনাক্ত করে ছিলেন বলেই যত সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'কি সমস্যা?'

'আপনি কি সব কথা শোনেন নি?'

'শুনেছি কেবিনের ভেতর একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে।'

'হ্যা। স্বর্গগতা মিসেস ডি উইণ্টারের কঙ্কাল। ডাক্তার ফিলিপ এবং আপনার স্বামী একবার দেখেই তা সনাক্ত করতে পেরেছেন।' ম্যাক্সিম আর ফ্র্যাঙ্ককে আসতে দেখে তিনি চুপ করে গেলেন। ম্যাক্সিম এসে বললো, 'খাবার দেওয়া হয়েছে। চলুন।' আমরা খাবার ঘরে ঢুকলাম। আমার মনটা পাথরের মত ভারি মনে হচ্ছে। ম্যাক্সিমের দিকে তাকাতে পারছি না। ফার্থ আর রবার্ট আমাদের খাবার পরি-বেশন করছে। তারা আবহাওয়ার গল্প করছে। আমি মাঝে মাঝে কর্ণেলের প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ', 'না' বলছিলাম। কখনও আমরা একেবারে নীরবে খেয়ে চলেছি। আমাদের চারজনের মনে একই ভাবনা তখন তোলপাড় করছিল। কিন্তু সে বিষয়ে একটিও কথা বলছি না। কর্ণেল বললেন, 'সেদিনকার উৎসবে সবাই খুব আনন্দ করেছে।'

'সত্যি?' যন্ত্রের মত উত্তর দিলাম।

'হাঁ। এ রকম সর্বাঙ্গ সুন্দর উৎসবের আয়োজন মাঝে মাঝে সত্যি হওয়া দরকার। তাছাড়া এই বিশেষ উৎসবটি এখানকার সবারই খুব প্রিয়। বহুরূপী সাজতে মানুষের খুব ভালই লাগে। কারণ সবার মধ্যেই কিছু না কিছু ছেলেমানুষি আছে।'

আমরা আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। কর্ণেলই আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনি গলফ্ খেলতে জানেন?'

'না।'

'শিখে নিন। আমার বড় মেয়ে এই খেলাটা খুব ভালবাসে। কিন্তু খেলার সঙ্গী খুঁজে পায়না। জানেন, আমার এই মেয়েটি ছেলে হলেই মানাতো। আমার ছেলে আবার একেবারে অন্যরকম। খেলা ধূলোয় তার একদম মন নেই। সে কেবল কবিতা লিখবে। কে জানে, একদিন হয়তো মস্ত বড় একজন কবি হয়ে উঠবে!' ফ্র্যাঙ্ক একটু হেসে বললো, 'ওর মত বয়সে আমিও তো কত অর্থহীন কবিতা লিখেছি। এখন আর লিখিনা।'

'কোথা থেকে তার এই উদ্ভট সখ হোল কে জানে! তার বাবা মা তো কাব্যের ছিঁটে ফোঁটাও বোঝে না।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন। আবার কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। উৎসবের রকমারি সাজ, পূবদেশীয় পোশাক পরিচ্ছদ, আচার নিয়ম, নানা দেশের বিচিত্র খাবারের কথা, এমনি কত কি প্রসঙ্গ যে তিনি একের পর এক আলোচনা করে চললেন তার ঠিক নেই। এভাবে আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফার্থ আর রবার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ কর্ণেল জুলিয়ান ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খেতে বসবার আগে মিসেস ডি উইণ্টারকে বলছিলাম একবছর আগে সেই মৃতদেহটি আপনি সনাক্ত করেছিলেন বলেই যত সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'হাঁ, তা ঠিক।' ম্যাক্সিম শান্তভাবে বললো। ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'তখন ওর মনের অবস্থা যেরকম ছিল তাতে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। ম্যাক্সিম তখন সুস্থ ছিল না।'

'না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম।' ম্যাক্সিম দৃঢ় স্বরে বললো। কর্ণেল

বললেন, 'সে কথা যাক। এখন আপনাকে শুধু বলতে হবে প্রথম সনাক্ত ভুল হয়েছিল। সে বিষয়ে তো আর এতটুকুও সন্দেহ নেই।'

'না।'

'তদন্ত আরম্ভ হলে খবরটা চারদিকে বড় বেশি ছড়িয়ে পড়বে। আপনাদের পক্ষে সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে। অবশ্য এরকম তদন্তে বেশি সময় নেবেনা। আগের সনাক্ত ভুল হয়েছিল তা স্বীকার করে আবার নূতন করে সনাক্ত করা আর মিসেস ডি উইণ্টারের নৌকোটি যে মিস্ত্রী তৈরী করেছিল তার সাক্ষ্য নেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সমস্ত সংবাদ পত্রে এ নিয়ে খুব হৈ হৈ হবে সেটাই বড় খারাপ লাগছে।'

'আর তো কোন উপায় নেই। এসব আমাদের সহ্য করতেই হবে।' স্থিরভাবে ম্যাক্সিম বললো। কর্ণেল আবার বললেন, 'তবে একটা মাত্র সান্ত্বনা এই যে আমরা এখন জানতে পারলাম মিসেস ডি উইণ্টারের অপমৃত্যু খুব আকস্মিকই হয়েছিল। একটু একটু করে ডুবে যাবার মর্মান্তিক কষ্ট তিনি ভোগ করেন নি। সাঁতরে পারে আসবার ব্যর্থ চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়নি। তিনি হয়তো কিছু আনবার জন্য কেবিনের ভেতরে গিয়েছিলেন। তখন দরজার ছিটকিনি পড়ে দরজা আটকে যায় আর হাল ধরবার কেউ না থাকায় দমকা হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোটি তখনি উল্টে যায়! ওঃ কী ভীষণ দুর্ঘটনা!' একটু চুপ করে থেকে তিনি ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার তো মনে হয় দুর্ঘটনার এই একমাত্র কারণ। আপনার কি মনে হয়?'

'হাঁ, আমারও তাই ধারণা।' লক্ষ্য করলাম ফ্র্যাঙ্ক এবার ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে আবার তখনই অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তার সেই চাহনি দেখে বুঝতে পারলাম ফ্র্যাঙ্ক সব জানে! কিন্তু ম্যাক্সিম সেকথা জানে না। আমার সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলো। কর্ণেল তখন

বলে চলেছেন, 'মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে এবং সেই ভুলের মাশুল এভাবেই দিতে হয়। সেই দুর্বার ঝড়ের রাতে উত্তাল সাগরের বুকে ছোট্ট নৌকো খানির হাল ছেড়ে দিয়ে মিসেস ডি উইণ্টারের মত অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমতী মেয়ে কি করে এমন মারাত্মক ভুল করলেন সেটাই ভারি আশ্চর্য।'

ফ্র্যাঙ্ক বললো, 'দুর্ঘটনা এভাবেই ঘটে। যারা অনেক বেশি জানে, বোঝে, তাদেরও ভুল হতে পারে।'

'হাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তিনি নৌকোর হাল ছেড়ে না গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না। আমি তাঁকে কেরিথ থেকে ম্যাণ্ডারলে পর্যন্ত বাইচ প্রতিযোগিতায় কতবার দেখেছি। সামান্য ভুলও তিনি কোনদিন করেন নি। সেই তিনি অজ্ঞ অবোধের মত এত বড় ভুল করলেন কি করে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কর্ণেল আবার বললেন, 'সম্ভব হলে এই তদন্ত বন্ধ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার যে কোন উপায় দেখছি না। আসছে মঙ্গলবার তদন্তের দিন স্থির হয়েছে। শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য যতটুকু না করলে নয় তাই করা হবে। কিছু ভাববেন না। তদন্ত শেষ হয়ে গেলে এসব অপ্রীতিকর ব্যাপার নিঃশেষে ভুলে যাবেন। আচ্ছা, আমি তাহলে আসি আজ। মিঃ ক্রলে আমার সঙ্গে আসবেন নাকি? আপনাকে তাহলে অফিসে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'আচ্ছা, চলুন।' ফ্র্যাঙ্ক আমার কাছে এসে আমার হাতটি ধরে বললো, 'আমি আবার আসবো।'

'আচ্ছা।' আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না। আমার চোখের ভাষা পাছে সে বুঝতে পারে এজন্য অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি সব জেনেছি একথা সে জানুক তা আমি চাইনা। ম্যাক্সিম তাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। সে ফিরে এসে আমার হাত ধরলো। কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। সে-ই প্রথম নীরবতা ভেঙ্গে বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। মন বলছে

সব ঠিক হয়ে যাবে।' কোন উত্তর না দিয়ে শক্ত করে তার হাত জড়িয়ে ধরে রইলাম। সে আবার বলতে লাগলো, 'আমি যা করেছি তার চিহ্নমাত্রও দেহের কোথাও নেই। বুলেট হাড় ভেদ করে যায়নি। ওদের কি ধারণা তুমি তো শুনলে। তদন্তে জুরীরাও তাই বলবে।' আমি এবারও কোন উত্তর দিলাম না। একটু পরে সে আবার বললো, 'কিন্তু আমি শুধু তোমার কথাই ভাবছি। তাকে হত্যা করেছি বলে আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না তোমার কি ক্ষতিই না আমি করেছি! খেতে খেতে সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আর ভাবছিলাম তোমার মধ্যে আমি যা হারিয়েছি তা-ই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ক্ষতি, চরম সর্বনাশ। তোমার চোখের যে সরল সহজ সুন্দর দৃষ্টি আমি ভালবাসতাম তা কোথায় হারিয়ে গেল! আর তা ফিরে আসবে না কোনদিন। আমার জীবনের অভিশপ্ত কাহিনী শুনিয়ে তোমার সেই শিশুর মত সুন্দর সরল দৃষ্টিকে, তোমার ফুলের মত নিষ্পাপ মনকে আমি হত্যা করেছি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে কোথায় তা মিলিয়ে গেল! তোমার বয়সও যেন কত বেড়ে গেছে! ওঃ! আমি কি করেছি, কি হারালাম!'…

॥ ২২ ॥

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ফার্থ যে সংবাদপত্রটি এনে টেবিলের ওপর রাখলো তার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে খবরটি বেরিয়েছে দেখলাম। ম্যাক্সিম তখন সেখানে ছিল না। ফার্থ আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। কি যেন বলতে চায় সে। প্রশ্ন করলাম, 'কিছু বলবে ফার্থ?' ফার্থ একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললো, 'যা শুনছি তা কি সত্যি?'

'হঁ্যা।'

'কেবিনের ভেতরে যে কঙ্কালটি পাওয়া গেছে তা স্বর্গগতা মিসেস ডি উইন্টারের, তাতে কি কোন সন্দেহ নেই?'

'না। সে বিষয়ে সবাই একমত হয়েছে ফার্থ।'

'কিন্তু আমাদের সবার কাছেই এটা খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে যে মিসেস ডি উইন্টারের মত অভিজ্ঞ লোক ওভাবে কেবিনের মধ্যে আটকে পড়বেন! নৌকো চালাতে তাঁর মত পারদর্শী খুব কমই দেখা যায়।'

'হ্যাঁ, আমরাও তাই ভাবছি। কিন্তু দুর্ঘটনা তো এভাবেই ঘটে।'

'আচ্ছা, কোন তদন্ত হবে কি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদেরও কি সাক্ষ্য দিতে হবে?'

'কি জানি। তাতো বলতে পারছি না।'

'আমি এই পরিবারের জন্য যে কোনভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, মিঃ ডি উইন্টারও সেকথা জানেন।'

'হ্যাঁ ফার্থ, আমরা তা জানি।'

'মিসেস ডানভারস এই খবর শুনে খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। সেই যে খেয়ে দেয়ে ওপরে চলে গেছেন আর নিচে নামেন নি। এলিস বললো তাঁকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'এলিসকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাও তাকে আর নিচে নামতে হবে না। আমিই সব দেখাশুনো করতে পারবো।'

'আচ্ছা। আমার মনে হয় এই সংবাদে তিনি মনের দিক দিয়ে খুব আঘাত পেয়েছেন। তিনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, অদ্ভুতভাবে ভক্তি করতেন কিনা।'

'হ্যাঁ, তা জানি।'

ফার্থ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি তাড়াতাড়ি পত্রিকাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্রথম পাতায় বড় পঙ্ক্তিতে খবরটা ছাপানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ম্যাক্সিমের অস্পষ্ট একখানি ছবিও তুলে দিয়েছে। বোধহয় পনের বছর আগেকার ম্যাক্সিমের ছবি। ছবিখানি আমার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছে। খবরের মাঝে আমার কথাও তারা লিখেছে। ম্যাক্সিম দ্বিতীয়বার কাকে বিয়ে করেছে, কবে ক্যান্সিড্রেসবলের আয়োজন করেছে সে সব কথা কত বিন্যাস করে লিখেছে! রেবেকার অতুলনীয় সৌন্দর্য, চাতুর্য আর মধুর ব্যবহারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তারা লিখেছে ম্যাণ্ডারলের প্রতিটি লোক তার গুণমুগ্ধ ছিল, তাকে গভীরভাবে ভালবাসতো। তারপর মাত্র একবছর আগে কি ভীষণ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সে সাগরে ডুবে মরেছে এবং এক বছর যেতে না যেতেই ম্যাক্স ডি উইণ্টার আবার বিয়ে করে এনে তারই সম্মানে ম্যাণ্ডারলের নাচের উৎসবের আয়োজন করতে দ্বিধা করলেন না! সেই উৎসবের পরদিনই সকালবেলা তাঁর প্রথমা স্ত্রীর দেহ সাগরগর্ভে নৌকোর কেবিনে পাওয়া গেল। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এভাবে সাংবাদিকরা সাধারণ লোককে আকর্ষণ করবার জন্য, রসালো করবার জন্য সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে অদ্ভুত এক কাহিনী তৈরী করেছে। ম্যাক্সিমকে সকলের চোখে হেয় করবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি তারা করেনি। পত্রিকাটি গদির নিচে লুকিয়ে রাখলাম।

সকালবেলা চা খেতে বসে লক্ষ্য করলাম ম্যাক্সিম কাগজ পড়তে পড়তে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা কাগজ দেখতে লাগলো একটি কথাও না বলে। আমার দিকে একবার তাকালো। তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'ওগুলো পড়ছো কেন? এসো, আমার কাছে এসো।'......

একটু বেলা হলে ফ্র্যাঙ্ক এলো। তাকেও বড় ক্লান্ত, ফ্যাকাশে

দেখাচ্ছে। মনে হোল সেও রাতে ঘুমোতে পারেনি। ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'এক্সচেঞ্জে জানিয়ে দিয়েছি ম্যাণ্ডারলের সব ফোন যেন অফিস মারফত দেওয়া হয়। তোমাদের কেউ বিরক্ত করে আমি তা চাই না। কিছুক্ষণ আগে মিসেস লেসি ফোন করেছিলেন। তিনি আসতে চাইছেন।'

'ওঃ ভগবান!' ম্যাক্সিম বলে উঠলো।

'না, না, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তাঁকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি এখন এখানে এসে কোন লাভ নেই। তদন্ত কবে হবে জানতে চেয়েছিলেন। বলে দিয়েছি কিছু ঠিক নেই। কাগজে সব খবর পড়ে তিনি খুব মুসড়ে পড়েছেন।'

'সাংবাদিকরাই আমার সর্বনাশ করলো,' ম্যাক্সিম হতাশ হয়ে বলে উঠলো।

'ওদের কাগজের কাটতি হবে বলে এই ব্যাপারটা নিয়ে ওরা এত মাতামাতি করছে। এসব নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা। তুমি শুধু মনে রেখো তদন্তের সময় কি বলবে।'

'কি বলবো আমি তা জানি।'

'এই তদন্তের করোনার বুড়ো হোরিজ অবান্তর প্রশ্নবাণে তোমাকে আবার দিশেহারা না করে দেন।'

'কি বলছো তুমি! দিশেহারা হবো কেন?'

'ওদের অসঙ্গত জেরায় অনেক সময় মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। তাই বলছি করোনারকে রাগিয়ে দিয়ে তাঁকে তুমি শত্রু করে তুলবে না, তোমার কাছে আমার এইটুকুই অনুরোধ ম্যাক্সিম।'

আমি বললাম, 'উনি খুব ঠিক কথাই বলেছেন। তোমাকে খুব ধীর, স্থির, শান্ত হয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।' আমি ফ্র্যাঙ্কের চোখের দিকে তাকাতে সাহস করছি না। এবার আমার দৃঢ় ধারণা হোল সে

সবই জানে। প্রথম থেকেই সব জানে। তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হওয়ার দিনটির কথা আজ মনে পড়ছে। খেতে বসে বিয়েট্রিস সেদিন ম্যাক্সিমের স্বাস্থ্যের কথা তুললে ফ্র্যাঙ্কই তখন সেই আলোচনার মোড় ফেরাবার জন্য অন্য প্রসঙ্গ তুলেছিল। ম্যাক্সিমের অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্ন উঠলে সে কত কৌশলে তাকে জবাব দেবার দায় থেকে বাঁচিয়ে দিত! রেবেকার কথা তুললে তার অসহজ, সংকুচিত ভাবটি আজও মনে পড়ে হাসি পায়। আজ তার অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আর কোন আবরণ নেই। ফ্র্যাঙ্ক যে প্রথম থেকেই সব জানে ম্যাক্সিম তা জানে না।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই। মঙ্গলবার পর্যন্ত শুধুই অপেক্ষা, বসে বসে অধীর মুহূর্ত গোনা! ডানভারসকে আর দেখিনি। ক্যারিসকে জিজ্ঞেস করে জানলাম সে আগের মতই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আজকাল কারও সঙ্গে কথা বলে না। ক্ল্যারিসের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম আমার কাছ থেকে কিছু জানবার জন্য তার অসীম কৌতূহল। রান্নার মহলে ওরা এই একটি বিষয় নিয়েই বোধহয় সব সময় আলোচনায় মত্ত থাকে। ম্যাণ্ডারলের সর্বত্র এই এক আলোচনা, কেরিথেও নিশ্চয় তাই। আমরা এ কয়দিন কোথাও বের হলাম না। মেঘলা দিনের অসহ্য গুমোটে প্রাণ আরও হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো। বৃষ্টি আসি আসি করেও আসছে না। মঙ্গলবার বেলা দু'টোয় তদন্তের সময় ঠিক হয়েছে শুনলাম।

তারপর সেই অবাঞ্ছিত দিনটিও ভোর হোল। ফ্র্যাঙ্ক এলো। বিয়েট্রিস ফোন করেছে সে আসতে পারবে না। রোজার হাম নিয়ে বাড়ি এসেছে। তাই তারা কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না। এটা আমাদের সৌভাগ্যই মনে হোল। জীবনে এই প্রথমবার হামের মত

বিশ্রী রোগকেও প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম। সহজ, সরল বিয়েট্রিস এ সময়ে কাছে থাকলে কোনদিক চিন্তা না করে একের পর এক কত কি প্রশ্ন করতো। ম্যাক্সিমের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। খুব তাড়াতাড়ি কোন মতে আমরা খেতে লাগলাম। কেউ কোন কথা বলছি না। আমার বুকের সেই ব্যথা আবার সুরু হয়েছে। কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গলা দিয়ে খাবার নামতে চায় না। খাওয়ার এই প্রহসন শেষ হলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম. ম্যাক্সিম উঠে গাড়ি বের করতে চলে গেল। গাড়ির শব্দে আমার চেতনা হোল এখন তো আমাদের যেতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। ম্যাণ্ডারলের চার দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে আর বসে থাকলে চলবে না। ফ্র্যাঙ্ক তার গাড়িতে আমাদের পেছনে আসছে। ম্যাক্সিমের পাশে বসে তার হাঁটুতে আমার হাতখানি রেখে চুপ করে বসে আছি। তাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। আমার হাত পা ঠাণ্ডা অবশ হয়ে আসতে লাগলো। বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করছে।

কেরিথের দু' মাইল দূরে লেনিয়নে তদন্ত কমিটি বসবে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম ডাক্তার ফিলিপ, কর্নেল জুলিয়ানের গাড়িও একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আরও অনেক গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। একজন পথিক ম্যাক্সিমের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার আর একজনকে আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিল। ম্যাক্সিমকে বললাম, 'আমি এখানেই বসে থাকবো। ভেতরে যাব না।'

'একেবারে না আসলেই ভাল করতে।'

'না, তা হয় না। এখানে বসে থাকতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

ফ্র্যাঙ্ক আমার সামনে এসে বললো, 'আপনার জন্য বসবার জায়গা রাখবো। পরে যদি ইচ্ছে হয় আসবেন।' তারা চলে গেল। আমি

চুপচাপ বসে আছি দোকানপাট তখনও সব খোলেনি। রাস্তায় লোকজন বিশেষ ছিল না। মুহূ   পর মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছে।........

কতক্ষণ একলা এভাবে বসেছিলাম মনে নেই। সহসা মনে হোল ওরা এখনও আসছে না কেন! এত দেরি হচ্ছে কেন? গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম একজন পুলিশ আমাকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখছে। তাকে এড়াবার জন্য পাশের গলিতে ঢুকলাম। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন আদালতের সামনে এসে পড়েছি লক্ষ্য করিনি। ভেতরে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। কোথা থেকে একটি পুলিশ এসে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি চান?'

'কিছু না।'

'এখানে তো দাঁড়াবার নিয়ম নেই।'

'ও, আচ্ছা।' বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। পুলিশটি কাছে এসে আবার প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি মিসেস ডি উইণ্টার?'

'হাঁ।'

'তাহলে আপনি এখানে থাকতে পারেন। পাশের ঘরে গিয়ে বসতেও পারেন।'

'আচ্ছা, চল।' সে আমাকে পাশের ছোট ঘরে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট কেটে গেল। কিন্তু এখানে এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যেন আরও কষ্টকর! বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম, পুলিশটি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে প্রশ্ন করলাম, 'আর কতক্ষণ তদন্ত চলবে?'

'আমি জেনে আসছি,' বলে সে ওদিকে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললো, 'আর বেশিক্ষণ নেই। মিঃ ডি উইণ্টারের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন সার্লে, ডুবুরী, ডাক্তার, সবারই সাক্ষ্য নেওয়া হয়ে গেছে। একজন শুধু বাকি আছে, সে হোল কেরিথের

নৌকোর মিস্ত্রী ট্যাব। আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। দরজার সামনেই একটা খালি চেয়ার আছে।'

ম্যাক্সিমের সাক্ষ্য শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন আর আমার ভেতরে ঢুকতে আপত্তি নেই। ভেতরে ঢুকে দরজার সামনে চেয়ারে বসে পড়লাম। ম্যাক্সিম আর ফ্র্যাঙ্ক ঘরের অপর প্রান্তে বসে আছে। দোহারা চেহারার গম্ভীর ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিই বুঝি করোনার। আড়চোখে আমি অন্যদেরও দেখতে চেষ্টা করছি। কত লোক বসে আছে। এদের কাউকে আমি চিনি না। সহসা আমার দৃষ্টি এক জায়গায় পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। মিসেস ডানভার্স বসে আছে! তার পাশে জ্যাক ফ্যাবেল! গালে হাত দিয়ে সে একদৃষ্টে করোনারের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকে এ জায়গায় দেখবো ভাবতেই পারিনি। জেমস ট্যাব তখন কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে করোনারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

'হাঁ, স্যার, আমিই মিসেস ডি উইন্টারের নৌকো তৈরী করে দিয়েছিলাম।'

'নৌকোটি সাগরে ভাসবার উপযুক্ত ছিল কি?'

'হাঁ, সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। পুরো চার বছর তিনি সেটা ব্যবহার করেছেন।'

'কোনদিন কি সেটা উল্টে গিয়েছিল?'

'না স্যার। তাহলে তিনি আমাকে খবর দিতেন। সমস্ত দিক দিয়েই নৌকোটি তার মনমত হয়েছিল একথা তিনি আমাকে অনেকবার জানিয়ে ছিলেন।'

'আচ্ছা, সাগরে নৌকো চালাতে হলে খুব সাবধান হতে হয়, তাই না?'

'হাঁ, সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর নৌকোটি অন্য সব নৌকোর মত সাধারণ খেলো নৌকো ছিল না যার হাল কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে গেলেই

কোন বিপদ ঘটতে পারে। উত্তাল সাগরের ঝড় ঝাপটা সহ্য করবার মত যথেষ্ট মজবুত ছিল। সেই ঝড়ের রাতের চেয়েও অনেক বেশি দুর্যোগের রাতে তিনি সেই নৌকো সাগরে ভাসিয়েছেন। সেদিনকার সেই সামান্য ঝড়ে তাঁর নৌকো ডুবে যাবে একথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না স্যার।'

'কিন্তু তিনি কোন জিনিস আনবার জন্য কেবিনের মধ্যে ঢুকলে তখন যদি প্রবল ঝড়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোটি উল্টে গিয়ে থাকে?'

জেমস ট্যাব মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'না, না, তা হতে পারে না।'

'কিন্তু তাছাড়া আর কি ঘটতে পারে? অবশ্য মিঃ ডি উইণ্টার বা আমরা কেউ এই দুর্ঘটনার জন্য তোমাকে দায়ী করছি না। নৌকোটি সাগরে ভাসাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলেই মিসেস ডি উইণ্টারকে তুমি জানিয়েছিলে একথাটুকু শুধু তোমার কাছ থেকে জানতে চাই। ক্ষণিকের অসাবধানতা আর ভুলের জন্য মিসেস ডি উইণ্টার এই ভীষণ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। এরকম দুর্ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে। এজন্য তোমাকে এতটুকুও দোষ দেওয়া হচ্ছে না মনে রেখো।'

'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার আরও কিছু বলবার আছে স্যার।'

'বেশ তো, বল।'

'গেল বছর সেই ভীষণ দুর্ঘটনার পর কেরিথে অনেকে আমার কাজ সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিল। কেউ কেউ বলেছে নৌকোটা একদম বাজে ছিল বলেই তিনি জীবন হারালেন। এজন্য আমি কয়েকটি অর্ডারও হারিয়েছিলাম। নৌকো ডুবে যাওয়ায় আমার দিক থেকে কিছু বলবারও ছিল না। তারপর ঐ জাহাজটা তীরে ধাক্কা খেল এবং তাঁর সেই ছোট্ট নৌকোটি সাগর গর্ভে পাওয়া গেল আপনারা

জানেন। ক্যাপ্টেন সার্লে কাল আমাকে নৌকোটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। নৌকো সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক তা প্রমাণ করবার জন্যই আমি বিশেষ ভাবে সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'পরীক্ষার পর তোমার কি ধারণা হোল?'

'নৌকোটির কোথাও কোন গোলমাল ছিল না। এক বছর সাগরের গভীরে বালুর ওপরেই ওটা শুয়ে আছে। জলের নিচে প্রবাল পাহাড়ের সারিতে একবারের জন্যও ধাক্কা খায়নি, নৌকোর গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন না দেখে তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।' এবার সে একটু থামলো। করোনার তার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এই তোমার বক্তব্য?'

'না স্যার, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। আমি আরও কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। নৌকোর তক্তাতে কে গর্ত করলো? প্রবাল পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সেই গর্তগুলি হয়নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পাহাড়ের সারি ছিল নৌকো থেকে প্রায় পাঁচ ফুট দূরে। তাছাড়া ধাক্কা লেগে যে রকম গর্ত হয় ওগুলো ঠিক সে রকম নয়। বড় পেরেক দিয়ে গর্তগুলি করা হয়েছে।' তার দিকে আর তাকাতে পারছি না। মেঝের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছি। করোনার কোন কথা বলছেন না কেন? কেন তিনি এতক্ষণ নীরব আছেন? তারপর যখন কথা বললেন মনে হোল অনেক দূর থেকে তাঁর স্বর ভেসে আসছে।

'কি বলতে চাও তুমি? কিসের গর্ত ওগুলো?'

'নৌকোর তক্তায় সব শুদ্ধ তিনটে গর্ত করা হয়েছে। নৌকোর ভারত্তোলন যন্ত্রটা খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ছিপিগুলিও খুলে দেওয়া হয়েছিল।'

'ছিপি? সে আবার কি?'

'স্নানের ঘরের বেসিন আর পায়খানার সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ রাখবার জন্য যে পাইপ লাগানো রয়েছে তারই মুখে ছিপি দেওয়া আছে। একটি ছিপি বেসিনের মুখে, আরেকটি পায়খানার নলের মুখে। নৌকো চালাবার সময় এই দু'টো ছিপি শক্ত করে বন্ধ করে দিতে হয়, না হয় জল এসে নৌকো ভরতি হয়ে যাবে। কাল পরীক্ষার পর দেখলাম দু'টো ছিপিই খোলা রয়েছে।'

.........ওঃ কী ভয়ানক গরম বোধ হচ্ছে! কেন ওরা সব জানালা খুলে দিচ্ছে না? আর কিছুক্ষণ এই ঘরের মধ্য থাকলে আমি যে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব! আমার মাথা ঘুরছে.......কিন্তু তবুও শুনতে পাচ্ছি সে কি বলছে।

'নৌকোর তক্তায় ঐ তিনটে গর্ত আর ছিপি দু'টো বন্ধ না থাকলে ছোট্ট নৌকোখানির ডুবে যেতে বেশি সময় লাগতে পারে না। বোধহয় মাত্র দশ মিনিট সময়ই যথেষ্ট। গেল বছর নৌকোটি পরীক্ষা করবার সময় সে গর্ত আমি দেখিনি। সুন্দর ছোট্ট সেই নৌকোটি তৈরী করে আমি খুব গর্ব বোধ করতাম। মিসেস ডি উইণ্টারও খুশি হয়েছিলেন। আমার দৃঢ় ধারণা এবং বিশ্বাস নৌকোটি উল্টে যায়নি। ইচ্ছে করে ওটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আমি আর থাকতে পারছি না। ঘরে যে এতটুকুও বাতাস নেই! সবাই কি এত কথা বলছে গুনগুন করে! কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন! 'ওঃ কী অসহ্য গরম। শুনতে পাচ্ছি করোনার সবাইকে চুপ করবার জন্য বলছেন। তারপর মিঃ ডি উইণ্টার বলে কি বললেন। ম্যাক্সিম উঠে দাঁড়ালো। আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না। সহসা নূতন করে আমার মনে পড়লো ডানভারস যে সব শুনছে! না, না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে যেন! অনেক দূর থেকে কাদের কথা ভেসে আসছে আমার কানে।

'মিঃ ডি উইণ্টার, জেমস.ট্যাব কি বললো সব শুনলেন। নৌকোর তক্তায় ঐ গর্তগুলোর বিষয় আপনি কিছু জানেন?'

'না।'

'কি উদ্দেশ্যে ওগুলো করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'কিছু বুঝতে পারছি না।'

'এই প্রথম আপনি একথা শুনলেন?'

'হাঁ।'

'এই খবরটি শুনে আপনি নিশ্চয় খুব আঘাত পেয়েছেন?'

'এক বছর আগে আমি যে সনাক্ত করেছিলাম তা ভুল জেনে আজ সহসা আরও জানতে পারলাম আমার স্বর্গগতা স্ত্রী শুধু যে নৌকো ডুবি হয়ে মারা গিয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর নৌকোটি ডুবিয়ে দেবার জন্য কেউ এসব ষড়যন্ত্র করেছিল, এ সমস্তই কি আমাকে আঘাত দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আপনার এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।'

এসব কি বলছে সে? করোনারকে রাগিয়ে দিচ্ছে কেন! ওগো, না, না, এভাবে রাগ করে কথা বোলনা। আর তোমার শত্রু সৃষ্টি কোরনা। ওঃ ভগবান! ওকে মেজাজ স্থির রাখবার মত সুবুদ্ধি দাও, ওকে শান্ত করে দাও।

'মিঃ ডি উইণ্টার, আমি চাই আপনি বিশ্বাস করুন আপনার ওপর আমাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে। এই আকস্মিক ঘটনায় আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন তাতে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। আপনার জন্যই আমাকে এই তদন্তের আয়োজন করতে হয়েছে। কি ভাবে কোন্ কারণে তিনি অপঘাতে প্রাণ হারালেন তা পরিষ্কার করবার জন্যই আমি আপনাকে সাহায্য করছি মাত্র। আমার নিজের খেয়াল খুশি মেটাবার জন্য তো আমি এই তদন্ত আরম্ভ করিনি! জেমস ট্যাব তার বিবৃতিতে যা বলেছে আপনি কি তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করছেন?'

'না।'

'মিসেস ডি উইণ্টারের নৌকো কে দেখাশুনো করতো?'

'তিনি নিজেই দেখাশুনো করতেন।'

'নৌকোটিকে ম্যাণ্ডারলের পোতাশ্রয়ে নঙ্গর করে রাখা হোত?'

'হাঁ।'

'ওদিকটায় সাধারণ লোকের জন্য পথ আছে কি?'

'না। ওদিকে সাধারণ লোক যেতে পারে না।'

'ম্যাণ্ডারলের পোতাশ্রয়টি খুব নির্জন এবং গাছপালা দিয়ে নিবিড় ভাবে ঘেরা রয়েছে, তাই না?'

'হাঁ।'

'কেউ লুকিয়ে সেখানে গেলে তাকে না দেখতে পাওয়াই বোধ হয় সম্ভব?'

'হাঁ।'

'কিন্তু ট্যাব যা বললো তা অবিশ্বাস করারও কোন কারণ আমরা দেখছি না। গর্ত করে ছিপি খুলে দিলে নৌকোটি দশ কি পনের মিনিটের মধ্যেই ডুবে যাবে।'

'হাঁ।'

'নৌকোর তক্তায় আগে থেকে গর্ত করে সেটা ডুবিয়ে দেবার ষড়-যন্ত্রের ধারণা তাহলে বদলাতে হচ্ছে। কারণ তাই যদি হোত তাহলে নৌকো যেখানে নঙ্গর করে ছিল সেখানেই ডুবে যেত।'

'হাঁ।'

'তাহলে এই ধারণায় আসতে হচ্ছে যে ঐ দুর্যোগের রাতে যে নৌকোটি সাগরে নিয়ে গিয়েছিল তার পক্ষেই ঐ গর্তগুলি করা এবং ছিপি খুলে দেওয়া সম্ভব।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'আপনি আমাদের বলেছেন কেবিনের দরজা জানালা শক্ত করে বন্ধ ছিল এবং মেঝেতে মিসেস ডি উইণ্টারের মৃত দেহ পড়ে ছিল। ডাক্তার এবং ক্যাপ্টেন সার্লের বিবৃতিতেও তাই বলা হয়েছে।'

'হাঁ।'

'তারপর আরও জানা গেল একটা বড় পেরেক দিয়ে আঘাত করে করে গর্তগুলি করা হয়েছে। এই সংবাদটি আপনার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকছেনা কি?'

'হাঁ।'

'এবিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য নেই?'

'না।'

'মিঃ ডি উইণ্টার, এবার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নিছক কর্তব্যের খাতিরে করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'করুন।'

'স্বর্গগতা মিসেস ডি উইণ্টার এবং আপনার মধ্যে সম্পর্কটা কিরকম ছিল? আপনারা আদর্শ সুখী দম্পতি ছিলেন কি?'……উঃ! আমার চোখের সামনে কালো কালো ওগুলো কি নাচছে! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? চারদিক আঁধার হয়ে আসছে·····কোথায় চলে যাচ্ছি আমি···ঐ যে মেঝে আমার কাছে এগিয়ে আসছে···কি হোল আমার····

একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসবার আগে ম্যাক্সিমের স্পষ্ট দৃঢ় স্বর শুনতে পেলাম, 'আমার স্ত্রীকে কেউ বাইরে নিয়ে যান। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে···'

॥ ২৩ ॥

আমি আবার পাশের সেই ছোট ঘরে বসে আছি। পুলিশটি আমার সামনে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে যেন আমার হাত ধরে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি ফ্র্যাঙ্ক। একটু একটু করে আমার চোখের সামনে সব স্পষ্ট হয়ে আসছে। ক্ষীণস্বরে বললাম, 'ওঘরে অসহ্য গরম লাগছিল, তাই'— ফ্র্যাঙ্ক আমাকে বাধা দিয়ে চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করলো, 'এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন তো ?'

'হাঁ। আপনি যান। আমার কাছে আর থাকবার দরকার নেই।'

'আমি আপনাকে ম্যাণ্ডারলে পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

'না, না।'

'হাঁ, ম্যাক্সিম বলেছে।'

'না। তার কাছে আপনার থাকা দরকার।'

'কিন্তু সে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।' চেয়ার থেকে ওঠবার জন্য হাত ধরে সে আমাকে সাহায্য করলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললাম, 'এখন বেশ ভাল বোধ করছি। আমি তার জন্য অপেক্ষা করবো।'

'তার অনেক দেরি হতে পারে।' ফ্র্যাঙ্ক আমাকে হাত ধরে আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে নিয়ে চলেছে। ম্যাক্সিমের দেরি হবে কেন ? ফ্র্যাঙ্ক কেন ওকথা বললো ? দুর্ভাবনায় আবার অসুস্থ মনে হচ্ছে। আমাদের গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ম্যাণ্ডারলের দিকে। নীরবতা ভেঙ্গে এক সময় বললাম, 'দেরি হবে কেন ? কি করবে ওরা ?'

'আবার নূতন করে সাক্ষ্য নিতে পারে।'

'সবার সাক্ষ্যই তো শেষ হয়েছে। আবার কে বলবে ?'

'করোনার আবার নূতনভাবে জেরা করতে পারেন। ট্যাবের সাক্ষ্য সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে। তাই হয়তো নূতন ভাবে আবার তদন্ত সুরু হবে।'

'কি বলছেন আপনি ?'

'হাঁ। ট্যাব কি বলেছে শুনেছেন তো ? দুর্ঘটনায় এখন আর ওঁরা বিশ্বাস করছেন না।'

'সে কি! তাঁরা কেন ট্যাবের কথায় কান দিচ্ছেন ? নৌকোর তক্তায় কেন গর্ত হয়েছে একবছর পরে সে কথা কেমন করে সে বলতে পারবে ? কি প্রমাণ করতে চায় তাঁরা ?'

'তা জানি না।'

'করোনার ম্যাক্সিমকে প্রশ্নবাণে উত্যক্ত করে তুলবেন। তখন সে মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে কি বলতে কি বলে ফেলবে! ওসব অবান্তর প্রশ্ন সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না'—

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে ভীষণ বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। এই বোধহয় প্রথম সে এরকম হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। বুঝলাম তার মনেও কী দারুণ অশান্তির ঝড় বইছে। আমি আবার বললাম, 'ডানভারসের সাথে দেখা করবার জন্য কয়েকদিন আগে যে লোকটি এসেছিল তাকে আজ আদালতে দেখলাম।'

'ফ্যাবেলের কথা বলছেন ?' 'হাঁ, আমিও তাকে দেখেছি।'

'সে কেন এসেছে ? কোন্ অধিকারে তদন্ত শুনতে এসেছে ?'

'সে তার সম্পর্কে ভাই হয়।'

'কিন্তু ডানভারস আর ঐ লোকটিকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, 'ওরা দু'জনে মিলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে।' ফ্র্যাঙ্ক এবারও কোন উত্তর দিল না। বুঝতে পারলাম এসব বিষয়ে সে আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করতে

চায় না। আমি কতটা জানি তা সে জানে না। আমরা দু'জনে এক দুর্ভাবনাতেই অস্থির হয়ে আছি, একজনের কথাই ভাবছি কেবল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক মুখে কিছু প্রকাশ করছে না।

ম্যাণ্ডারলের মসৃণ পথ ধরে এখন গাড়ি চলেছে। এ ক'দিনের মধ্যে আজকেই প্রথম লক্ষ্য করলাম হাইড্রেনজিয়ার নীলাভ কুঁড়ির দল সবুজ কচি পাতার বুকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। পথের দু'ধারে তারা অজস্র ভারে ফুটে উঠবে আর দু'এক দিনের মধ্যেই। সিঁড়ির সামনে গাড়ি থামলে ফ্র্যাঙ্ক বললো, 'এখন একা যেতে পারবেন তো? ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন কিছুক্ষণ, কেমন?'

'আচ্ছা।'

'আমি তাহলে চলি। আমাকে তার প্রয়োজন হতে পারে।' আর কিছু না বলে তখনি গাড়িতে উঠে সে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তাকে ম্যাক্সিমের দরকার হতে পারে কেন! কেন সে ওকথা বললো? হয়তো ফ্র্যাঙ্ককেও করোনার জেরা করবেন। একবছর আগেকার সেই সন্ধ্যেবেলা ম্যাক্সিম তার সঙ্গে ছিল কিনা সে কথাই হয়তো জিজ্ঞেস করবেন। ম্যাক্সিম কখন সেখানে গিয়েছিল, কখন বাড়িতে ফিরেছিল এসব জানতে চাইবেন। ডানভারসকেও জেরা করতে পারে। ম্যাক্সিম যদি আবার রেগে ওঠে, মেজাজ হারিয়ে ফেলে! আমি আস্তে আস্তে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখের ওপর হাত দিয়ে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছি। আদালতের সব দৃশ্য আবার চোখের ওপর ভেসে ভেসে উঠছে। এখন তারা কি বলছে, কি করছে? একটু পরেই যদি ফ্র্যাঙ্ক একা ফিরে আসে তাকে সঙ্গে না নিয়ে? সহসা আমার বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। ম্যাক্সিমকে যদি আমার কাছ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়? আমি যদি আর তাকে ফিরে না পাই? সকলের সহানুভূতি আর করুণার পাত্রী হয়ে কি আমাকে এই

ব্যর্থ জীবনের দুর্বহ ভার সমস্ত জীবন বয়ে বেড়াতে হবে! উঃ আমি কি করলো···আর যে ভাবতে পারি না। আমার সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে যাক। কিন্তু রাজ্যের দুর্ভাবনা আর অমঙ্গল চিন্তার কবল থেকে আমার মুক্তি কোথায়! তারা আবার আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে!

তার যদি ফাঁসি হয়?···মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত স্বামীর হতভাগিনী স্ত্রীর কত করুণ কাহিনী আমি নিজেও কতবার পত্রিকায় পড়েছি। সাধারণ লোকেরা কি আমার স্বামীর দিকেও ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলবে এই সেই স্ত্রী হত্যাকারী, এর চরম দণ্ড অন্যকেও উচিত শিক্ষা দেবে! না, না, এসব কি ভাবছি আমি! আমি কি পাগল হয়ে যাব! অন্য কথা ভাববো, মিসেস ভ্যানহপারের কথা ভাববো! মিসেস ভ্যানহপারের কথা ভাবতেই তাঁর চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সহসা আর একটি দৃশ্যও যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কাগজ পড়তে পড়তে তিনি যেন উত্তেজিত ভাবে তাঁর মেয়েকে বলছেন, 'হেলেন দেখ দেখ পত্রিকায় কি সাংঘাতিক খবর বেরিয়েছে। ম্যাক্স ডি উইন্টার নাকি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন! আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বড় অদ্ভুত মনে হোত। সেই বোকা মেয়েটাকে কতবার বারণ করেছিলাম এত বড় ভুল না করবার জন্য। কিন্তু সে তো আমার উপদেশে কান দেয়নি। এখন তার বেশ উচিত শিক্ষাই হয়েছে।' তাঁর শ্লেষভরা কথাগুলি যেন এই মুহূর্তে আমার কানে বাজছে! আশ্চর্য, যে কথা ভাববো না বলে সংকল্প করেছি সে কথাই বারেবারে মনের দুয়ারে আঘাত করছে! অন্যকথা ভাবতে চেষ্টা করেও আবার সেই এক অমংগল আশঙ্কাই মনকে ছেয়ে ফেলছে! কে যেন আমার হাত স্পর্শ করছে! চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি জেসপার একান্ত কাছে এসে আমার হাত চাটছে! ওর বোবা ভালবাসার এই দরদভরা স্পর্শে সহসা আমার বড় কান্না পেল। জেসপারও বুঝি অনুভব করতে পেরেছে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

আমরা যখন আদালতে যাচ্ছিলাম, কী করুণ চোখে লেজ গুটিয়ে ও দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। এখন ওর ছল ছল চোখ দু'টি দেখে আমার বুঝতে বাকি নেই ও আমার ব্যথার ব্যথী, দুঃখ দিনের সাথী! ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সহসা মেঘের গুরুগম্ভীর ডাকে চমকে জেগে গেলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি পাঁচটা বেজে গেছে।

এবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিদিকে কেমন থমথমে ভাব। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলি নিথর হয়ে আছে যেন কিসের প্রতীক্ষায়। ধূসর আকাশের বুক চিড়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। তারা এখনও আসছে না কেন? অস্থির মনে নিচে নেমে গিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ফোঁটা বৃষ্টি আমার হাতে পড়লো, মাত্র এক ফোঁটা! চারিদিক ঘনঘোর হয়ে ভীষণ ঝড় আসছে। ঝড়ের আভাসে উত্তাল সাগরের শান্ত রূপও গেছে বদলে। নীল সাগর মসীকালো হয়ে উঠেছে এখান থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি। আর একটি ফোঁটা পড়লো আমার হাতে। আবার গুরু গম্ভীর সুরে মেঘ ডেকে উঠলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ঝাপিয়ে বৃষ্টি নামবে। এখনও কেন তারা এলো না!

চিন্তাকুল মন নিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে রইলাম। সাড়ে পাঁচটার সময় রবার্ট এসে বললো, 'মিঃ ডি উইণ্টার এসেছেন।'

'এসেছেন?'

'হাঁ।' তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পা দু'টো মনে হচ্ছে পাথরের মত ভারি আর অসাড় হয়ে আছে। খুব আস্তে আস্তে উঠে সোফায় ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এমন সময় ম্যাক্সিম ঘরে ঢুকলো। তাকে অদ্ভুত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন তার বয়সও অনেক বেড়ে গেছে। সমস্ত

মুখে গভীর চিন্তার রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তার এরকম চেহারা আর কোনদিন দেখিনি।

আমি তার দিকে এগোতে পারছি না, মুখ দিয়ে কথাও বের হচ্ছে না। সে নিচুস্বরে বললো, 'আত্মহত্যা। আত্মহত্যার কারণ না বুঝতে পেরেও তারা এই রায় দিয়েছে।' আমি এবার সোফায় বসে পড়ে বললাম, 'আত্মহত্যা? কেন? কারণ কি তার?'

'জানি না। কারণ সম্বন্ধে তারা অত মাথা ঘামায়নি। করোনার জিজ্ঞেস করেছিলেন রেবেকাকে কোনদিন আর্থিক সংকটে পড়তে হয়েছিল কি না। রেবেকার আর্থিক সংকট! ওঃ ভগবান!' সে এবার জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি প্রশ্ন করলাম, 'করোনার আর কি বললেন? তোমরা এতক্ষণ কি করছিলে?'

'তিনি একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছিলেন। উত্তর দিতে দিতে ভাবছিলাম আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। অনেক কষ্টে মেজাজ ঠিক রেখেছি। তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে না গেলে আমি হয়তো নিজেকে সংযত করতে পারতাম না। তোমার ঐ অবস্থা দেখে আমার মনে পড়লো আমাকে শান্ত, ধীর, স্থির, হয়ে অনেক ভেবে করোনারের অবাঞ্ছিত সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। করোনারের অদ্ভুত মুখের ভাব আমরণ আমার মনে থাকবে।' একটু চুপ করে থেকে আবার সে বললো, 'এখন আমি বড় ক্লান্ত। সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছি যেন!' সে এবার চেয়ারে বসে দু'হাতে মাথা রেখে নিচু হয়ে বসে রইলো। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। একটু পরে ফার্থ রবার্টের সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। জেসপার টেবিলের কাছে বসে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। অন্য দিনের মত তেমনি সমারোহ করে চা, খাবার গুছিয়ে দেওয়া হোল। সহসা

আমার মনে পড়লো আমাদের জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন ম্যাণ্ডারলের জীবন ধারা একভাবেই চলবে। ম্যাণ্ডারলের নিয়ম রীতি এমনই অনড় যে আমাদের জীবনের চরম সর্বনাশের আশঙ্কাতেও তার ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

তার জন্য চা তৈরী করতে করতে প্রশ্ন করলাম, 'ফ্র্যাঙ্ক কোথায় ?'

'চার্চে গেছে। আমারও সেখানে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আসবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছিলাম। সব সময় কেবল ভাবছিলাম তুমি এখানে একলা বসে বসে না জানি কত দুর্ভাবনা করছো !'

'চার্চে কেন ?'

'আজ সন্ধ্যায় সেখানে যেতে হবে।' প্রথম কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সব বুঝতে পারলাম। রেবেকাকে সমাধি দেবার জন্য তারা চার্চে যাবে! সে আবার বললো, 'সাড়ে ছ'টায় সময় ঠিক হয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক, কর্নেল জুলিয়ান আর আমি ছাড়া কেউ এ খবর জানে না।' আমরা নীরবে চা খেতে লাগলাম। ম্যাক্সিম কোন খাবার স্পর্শ করলো না। চারিদিক আবার নিবিড় হয়ে এসেছে। বৃষ্টি এই এলো বলে। ম্যাক্সিমকে মড়ার মত শাদা, ভাবহীন দেখাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সে বললো, 'আমাদের দু'জনের এক সাথে অনেক কিছু করবার আছে। আবার আমাদের নূতন করে জীবন সুরু করতে হবে। আমি তোমার ওপর এতদিন কত অন্যায়ই না করেছি !'

'না, না, এসব কেন বলছো ?'

'হাঁ, আমি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু এবার থেকে আবার আমরা নূতন করে জীবন আরম্ভ করবো, দু'জন দু'জনকে একান্ত করে পাব। শুধু তুমি আর আমি। আমাদের জীবন আনন্দে ভরে

উঠবে, সার্থক হবে। আমরা আর তো একা নই! অভিশপ্ত অতীত আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদের ছেলে মেয়েদের মধুর কলরবে ম্যাণ্ডারলের আকাশ বাতাস উঠবে ভরে।'.......

আমাদের জীবনের মধুর সম্ভাবনার কল্পনায় আমরা দু'জনেই কতক্ষণ আবিষ্ট হয়ে রইলাম। তারপর সহসা সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ছ'টা বেজে দশ মিনিট। আমাকে এখন যেতে হবে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তোমার কাছে ফিরে আসবো।' তার হাতখানি ধরে বললাম, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'না। আমি তা চাই না।' আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একলা বসে আছি। আমার মনে কত কি ভাবনা আলোড়ন তুলছে! ভাবছি রেবেকার বদলে ভুল করে যাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল সেই অখ্যাত মৃত দেহটি কোন্ অভাগিনীর কেউ তা কোনদিন জানতে পারবে না। আজ তাকে সরিয়ে তার জায়গায় রেবেকাকে রাখা হবে। এখন তারা প্রার্থনার মন্ত্র পড়ছে হয়তো। রেবেকা ধুলির সাথে, মাটির সাথে এক হয়ে মিশে গেল! ধুলো হয়ে, ছাই হয়ে ঐ হাওয়ার সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়ে যাক তার সকল স্মৃতি।

সন্ধ্যা সাতটার পর বৃষ্টি পড়তে সুরু হোল। প্রথমে টুপটাপ করে তারপর অঝোর ধারায়। নিবিড় কালো আকাশটা ফুটো হয়ে বুঝি সহস্র ধারে জল ঝরছে! জানালাগুলি সব খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি জল ভরা ঠাণ্ডা হাওয়া বুক ভরে নিঃশ্বাস নেব বলে। বৃষ্টির ছাট এসে আমার সর্বাঙ্গে লাগছে। এখন আর মেঘ ডাকছে না। ভিজে হাওয়ার সঙ্গে মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। ফার্থ কখন এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে জানতে পারিনি। আমার পাশে এসে সে বললো, 'মিঃ ডি উইন্টারের আসতে কি খুব দেরি হবে?'

'না। বেশি দেরি হবে না। কেন?'

'একজন ভদ্রলোক তাঁর সাথে দেখা করতে চাইছেন।'

'কে? তুমি তাকে চেন?' ফার্থ একটু অসোয়াস্তি বোধ করছে মনে হোল। তারপর বললো, 'হাঁ, চিনি। মিসেস ডি উইণ্টার বেঁচে থাকতে উনি এখানে প্রায়ই আসতেন। ওঁর নাম মিঃ ক্যাবেল।' জানালা বন্ধ করে ফার্থের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা।'

ম্যাক্সিম আসবার আগে লোকটাকে বিদায় করতে হবে। তাকে কি বলবো কিছু জানি না। কিন্তু এখন আর তাকে ভয়ও করি না। একটু পরেই ফার্থের সঙ্গে ক্যাবেল ঘরে ঢুকলো। তার চেহারা সেদিনকার চেয়ে অনেক এলোমেলো। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে পুড়ে আরও তামাটে হয়ে গেছে। চোখ দু'টি রক্তবর্ণ। মনে হচ্ছে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মিঃ ডি উইণ্টার বাড়ি নেই। কখন আসবেন তারও কিছু ঠিক নেই। আপনি কাল সকালে অফিসে তার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'আমি তার জন্য এখানেই অপেক্ষা করবো।'

'আজ তিনি বাড়িতে নাও ফিরতে পারেন।'

বিশ্রী একটু হাসি হেসে এবার সে বললো, 'সে কি! পালিয়ে গেল নাকি? অবশ্য এ অবস্থায় পালিয়ে যাওয়াই হোল সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'কি বলছেন আপনি?'

'বুঝতে পারছেন না? তাও কি সম্ভব? ও, হাঁ, এখন আপনি কিরকম বোধ করছেন? তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছেন দেখে আপনাকে ধরতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তার আগেই

একজন উদ্ধার কর্তা জুটে গেছেন! আমি বাজি রেখে বলতে পারি ফ্র্যাঙ্ক ক্রলে আপনাকে সাহায্য করতে পেরে একেবারে ধন্য হয়ে গেছে। তারপর সে-ই বুঝি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে? কিন্তু সেদিন তো অত অনুরোধেও আমার গাড়িতে একটু এলেন না!'

'তাঁর সাথে দেখা করতে চান কেন?' আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে বললো, 'আমি সিগারেট খেলে আপত্তি নেই তো? দেখবেন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বেন না যেন!' আমার আপাদ মস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে একটু পরে সে বললো, 'আপনি এ কয়দিনেই বেশ বড় হয়েছেন মনে হচ্ছে! কিন্তু এখানে কেমন করে জীবন কাটাচ্ছেন? ফ্র্যাঙ্ক ক্রলের সঙ্গে বাগানে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছেন বুঝি?' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি। ফার্থকে বলুন আমাকে একটু সোডা আর হুইস্কি দিতে।'

কোন কথা না বলে ঘণ্টা বাজালাম। লোকটা সোফার হাতলের ওপর বসে পা দুলিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। রবার্টকে আসতে দেখে বললাম, 'মিঃ ফ্যাবেলকে সোডা হুইস্কি এনে দাও।'

'এই যে রবার্ট, তোমাকে অনেক দিন পর দেখলাম। বেশ খোস মেজাজে স্ফূর্তিতে আছতো?' রবার্ট লজ্জায় লাল হয়ে অপ্রস্তুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। রবার্ট সোডা হুইস্কি এনে দিলে সে বসে বসে খেতে লাগলো। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে সেই বিশ্রী হাসি হাসছে।

'ম্যাক্স আজ রাত্রিতে না ফিরলেও আমি দুঃখিত হবো না। তার বদলে আমিই না হয় খেয়ে যাব, কি বলেন?' এক পাশে মাথা হেলিয়ে মৃদু হেসে সে বললো। আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করে বললাম, 'মিঃ ফ্যাবেল, আমি

আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করতে চাই না। কিন্তু আমি এখন বড় ক্লান্ত। তাঁর সাথে আপনার কি প্রয়োজন তা যদি আমাকে না বলতে পারেন তাহলে আর বসে থাকবেন না। এই মুহূর্তে চলে যান।'

'না, না, এত নির্দয় হবেন না। একি, চলে যাচ্ছেন নাকি ? যাবেন না। ভয় কি ? আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করছি না। আমার বিরুদ্ধে ম্যাক্স বুঝি আপনাকে অনেক কিছু বলেছে ? আমাকে আপনি খুব খারাপ লোক ভাবছেন তো ? না, সত্যি অত মন্দ নই। আমি অতি সাধারণ, নিরীহ গোবেচারা লোক।' খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে টেনে টেনে সে বলে চলেছে, 'জানেন, এই ব্যাপারটা আমাকে খুব আঘাত দিয়েছে। রেবেকা সম্পর্কে আমার বোন। আমি তাকে অদ্ভুত ভাবে ভালবাসতাম। আমরা এক সাথে বড় হয়েছি। দু'জন দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি। জগতে ওর চেয়ে প্রিয়জন আমার আর কেউ ছিল না। সেও আমাকে খুব ভালবাসতো।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বলতে লাগলো, 'ম্যাক্স ভেবেছে তদন্ত শেষ হয়ে গেলেই সব মিটে গেল। না। রেবেকার ওপর যাতে সুবিচার হয় তাই দেখবো আমি। আত্মহত্যা ? ওঃ! ঐ বুড়ো নির্বোধ করোনারের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতে হবে! না, না, এটা আত্মহত্যা হতেই পারে না'—এমন সময় দরজা ঠেলে ম্যাক্সিম ঘরে ঢুকলো, তার পেছনে ফ্র্যাঙ্ক। ফ্যাবেলকে দেখে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তুমি এখানে কেন ?' দু'হাত পকেটে পুরে ফ্যাবেল তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত নীরব রইলো। তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'আমি তোমাকে তদন্তের রায়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে এসেছি ম্যাক্স।'

'এখনই এঘর থেকে বেরিয়ে যাও। না হয় ঘাড় ধরে বের করে দেব।'

'একটু অপেক্ষা কর। স্থির হও।' বলে সে আবার আর একটি সিগারেট ধরিয়ে সোফার হাতলের ওপর বসে পড়লো। তারপর বললো, 'আমি যা বলবো তা ফার্থ বা অন্য কেউ শুনুক তা চাও না নিশ্চয়? তাহলে দরজাটা বন্ধ করে দাও।' ম্যাক্সিম একটুও নড়লো না। ফ্র্যাঙ্ক খুব আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ফ্যাবেল এবার বলতে লাগলো, 'শোন ম্যাক্স, তুমি ভেবেছ সব দায় থেকে সসম্মানে মুক্তি পেয়েছ, তাই না? আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদালতে ছিলাম। এক চরম মুহূর্তে তোমার স্ত্রীকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেও দেখলাম। তাঁকে অবশ্য এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। তারপর থেকেই তদন্তের মোড় ফিরে গেল তোমারই অভীপ্সিত পথে, তাই না? এই বিচারের প্রহসন আমি শেষ পর্যন্ত দেখেছি।' ম্যাক্সিম ফ্যাবেলের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে বলে উঠলো, 'আরও একটু অপেক্ষা কর। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। শোন, আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে আবার অন্য রকম করে দিতে পারি। তোমার পক্ষে তা শুধু অপ্রীতিকরই হবে না, বিপদেও পড়বে তুমি।'

আমি একটি চেয়ারে বসে পড়ে তার হাতল শক্ত করে ধরে রেখেছি। ফ্র্যাঙ্ক আমার কাছে সরে এসে চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালো। ম্যাক্সিম স্থির পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যাবেলের দিকে অপলক তাকিয়ে সে বললো, 'বলে যাও। থামলে কেন? কি বিপদে ফেলবে আমায়?'

'শোন ম্যাক্স, আমার মনে হয় তোমার আর তোমার স্ত্রীর মধ্যে কোন গোপনতা নেই। ক্রলের চোখ দেখে মনে হচ্ছে সেও সব জানে। বাঃ! একেবারে ত্রয়ী যাকে বলে! তাহলে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি, কি বল? তোমরা আমার আর রেবেকার কথা সবই জান। আমরা দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে ভালবাসতাম। আমি কখনও

তা গোপন করিনি এবং করবোও না। এতদিন পর্যন্ত আমারও ধারণা ছিল রেবেকা নৌকো ডুবি হয়ে জীবন হারিয়েছে। সে সময় আমি খুব ভেঙ্গে পড়েছিলাম। এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম তার মত প্রাণবন্ত মেয়ের ওরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ যাওয়াই বুঝি খুব স্বাভাবিক!' একটু থেমে আমাদের সবার দিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে আবার সে বলতে লাগলো, 'তারপর কয়েকদিন আগে কাগজে খবর পড়লাম রেবেকার নৌকো খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তার কেবিনে একটি কঙ্কালও পাওয়া গেছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম রেবেকার সঙ্গে সেই রাতে আর কে ছিল! কিছু বুঝতে না পেরে ডানভারসের সাথে যোগাযোগ করে জানলাম কেবিনের কঙ্কাল তারই দেহাবশেষ! তারপর তদন্তে উপস্থিত থাকলাম। ট্যাবের সাক্ষ্য নেওয়ার আগ মুহূর্ত অবধি সবই বেশ চলছিল। কিন্তু তারপর? আচ্ছা ম্যাক্স, নৌকোর তক্তার গর্তগুলি আর ছিপি খোলা সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য?'

ম্যাক্সিম খুব আস্তে জবাব দিল, 'তোমার সাথে এসব আলোচনা করবো তা যদি ভেবে থাক তাহলে ভুল করেছ। তুমি তদন্তের সময় সেখানে ছিলে। রায়ও শুনেছ। তাতেই তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।'

'আত্মহত্যা? রেবেকা আত্মহত্যা করেছে তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? শোন, তুমি জানতে না যে আমি এই চিঠিখানি তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। খুব যত্ন করে এই চিঠিখানি রেখেছিলাম। কারণ আমার কাছে এটাই তার শেষ চিঠি। চিঠিটা তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। আশা করি শুনে তোমার ভালই লাগবে।' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে সে খুলে ধরলো। লেখা দেখেই চিনতে পারলাম বাঁকা আখরের সেই তির্যক লেখা! সে এবার পড়তে আরম্ভ করলো, 'তোমাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু তুমি বাড়ি ছিলে না। আমি ম্যাণ্ডারলে চলে যাচ্ছি। আজ রাতে কুটিরে থাকবো। এই

চিঠি সময়মত পেলে তুমিও আসবে, কেমন? আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। তোমাকে একটা কথা বলার আছে। তাই তাড়াতাড়ি দেখা হওয়া দরকার। —রেবেকা।' চিঠিটা পকেটে রেখে দিয়ে সে বললো, 'আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সময় কেউ এরকম চিঠি লেখে? সেদিন খুব ভোরে বাড়িতে ফিরে আমি তার এই চিঠি পেয়েছিলাম। রেবেকা লণ্ডনে এসেছিল তাও আমি জানতাম না। দুর্ভাগ্যবশত সেই রাতে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। পরদিন ফোন করে খবর নিতে গিয়ে জানলাম রেবেকার নৌকোডুবি হয়েছে।' একটু থেমে সে আবার বললো, 'আজ করোনার এই চিঠি পড়লে ব্যাপারটা তোমার পক্ষে এত সহজ হয়ে যেত না, তাই না ম্যাক্স?'

'বেশ তো, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেই কেন দিচ্ছ না ওটা?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? শোন, আমি তোমাকে একেবারে শেষ করতে চাই না। তুমি কোনদিন আমাকে ভাল চোখে দেখনি তা জানি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনও ঈর্ষা করিনি। সুন্দরী স্ত্রী থাকলে স্বামীরা অন্য পুরুষদের প্রতি একটু ঈর্ষাকাতর হবে, এটাই নিয়ম। অনেকে আবার ওথেলোর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে ফেলে। সে যাক। আমার বক্তব্য তোমাকে তো সব খুলে বললাম। এখন একটা মীমাংসায় এসো। তুমি তো জান আমি ধনী নই। সমস্ত জীবন বছরে দু'তিন হাজার করে টাকা যদি আমাকে বরাদ্দ করে দাও তাহলে এসব কথা কাউকে বলবো না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকবে। আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করবো না কথা দিচ্ছি।'

'আমি তোমাকে অনেকক্ষণ আগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি। আবারও বলছি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।'

ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'একটু অপেক্ষা কর ম্যাক্সিম।' তার পর ফ্যাবেলের দিকে ফিরে সে বললো, 'আপনার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে

পেরেছি। ঠিক কত টাকা পেলে রফা করবেন?' দেখলাম ম্যাক্সিমের মুখ ছাইয়ের মত শাদা হয়ে কপালের শিরাগুলি ভেসে ভেসে উঠলো এক নিমেষে। ফ্র্যাঙ্কের দিকে চেয়ে কঠিন স্বরে সে বললো, 'এবিষয়ে তুমি একটি কথাও বলবে না ফ্র্যাঙ্ক। এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভয় দেখিয়ে আমাব কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা বৃথা।'

'তোমার ফাঁসির পর তোমার স্ত্রীকে লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে, 'ইনি সেই হত্যাকারীর বিধবা।' তাই কি তুমি চাও?' কথাটি বলে সে আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

'তুমি ভাবছো আমাকে ভয় দেখাতে পার, তাই না? না, তোমার ধারণা একেবারেই ভুল। তুমি যা খুশি করতে পার, আমি একটুও ভয় করিনা। পাশের ঘরে ফোন আছে। কর্ণেল জুলিয়ানকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার কাহিনী তাঁকেই শোনানো দরকার।'

'তাঁকে ফোন করবার মত সাহস তোমার নেই। কিন্তু তোমাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবাব জন্য সত্যি আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।' ম্যাক্সিম ধীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ফোনের রিসিভার তুলবার শব্দ শুনে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলাম, 'ওকে বাধা দিন, বাধা দিন।' ফ্র্যাঙ্ক গম্ভীরভাবে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওঘর থেকে ম্যাক্সিমের নিরুত্তাপ, শান্ত স্বর শুনতে পাচ্ছি, 'কেরিথ ১৭ চাই।' ফ্যাবেল আগ্রহভরে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। শুনতে পেলাম ম্যাক্সিম ফ্র্যাঙ্ককে বলছে, 'না, না, তুমি চলে যাও।' তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে আবার তার গলা শুনতে পেলাম, 'কে? কর্ণেল জুলিয়ান? হাঁ, আমি ডি উইন্টার কথা বলছি। আপনি এখনই একবার আসতে পারবেন? হাঁ, খুব জরুরী দরকার। না, ফোনে বলতে পারছি না।

এখানে এলেই সব জানতে পারবেন।' একটু পরে ঘরে ঢুকে বললো, 'জুলিয়ান এখনই আসছেন।' তারপর জানালার ধারে গিয়ে সব জানালা একে একে খুলে দিল। তখনও মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমাদের দিকে পেছন করে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। ফ্র্যাঙ্ক তার কাছে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে তার নাম ধরে ডাকলো। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। ফ্যাবেল হেসে আর একটা সিগারেট ধরালো।

'তুমি যদি ইচ্ছে করে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাও তাহলে আমি আর কি করতে পারি।' তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে সোফায় আরাম করে বসে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সে পড়তে আরম্ভ করলো। ফ্র্যাঙ্ক একবার আমার দিকে আরেকবার ম্যাক্সিমের দিকে করুণভাবে তাকাচ্ছে। কখন নিঃশব্দে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমি ফিস ফিস করে বললাম, 'আপনি কিছু একটা করুন। এখনই গিয়ে কর্ণেলকে বলুন তাঁকে আর আসতে হবে না। যান, দয়া করে এখনই চলে যান'।'' এদিকে না ফিরেই ম্যাক্সিম গম্ভীরভাবে আদেশের সুরে বলে উঠলো, 'না। ফ্র্যাঙ্ক এঘর থেকে কোথাও যাবে না। এ ব্যাপারে যা করবার আমি একাই করবো।' আমরা আর একটি কথাও বলতে সাহস করলাম না। ফ্যাবেল তেমনই কাগজ পড়ছে। বৃষ্টির একটানা শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই চারদিকে। এক তালে বৃষ্টি পড়ছে ঝম ঝম করে। আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। ম্যাক্সিমের কাছে গিয়ে তার হাতে পায়ে ধরে ফ্যাবেলকে টাকা দেবার অনুরোধ করবো এমন সাহসও আমার নেই। নিষ্ক্রিয় হয়ে পুতুলের মত বসে থেকে শুধু তাকে লক্ষ্য করা ছাড়া কিছুই যে আমার করবার নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে কর্ণেল জুলিয়ান ঘরে ঢুকলেন। ম্যাক্সিম জানালা থেকে সরে এসে বললো, 'আসুন।'

'আপনি জরুরী দরকার বলাতে আমি ছুটে চলে এসেছি। উঃ! কী ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে।' তিনি ক্যাবেলের দিকে অবাক হয়ে একবার তাকালেন। তারপর আমার কাছে এসে একটু হেসে বললেন, 'এখন ভাল বোধ করছেন তো?' আমি বিড় বিড় করে তাঁকে কি বললাম নিজেও তা জানি না। তিনি আমাদের সকলের দিকে অবাক হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন। ম্যাক্সিম এবার বলতে আরম্ভ করলো, 'ইনি জ্যাক ক্যাবেল আমার স্বর্গগতা স্ত্রীর সম্পর্কে ভাই হন।' ক্যাবেলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'এবার তোমার কি বলবার আছে বল।' ক্যাবেল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটি আবার টেবিলের ওপর রাখলো। এখন সে বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে মনে হোল ঘটনার এই আকস্মিক গতি তার এতটুকুও ভাল লাগছে না। কর্ণেল জুলিয়ানের মুখোমুখি হতে সে চায়নি। উঁচু গলায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে সে বলতে আরম্ভ করলো, 'শুনুন কর্ণেল, ভূমিকা করে লাভ নেই। কালকের তদন্তের রায় আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলেই আমি এখানে এসেছি।'

'কিন্তু সে কথা বলবার অধিকার একমাত্র মিঃ ডি উইণ্টারেরই আছে।'

'কেবল রেবেকার ভাই হিসেবেই নয়, সে বেঁচে থাকলে তার ভাবী স্বামী হিসেবেও বলবার অধিকার আমার সম্পূর্ণ ই আছে।' তার একথায় কর্ণেল খুব হকচকিয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও। তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু এসব কি সত্যি?' ম্যাক্সিম কাঁধ বেঁকিয়ে বললো, 'এই প্রথম এ খবর শুনছি।' কর্ণেল জুলিয়ান তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা আপনার অভিযোগটা কি?' ক্যাবেল এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বুঝতে পারছি, ষড়যন্ত্রটাকে আরও ঘোরালো করবার জন্য মনে মনে সে একটা দুষ্টু বুদ্ধি আঁটছে।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেবেকার সেই চিঠিখানি বের করে সে বললো, 'আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে সাগরে ভাসবার আগে সে আমায় এই চিঠিখানি লিখেছিল। এই যে, পড়ে দেখুন। তারপর বলুন, যে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থ করেছে তার পক্ষে এমন চিঠি লেখা সম্ভব কিনা।' কর্ণেল জুলিয়ান পকেট থেকে চশমা বের করে চিঠিটা পড়তে লাগলেন। পড়া হয়ে গেলে ফ্যাবেলকে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'না। চিঠি পড়ে তা মনে হয় না। কিন্তু এই চিঠির অর্থও আমি বুঝতে পারছি না।' ফ্যাবেল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো, 'রেবেকা এই চিঠিতে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে, তাইনা? আমাকে কি কথা বলবে বলে সে রাতে আমাকে তার কুটিরে যেতে লিখেছে। আমার সঙ্গে কুটিরে সে রাত কাটাবে বলেই স্থির করেছিল। এই চিঠিটাই তার প্রমাণ। তাই, সে আত্মহত্যা করেছে এই অসম্ভব কথা আমি বিশ্বাস করিনা। কর্ণেল জুলিয়ান, এতবড় অসম্ভব ব্যাপারকে বিশ্বাস করতে বলবেন না, বলবেন না'—তার মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। শেষের কথা কয়টি সে খুব চেঁচিয়ে বললো। তার এই রুক্ষ মূর্তি কর্ণেলের বোধহয় ভাল লাগেনি। তাঁর মুখে বিরক্তির ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠেছে দেখলাম। তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমার সামনে এভাবে রাগারাগি করে কোন লাভ হবেনা। আমি করোনার নই বা জুরীদেরও একজন নই। আমি এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্র। আপনাদের সকলকে সমস্ত দিক দিয়ে সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। আপনি বলছেন আত্মহত্যা বলে আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু আপনি তো নৌকোর মিস্ত্রীর সাক্ষ্যও শুনেছেন। পাইপের ছিপি খোলা ছিল। নৌকোর তক্তায় গর্ত করা হয়েছিল। তাহলে আপনার মতে কি ঘটা সম্ভব? আত্মহত্যা ছাড়া আর কি ঘটা সম্ভব? আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে?' ফ্যাবেল একবার ম্যাক্সিমের দিকে

তাকালো। তারপর বলতে লাগলো, 'রেবেকা ওসব করেনি। সে আত্মহত্যা করতে পারেনা, পারেনা। শুনুন, রেবেকাকে হত্যা করা হয়েছে। জানতে চান কে হত্যাকারী ? কেন, ঐ যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখে ভাল মানুষি হাসি মেখে মহাপুরুষের ভঙ্গিমায় ! একবছর যেতে না যেতেই যে প্রথম যাকে হাতের কাছে পেল তাকেই বিয়ে করে ফেললো ! ঐ যে ছদ্মবেশি হত্যাকারী আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে, মিঃ ম্যাক্স মিলিয়ান ডি উইণ্টার ! দেখুন, দেখুন, ভাল করে তাকিয়ে দেখুন ঐ খুনী আসামীকে'—বলতে বলতে সে হো হো করে হেসে ভেঙ্গে পড়লো মাতালের মত, পাগলের মত বাঁধন-হারা হাসির দমকে···

ফ্যাবেলের সেই উচ্ছ্বসিত, বাঁধন-হারা হাসির জন্য ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ। তার রক্তবর্ণ চোখ, কর্কশ কথা আর ওরকম ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিই তার কাল হোল। কর্ণেল জুলিয়ান তার ভাবভঙ্গিতে বিশেষ বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারলাম। তার মুখে অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠেছে। একটু পরে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, 'লোকটা বদ্ধ মাতাল। কি বলছে নিজেই তার গুরুত্ব জানেনা।' ফ্যাবেল তাঁর কথা শুনতে পেয়ে আরও জোরে চীৎকার করে উঠলো, 'আমি মাতাল ? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট বা কর্ণেল যা-ই হোন না কেন আপনাকে আমি পরোয়া করিনা। আইনকে সপক্ষে পাবার সুযোগ আমার আছে এবং সেই সুযোগ যে ভাবেই হোক আমি নেব। আপনি ছাড়া আর অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট কি এদেশে নেই ? আশাকরি তাঁরা আপনার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান, সুবিচারক হবেন। আমি আবারও বলছি ম্যাক্স ডি উইণ্টার রেবেকাকে হত্যা করেছে এবং আমি তা প্রমাণ করবোই।' কর্ণেল শান্তভাবে বললেন, 'আপনি তো আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তদন্তের রায় সম্বন্ধে আপনার যদি এতটুকুও সন্দেহ ছিল তাহলে আদালতেই কেন বললেন না ? এই চিঠিটা সেখানেই কেন দেখান নি ?'

ফ্যাবেল একটু হেসে বললো, 'আমি নিজে এসে ম্যাক্সের সাথে বোঝাপড়া করবো ভেবেছিলাম।' ম্যাক্সিম জানালার কাছ থেকে সরে এসে বললো, 'আমিও তাকে এই এক প্রশ্নই করেছিলাম। তার উত্তরে সে বললো আজীবন যদি তাকে আমি দু'তিন হাজার করে টাকা দিতে রাজী থাকি তাহলে সে আর কিছু বলবে না।'

'হাঁ, একথা সত্যি। সহজ সরল ভাষায় একেই ব্ল্যাকমেইল বলে।' নির্লজ্জ হাসি হেসে ফ্যাবেল বললো।

'হাঁ। তবে এটা খুব নগণ্য অপরাধ নয় সে কথাও ভুলে যাবেন না। সে যাক। এখন কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিন। এইমাত্র আপনি ডি উইণ্টারের বিরুদ্ধে যে সাংঘাতিক অভিযোগ করেছেন তার সপক্ষে আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ? প্রমাণ দিয়ে কি হবে? নৌকোর তক্তায় ঐ গর্তগুলিই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?'

'না। যে পর্যন্ত না আপনি এমন একজন সাক্ষী পাচ্ছেন যে তাকে ঐ গর্তগুলি করতে দেখেছে।'

'সাক্ষীর নিকুচি করেছে। ম্যাক্স ছাড়া আর কে তাকে হত্যা করবে?'

'এখানে অনেক লোকের বসতি। এক কাজ করুন না কেন! প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে অনুসন্ধান করুন। আপনার মতে আমিও তো হত্যা করতে পারি!'

'ও, বুঝেছি। আপনিও ডি উইণ্টারের পক্ষ নেবেন স্থির করেছেন! আপনাকে সে কতবার নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। তাই তার বিরুদ্ধে যেতে পারেন না, কেমন? বাঃ! ধন্য বটে!'

'মুখ সামলে কথা বলুন মিঃ ফ্যাবেল।'

'কেন? যা সত্যি তাই বলছি। ভেবেছেন আদালতে এই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবো না? নিশ্চয় পারবো। আমার জন্যই

সে তাকে হত্যা করেছে। আমি তাকে ভালবাসতাম বলে সে ঈর্ষায় পাগল হয়ে তা সহ্য করতে পারেনি। সে জানতো সেই রাতে রেবেকা সাগরপারের কুটিরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল
সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করে তার দেহ নৌকোর কেবিনে বন্ধ করে সাগরে নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে।'

'বাঃ! সুন্দর সাজানো গল্প, তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আবারও বলছি আপনার কোন প্রমাণ নেই। সেই রাত্রির ঘটনা দেখেছে এমন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নিয়ে আসুন। তখন আপনার সব কথা বিবেচনা করে দেখবো।' ফ্যাবেল একটু চুপ করে থেকে কি চিন্তা করলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'হাঁ, হাঁ, সে রাতে একজন তাকে দেখে থাকতে পারে।' ফ্র্যাঙ্ক ম্যাক্সিমের দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকালো। ম্যাক্সিম কিছু বললো না। সহসা বুঝতে পারলাম ফ্যাবেল কার কথা বলছে। কথাটা ভাবতেই দারুণ আতঙ্কে আর দুর্ভাবনায় শিউরে উঠলাম। সেই রাত্রের সব ঘটনার সাক্ষী সত্যি একজন থাকতে পারে! ছোট ছোট কত কথার টুকরো আমার মনে বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো। অবোধ মনের অসংলগ্ন কথা বলে যাদের অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, সে সব কথা এখন মনে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

'তিনি সাগরে চলে গেছেন।' 'তিনি আর ফিরে আসবেন না।' 'আমি তো কাউকে কিছু বলিনি।' 'তাকে মাছে খেয়ে ফেলেছে, তাইনা?' বেনের অসংলগ্ন সে সব কথার স্পষ্ট অর্থ আজ আমার কাছে জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল। হাঁ, বেন সব জানে! বেন সে রাত্রে সব দেখেছে! সেই দুর্যোগের রাত্রে বনের মধ্যে লুকিয়ে সব দেখেছে। অনুভব করছি আমার মুখের রক্ত কোথায় সরে যাচ্ছে! প্রাণপণে চেয়ারের হাতল ধরে আচ্ছন্নের মত বসে আছি। ফ্যাবেল তখন বলছে, 'একটি আধপাগলা লোক সব সময়েই সাগর সৈকতে থাকে। আমি যখন

রেবেকার সাথে সেই কুটিরে দেখা করতে যেতাম তখন সেই লোকটা জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতো। সেই রাতে সে নিশ্চয় সব ব্যাপার আড়াল থেকে দেখেছে।'

'কে এই লোকটি?' কর্ণেল প্রশ্ন করলেন। ফ্র্যাঙ্ক ম্যাক্সিমের দিকে আর একবার তাকিয়ে বললো, 'বোধহয় বেনের কথা বলছে। লোকটি এখানকারই এক কর্মচারীর ছেলে। কিন্তু জন্ম থেকেই সে একেবারে বোকা; আধ পাগলা ধরণের। কি বলে, কি করে নিজেই তা জানে না।' ফ্যাবেল বলে উঠলো, 'তাতে কি হয়েছে? তার তো চোখ আছে। যা দেখবে তা বলতে না পারার কোন কারণ নেই। জেরা করলেই সব জানা যাবে।' কর্ণেল বললেন, 'এই লোকটিকে কি এখানে আনা যাবে?' এবার ম্যাক্সিম ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললো, 'রবার্টকে পাঠিয়ে বেনকে এখানে আনার ব্যবস্থা কর।' ফ্র্যাঙ্ক একটু দ্বিধা করছে। সে আড়চোখে আমার দিকে তাকালো। ম্যাক্সিম অস্থির ভাবে বলে উঠলো, 'যাচ্ছ না কেন? যাও, যাও। আজই এই ব্যাপারের যা হোক একটা শেষ করতে চাই।' ফ্র্যাঙ্ক তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার বুকের সেই ব্যথা আবার অনুভব করছি। কয়েক মিনিট পর ফ্র্যাঙ্ক ফিরে এসে বললো, 'রবার্ট আমার গাড়ি নিয়ে বেনকে আনতে গেছে।' একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফ্যাবেল বললো, 'ম্যাণ্ডারলের সকলে মিলে তোমরা বেশ একটা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছ যেন। কেউ কারও বিপক্ষে কিছু বলবে না ঠিক করেছ। এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ও সেই দলে! অবশ্য নবাগতা মিসেস ডি উইণ্টারের কথা আলাদা। কোন স্ত্রীই স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে না। ক্রলের তো নিজের চাকুরীর ভয়েই সত্যকে ঢাকতে হচ্ছে। আমার ওপর তার আবার একটু আধটু ঈর্ষাভাব থাকাটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়! তুমি রেবেকার সাথে খুব বেশি সুবিধা করতে পারনি, তাই না ক্রলে?

অবশ্য এবার তোমার অনেক সুবিধা হবে আশা করি। অজ্ঞান হয়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরবে বলে নবাগতা মিসেস ডি উইন্টার তোমার ওপর খুব কৃতজ্ঞ থাকবেন দেখো। তারপর যখন তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি বিচারকের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনবেন তখন তো তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত, কি বলো?' তারপর সহসা দেখলাম ফ্যাবেল সশব্দে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ম্যাক্সিম তার পাশে দাঁড়িয়ে। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল বুঝতেও পারলাম না। ম্যাক্সিম তাকে কি ভাবে কোথায় মেরেছে দেখতে পাইনি। কিন্তু হঠাৎ বড় অসুস্থ বোধ করলাম। কর্ণেল আমার পাশে এসে বললেন, 'ওপরে যাবেন?' আমি মাথা নেড়ে চুপি চুপি বললাম, 'না, না।' তিনি আবার বললেন, 'এই লোকটা যা খুশি বলতে পারে। এই মুহূর্তে যা ঘটে গেল আপনাকে তা না দেখতে হলেই ভাল হোত। অবশ্য আপনার স্বামী ঠিকই করেছেন।' আমি কোন উত্তর দিলাম না। দেখলাম ফ্যাবেল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তারপর সোফায় বসে পড়ে রুমাল মুখে চেপে কাতরস্বরে বলছে, 'জল, একটু জল।' ম্যাক্সিম ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকালো। ফ্র্যাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা কেউ কোন কথা বলছি না। ফ্র্যাঙ্ক হুইস্কি আর সোডা এনে গ্লাসে ঢেলে ফ্যাবেলের সামনে ধরলো। সে তখনই এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেললো। তার থুতনীটা বেশ ফুলে উঠেছে দেখলাম। ম্যাক্সিম আবার জানালার সামনে গিয়ে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো। কর্ণেল জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি ম্যাক্সিমের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে একটা অদম্য কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে। তিনি কেন তার দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছেন! ভয়ে ভাবনায় আমার বুক দুরু দুরু করে উঠলো। তাহলে কি তিনিও তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন? ম্যাক্সিম এসব কিছুই দেখলো না। সে অপলক বাইরের দিকে তাকিয়ে

আছে। বৃষ্টি তেমনই অঝোর ধারায় ঝরছে। ফ্যাবেল জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এখন আর সে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠলে ফ্র্যাঙ্ক দৌড়ে গেল। ফিরে এসে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে সে বললে:, 'আপনার মেয়ে ফোন করছেন। জানতে চাইছেন আপনার জন্য তারা অপেক্ষা করবেন, না, খেতে আরম্ভ করবেন।' কর্ণেল অস্থির ভাবে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'তাদের খেতে বলে দিন। আমি কখন ফিরবো কিছু ঠিক নেই।'

আমি কর্ণেলের মেয়ের কথা ভাবছি। যে মেয়েটি গলফ্ খেলতে ভালবাসে সে-ই বোধহয় ফোন করেছিল। আমাদেরই জন্য একটি সুখী পরিবারের রোজকার বাঁধাধরা নিয়মের ব্যতিক্রম হোল। আমি ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকালাম। তার মুখখানিও বিবর্ণ ও গম্ভীর। কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'গাড়ির শব্দ পাচ্ছি।' তারপর সে হলঘরের দিকে চলে গেল। ফ্যাবেল একবার চোখ তুলে তাকালো। শুনলাম ফ্র্যাঙ্ক বলছে, 'বেন, এসো, ভেতরে এসো। ভয় নেই। মিঃ ডি উইণ্টার তোমাকে কত সিগারেট দেবেন।' বেন জড়োসড়ো ভাবে ঘরে ঢুকলো। তার টুপিটি হাতে ছিল। মাথায় একগাছিও চুল নেই দেখলাম, একেবারে চকচক করছে। তাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে। ঘরের উজ্জ্বল আলোর ছটায় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে হয়তো! চোখ পিট পিট করে সে বোকার মত ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছে। সে আমার দিকে তাকাতেই অনেক কষ্টে একটু হাসলাম। কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে মনে হোল না আমাকে সে আগে কোনদিন দেখেছে বা চেনে। ফ্যাবেল তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'এই যে, আমাদের শেষ দেখা হবার পর থেকে তোমার কেমন চলছে?' বেন তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তার দৃষ্টিতে ফ্যাবেলকে চেনবার সামান্য আভাসও ফুটে উঠলো না। সে কোন জবাবও

দিল না। ফ্যাবেল আবার বললো, 'কি? আমাকে তো তুমি চেন, তাই না?' বেন. তেমনি তাকিয়ে আছে। ফ্যাবেল এবার তার দিকে সিগারেটের কেস এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও।' বেন ম্যাক্সিমের দিকে তাকালো। তার ভাব বুঝতে পেরে ম্যাক্সিম বললো, 'যতটা তোমার খুশি নিয়ে নাও।' বেন চারটে সিগারেট তুলে নিয়ে দু'টো দু'টো করে কানের পেছনে গুঁজে রেখে দিল। ফ্যাবেল আবার তাকে প্রশ্ন করলো, 'তুমি আমাকে চেন, তাইনা?' তখনও সে কোন উত্তর দিল না। কর্ণেল জুলিয়ান তার কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে এখনই বাড়িতে পাঠিয়ে দেব বেন। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি শুধু দু' একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আচ্ছা, তুমি মিঃ ফ্যাবেলকে চেন?' এবার সে মাথা নেড়ে বললো, 'না। আমি কখনও তাকে দেখিনি।' ফ্যাবেল কঠিন স্বরে বলে উঠলো, 'বাঁদরামো হচ্ছে? তুমি আমাকে অনেক-বার দেখেছ। মিসেস ডি উইণ্টারের কুটিরে আমি যেতাম। মনে করে দেখ।'

'না। আমি কখনও কাউকে দেখিনি।'

'ওঃ! কী মিথ্যুক! দাঁড়াও, তোমার পাগলামো বার করছি। গেল বছর আমাকে আর মিসেস ডি উইণ্টারকে বনের মধ্য দিয়ে একসাথে ঐ কুটিরের দিকে যেতে দেখনি তুমি? কুটিরের জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরেছিলে। তোমাকে তখন আমরা ধরে ফেলেছিলাম তা মনে পড়ছে না?' বেন তেমনি বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কর্ণেল ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, 'বাঃ! চমৎকার সাক্ষী বটে!' ফ্যাবেল অস্থির ভাবে চীৎকার করে উঠলো, 'এসব ষড়যন্ত্র! কেউ ওকে ঘুষ দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করেছে। আমাকে ও কতবার দেখেছে।' আবার সে বেনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ধমকের সুরে বললো, 'বল চিনতে পারছো কিনা, বল।' বেন মাথা নেড়ে বললো, 'না।' তারপর ছুটে

গিয়ে ফ্র্যাঙ্কের হাত জড়িয়ে ধরে বললো, 'উনি কি আমাকে পাগলা গারদে নিয়ে যেতে এসেছেন ?'

'না, না।'

'আমি পাগলা গারদে যেতে চাই না। তারা বড় খারাপ লোক। আমি বাড়িতে থাকবো। আমি তো কোন দোষ করিনি।' কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই বেন। কেউ তোমাকে পাগলা গারদে দেবে না। আচ্ছা, আবার একবার ভেবে দেখতো এই ভদ্রলোককে তুমি এর আগে কোনদিন দেখনি ?'

'না, কখনও দেখিনি।'

'মিসেস ডি উইণ্টারকে তোমার মনে আছে ?' বেন আমার দিকে তাকাতে লাগলো। কর্ণেল শান্তস্বরে বললেন, 'না, উনি নন। যিনি সেই কুটিরে যেতেন তাঁর কথা বলছি। তাঁকে তোমার মনে আছে ?' বেন চুপ করে আছে। কর্ণেল আবার প্রশ্ন করলেন, 'সে-ই যিনি সাগরে নৌকো চালাতেন। তাঁর কথা তোমার মনে নেই ?' বেন এবার চোখ পিট পিট করে বললো, 'তিনি চলে গেছেন।'

'এই তো তুমি জান দেখছি। তিনি নৌকো করে সাগরে বেড়াতে যেতেন, তাই না ? শেষবার যেদিন তিনি নৌকো করে সাগরে গিয়েছিলেন সেদিন তুমি সাগরপারে ছিলে ? এক বছর আগে এক ঝড়ের রাতে যেদিন থেকে তিনি আর ফিরে এলেন না।' বেন একবার ম্যাক্সিমের দিকে আর একবার ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাতে লাগলো। ফ্যাবেল আবার প্রশ্ন করলো, 'তুমি সেদিন সেখানে ছিলে, তাই না বেন ? মিসেস ডি উইণ্টারকে কুটিরের দিকে আসতে দেখেছিলে। তারপর মিঃ ডি উইণ্টারকেও আসতে দেখেছ। তিনিও কুটিরে ঢুকেছিলেন তো ? তারপর কি হোল ? বল, কি ঘটেছিল তারপর ?'

বেন দেওয়ালের দিকে সভয়ে সরে গিয়ে বলে উঠলো, 'আমি কিছু

দেখিনি। আমি পাগলা গারদে যাব না। আপনাকে কোনদিন আমি দেখিনি। আপনাকে আর তাঁকে কোনদিন আমি বনের মধ্যে দেখিনি।' অবোধ শিশুর মত সে এক কথা বার বার বলে যাচ্ছে। কর্ণেল জুলিয়ান ফ্যাবেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাঃ, আপনার সাক্ষী আপনাকে কোন সাহায্য করলো না। অনর্থক সময় নষ্ট হোল শুধু।' ফ্যাবেল গলা ফাটিয়ে বলে উঠলো, 'এসব সাজানো ব্যাপার। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ভীষণ ষড়যন্ত্র! আপনারা প্রত্যেকে এর মধ্যে লিপ্ত আছেন। এই নির্বোধ লোকটাকে টাকা দেওয়া হয়েছে আমি হলফ করে বলতে পারি। মিথ্যে বলার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়েছে।' কর্ণেল বললেন, 'বেনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।' ম্যাক্সিম বললো, 'বেন, রবার্ট তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে। তোমার কোন ভয় নেই। কেউ তোমাকে পাগলা গারদে দেবে না।'

ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে এবার সে বললো, 'রবার্টকে বল ওকে কিছু খেতে দিক। ও যা খেতে চায় তাই যেন দেয়।'

'বাঃ! খুশি হয়ে আবার খাওয়ানোও হচ্ছে যে! তোমার মস্ত উপকারই ও করেছে, তাই না ম্যাক্স?' ফ্যাবেল বিশ্রী হাসি হেসে বললো। ফ্র্যাঙ্ক বেনকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কর্ণেল ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লোকটা অসম্ভব ভীতু আর পাগলাটে ধরনের। সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপছিল। ওর প্রতি কোন দিন খুব দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল কি?'

'না। ও কারও কোন অনিষ্ট করে না। নিজের মনে ঘুরে বেড়ায়। ম্যাণ্ডারলের কেউ ওকে উত্যক্ত করে না।'

'কিন্তু কোনদিন হয়তো খুব ভয় পেয়েছিল। মাঝে মাঝে ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি ওকে চাবুক মারতে যাচ্ছি।' ফ্যাবেল বলে উঠলো, 'ওটাকে চাবুক মারাই উচিত ছিল। মার খেলে

আমাকে ঠিক চিনতে পারতো। তা না করে অপদার্থটাকে আবার আদর করে খাওয়ানো হচ্ছে! তা আর হবে না? মস্ত উপকার করলো যে!' কর্ণেল জুলিয়ান তার দিকে চেয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। আমি তো বলেছি ডি উইণ্টারের বিরুদ্ধে আপনার কোন প্রমাণ নেই। আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আদালতে আপনার কথায় কেউ কানই দেবেনা। আপনি বলছেন আপনিই নাকি মিসেস ডি উইণ্টারের ভবিষ্যত স্বামী এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই নাকি ঐ কুটিরে যেতেন। কিন্তু ঐ নির্বোধ লোকটাও বারবার বলছে সে আপনাকে কোনদিন দেখেনি! আপনার নিজের কাহিনীকেও প্রমাণ করতে পারলেন না।' 'পারি না?' এবার তাকে হাসতে দেখলাম। সে ঘণ্টা বাজালো। কর্ণেল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি করছেন?'

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন। তাহলেই দেখতে পাবেন।' ফার্থ ঘরে ঢুকলে ফ্যাবেল তাকে বললো, 'মিসেস ডানভারসকে একবার আসতে বল।' ফার্থ ম্যাক্সিমের দিকে তাকালে সে তখনই মাথা নেড়ে সায় জানালো। কর্ণেল প্রশ্ন করলেন, 'মিসেস ডানভারস কে? আপনাদের হাউস-কিপার?' ফ্যাবেল জবাব দিল, 'সে রেবেকার অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে। রেবেকার বিয়ের অনেক আগে থেকে সে তার সাথে আছে। সে-ই তাকে বড় করে তুলেছে।' এমন সময় ফ্র্যাঙ্ক ঘরে ঢুকলে ফ্যাবেল তার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গভরা হাসি হেসে বললো, 'কি? বেনকে বেশ আদর যত্ন করে খাওয়ানো হোল তো? কিন্তু এবার কি হবে? এবার যে আর কোন ষড়যন্ত্র টিকছে না।' কর্ণেল ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিসেস ডানভারস আসছে। মিঃ ফ্যাবেল ভাবছেন তার কাছ থেকেই সব জানতে পারবেন।' ফ্র্যাঙ্ক কেমন সচকিত হয়ে ম্যাক্সিমের দিকে তাকালো। কর্ণেল তার সেই চাহনি লক্ষ্য করলেন। তাঁর মুখে কেমন একটু কঠিন ভাব ফুটে উঠলো। ভয়ে ভাবনায় আমার বুক শুকিয়ে

উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানভারস ঘরে ঢুকলো। সে আমাদের সকলের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। সে দরজার কাছেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কর্ণেল জুলিয়ান তার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি জানেন স্বর্গগতা মিসেস ডি উইন্টার এবং মিঃ ফ্যাবেলের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল?'

'তাঁরা সম্পর্কে ভাইবোন।'

'আমি রক্তের সম্পর্কের কথা বলছি না। তা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক ছিল কি?'

'আপনি কি বলতে চান বুঝতে পারছি না।' ফ্যাবেল অধৈর্যভাবে বলে উঠলো, 'উনি কি ইঙ্গিত করছেন তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ ড্যানী! আমি কর্ণেল জুলিয়ানকে সব কথা বলেছি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চান না। রেবেকা আর আমি অনেক বছর থেকে এক সাথে থাকছি, দু'জন দু'জনকে ভালবেসেছি, তাই না ড্যানী? রেবেকা আমাকে গভীর ভাবে ভালবাসতো একথা তুমি ভাল করেই জান।' অবাক হয়ে দেখলাম ডানভারস নীরবে কি ভাবছে। তার চোখের দৃষ্টিতে ফ্যাবেলের প্রতি ভর্ৎসনা ফুটে উঠেছে। তারপর সে তেমনি কঠিন নিষ্প্রাণ স্বরে বললো, 'না, ভালবাসতেন না।' ফ্যাবেল খুব অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'কি বলছো? পাগল হলে নাকি?'

'ঠিকই বলছি। তিনি আপনাকে বা মিঃ ডি উইন্টার, কাউকে কোন দিন ভালবাসেননি! সমস্ত পুরুষ জাতটাকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। তিনি ওসব ব্যাপারের অনেক ওপরে ছিলেন।'

রাগে, উত্তেজনায় ফ্যাবেলের মুখ আবার লাল হয়ে উঠলো। একটু সামলে নিয়ে সে বললো, 'আচ্ছা, রেবেকা রাতের পর রাত আমার সাথে দেখা করবার জন্য বনের মধ্য দিয়ে আসতো না? লণ্ডনে আমার সঙ্গে থাকেনি?' ডানভারসও হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, 'তা

জানি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তিনি জীবনকে উপভোগ করতে জানতেন। ওসব তাঁর কাছে খেলার মত, নিছক খেলার মত ছিল। ভালবাসার অভিনয় করতে তাঁর ভাল লাগতো, তাই। তিনি আমাকে সব বলতেন। তাঁর রূপ আর ভালবাসার ফাঁদে ফেলে পুরুষ পতঙ্গদের দুর্দশা তিনি মনে প্রাণে উপভোগ করতেন, হাসতেন। আপনিও অন্যদের মত তাঁর খেলার পুতুল ছিলেন মাত্র, আর কিছু নয়। আপনারা সবাই ছিলেন তাঁর করুণা আর উপহাসের পাত্র।' তার এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের নগ্নতা আমাদের সকলকে কেমন বিহ্বল, হতবাক করে দিল। তার কথার মধ্যে কি ছিল জানি না। সব জেনেও আমি আবার শিউরে উঠলাম। লজ্জায়, ঘৃণায় নূতন করে মরমে মরে গেলাম। ম্যাক্সিমের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ফ্যাবেল হতবুদ্ধির মত ডান-ভারসের দিকে তাকিয়ে আছে। কর্ণেল জুলিয়ান ধীরে ধীরে তাঁর গোঁফে হাত বুলাচ্ছেন। তাঁরও কেমন যেন দিশেহারা ভাব! কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কেটে গেল। একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

তারপর সহসা ডানভারস কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। সেদিন রেবেকার শোবার ঘরে যেমন কেঁদেছিল তেমনই অঝোর ধারায় সে কাঁদছে। আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তার কান্নার শব্দ মিলে অদ্ভুত একটা শব্দ আমার কানে বাজতে লাগলো। মনে হোল আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। এঘর থেকে ছুটে গিয়ে আমিও যদি এমনি ভাবে কাঁদতে পারতাম! কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না, তাকে ধরছে না। সে আকুলভাবে কেঁদে চলেছে। তার শরীর কান্নার ভারে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হোল এই কান্না বুঝি অনন্ত কাল চলবে, এর শেষ নেই, ছেদ নেই!.......কিছুক্ষণ পর তার কান্নার রেশ কমে এলো। একটু একটু করে সে নিজেকে সামলে নিচ্ছে। তারপর স্থির নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইলো। কর্ণেল জুলিয়ান এবার খুব আস্তে প্রশ্ন করলেন,

'আপনি বলতে পারেন কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন?' মাথা নেড়ে অস্ফুট স্বরে সে বললো, 'না।' ফ্যাবেল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'তাহলে বুঝলেন তো আত্মহত্যা করা কত অসম্ভব? আত্মহত্যার কারণ আমাদের দু'জনের একজনও জানি না।' কর্ণেল তার দিকে বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'চুপ করুন। ওকে একটু ভাববার সুযোগ দিন তো। আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে আমরা সবাই অন্ধকারে আছি। তাঁর চিঠি পড়েও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনাকে তাঁর কি কথা বলবার আছে লিখেছেন। কি কথা বলতে চেয়েছিলেন আমরা যদি তা জানতে পারি তাহলে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। মিসেস ডানভারসকে চিঠিটা পড়তে দিন। তিনি হয়তো এবিষয়ে কিছু বলতে পারবেন।' ফ্যাবেল পকেট থেকে চিঠিখানি বের করে ডানভারসের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ডানভারস সেটা তুলে নিয়ে দু'বার পড়লো। তারপর মাথা নেড়ে বললো, 'না, তিনি কি বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি না। মিঃ জ্যাককে কোন জরুরী কথা বলবার থাকলে তিনি প্রথমে তা আমাকেই বলতেন।'

'সে রাত্রে আপনি তাঁকে দেখেন নি?'

'না আমি সেদিন কেরিথে গিয়েছিলাম। এজন্য নিজেকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবো না।'

'তাহলে তাঁর মনের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি কিছুই বলতে পারেন না?'

'না।'

'সেদিন লণ্ডনে তিনি সারা দিন কি করেছিলেন সে কথা কেউ জানে কি?'

'রেবেকা আমার ফ্ল্যাটে বেলা তিনটের সময় চিঠি রেখে যায়। দারোয়ান তাকে দেখেছে। তারপর বোধ হয় সোজা সে ম্যাণ্ডারলে চলে এসেছে।' ফ্যাবেল বললো। মিসেস ডানভারস এবার বললো, 'মিসেস

ডি উইণ্টারের বেলা বারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চুল ঠিক করবার জন্য সেলুনে যাবার কথা ছিল। একথা আমার মনে আছে। কারণ আমিই ফোন করে সেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। সাধারণত চুল ঠিক করবার পরে তিনি ক্লাবে খেতে যেতেন। সেদিনও নিশ্চয় দেড়টার পর ক্লাবে গিয়েছিলেন।' কর্ণেল বললেন 'তাহলে ধরে নেওয়া যাক খেতে আধ ঘণ্টা লেগেছে। তাহলে দু'টো থেকে তিনটে পর্যন্ত তিনি কি করেছেন? সেটাই আমাদের জানতে হবে।' ফ্যাবেল আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওঃ! সেদিন সে কি করেছিল তা দিয়ে কি হবে? সে আত্মহত্যা করেনি শুধু এই সত্যটাই প্রমাণ করা দরকার।' মিসেস ডানভারস খুব আস্তে আস্তে বললো, 'তাঁর ডায়েরী আমার কাছে আছে। তিনি তাতে সব লিখে রাখতেন। সেদিন লণ্ডনে কি করেছেন হয়তো সব ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন। এসব ব্যাপারে তিনি খুব নিয়ম মেনে চলতেন। কখন কি করতে হবে লিখে রেখে সেই কাজ শেষ হয়ে গেলে তার পাশে দাগ কেটে রাখতেন। দরকার মনে করলে তাঁর ডায়েরী এনে দিচ্ছি।' কর্ণেল জুলিয়ান ম্যাক্সিমের দিকে তীক্ষ্ণ, কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তাঁর ডায়েরী দেখায় আপনার আপত্তি আছে কি?'

'না।' ডানভারস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা সবাই চুপ করে আছি। আমাদের জীবনের এই চরম সন্ধিক্ষণে আমি যেন মনকে আর স্থির রাখতে পারছিনা। আমিও জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টির বেগ একটু কমে এসেছে। ম্যাণ্ডারলের আঙ্গিনা, বাগান সব জলে জলে টইটম্বুর। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে গাছগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি কাঁপছে। দরজার শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি ডানভারস ডায়েরী হাতে ঘরে ঢুকছে। কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আমার কথাই ঠিক। জীবনের শেষ দিনটিতে তিনি কি কি করেছিলেন সব

এখানে লিখে রেখেছেন।' লাল মলাটের ছোট্ট ডায়েরীর একটি পাতা খুলে সে কর্ণেলের হাতে দিল। তিনি তাঁর চশমা বের করে মন দিয়ে পাতাটি দেখছেন। কি একটা ভীষণ খবর শুনবো বলে আমরা যেন অপেক্ষা করছি অধীরভাবে। সহসা অব্যক্ত আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। আমি ম্যাক্সিমের দিকেও আর তাকাতে পারছি না। ডায়েরীর পাতার মাঝখানে আঙ্গুল রেখে কর্ণেল যখন বলে উঠলেন, 'এই যে—' তখন আমার মনে হোল এখনই বুঝি আমার বুকের স্পন্দন থেমে যাবে! কর্ণেল বলতে লাগলেন, 'হাঁ, মিসেস ডানভারস ঠিকই বলেছেন। বারটায় সেলুন, তার পাশে দাগ কাটা। দেড়টায় ক্লাবে খাওয়া, তার পাশেও দাগ কেটে রেখেছেন। তারপর?—হাঁ, তারপর লেখা রয়েছে 'বেকার, বেলা দু'টো।' বেকার! বেকার কে?' তিনি ম্যাক্সিমের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। ম্যাক্সিম মাথা নাড়লো। ডানভারস বিড় বিড় করে বললো, 'বেকার! বেকার বলে কাউকে তো আমি চিনি না। এ নাম তাঁর মুখে কোনদিন শুনিনি।' কর্ণেল ডায়েরীটা ডানভারসের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি আবার ভাল করে দেখুন তো! তিনি বেকার নামের পাশে খুব স্পষ্ট করে দাগ কেটেছেন। ভদ্রলোক যে-ই হোন না কেন, তিনি তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন।' ডানভারস ডায়েরীর নামটির দিকে তাকিয়ে কেবলই বিড় বিড় করে বলছে, 'বেকার! বেকার! কে এই ভদ্রলোক?' কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে বেকার কে সে কথা জানতে পারলেই আমরা সব জানতে পারবো। আচ্ছা, তিনি কোন সুদখোর মহাজনের পাল্লায় পড়েননি তো?' ডানভারসের চোখে তিরস্কারের দৃষ্টি ফুটে উঠলো। সে, বললো, 'মিসেস ডি উইণ্টার টাকা ধার করবেন? এসব কি বলছেন?'

'তাহলে হয়তো কোন গুণ্ডার কবলে পড়েছিলেন যে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চায়।'

'না, না, তাও হতে পারেনা। কিন্তু কে এই বেকার ?'

'তাঁর কোন শত্রু ছিল না তো ? তিনি কাউকে ভয় করতেন ?'

'মিসেস ডি উইণ্টার ভয় পাবেন! না, জগতে কাউকে তিনি ভয় করতেন না। তাঁর কোন শত্রুও ছিল না। একটি চিন্তা তাঁকে মাঝে মাঝে বড় ভাবিয়ে তুলতো। সেটা ছিল বুড়ো হলে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'যখন আমার যাবার সময় হবে ড্যানী তখন এক নিমেষেই আমি চলে যেতে চাই। প্রদীপে ফুঁ দিলে যেমন পলকে নিভে যায় তেমনই যেন আমার জীবন-দীপ নিভে যায়।' দুর্ঘটনার পর তাঁর ওকথা ভেবেই আমি মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। উল্কার মত তিনি হঠাৎই চলে গেলেন!' ফ্যাবেল এগিয়ে এসে আবার অধৈর্য স্বরে বলে উঠলো, 'এসব কি হচ্ছে ? আসল কথা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। এই বেকার লোকটি কে তা জেনে আমাদের কি পরমার্থ লাভ হবে শুনি ? তার সাথে এই ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? হয়তো নেহাতই একটা বাজে লোক। নাম করা কেউ হলে ড্যানী নিশ্চয় জানতো।' আমি তখন ডানভারসকে লক্ষ্য করছিলাম। সে ডায়েরীর পাতা একের পর এক উল্টে যাচ্ছে। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো, 'এই যে একটা ফোন নম্বর পাওয়া গেছে। লেখা আছে 'বেকার ০৪৮৮।' কিন্তু কোন্ এক্সচেঞ্জ তা লেখা নেই।'

'বাঃ ড্যানী, চমৎকার! তোমার প্রতিভা আছে বলতে হবে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে। একবছর আগে এরকম উৎসাহ দেখাতে পারলে কাজ দিত।' কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'কিন্তু একচেঞ্জের নাম লেখা নেই কেন ?' ফ্যাবেল আবার ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো, 'তাতে কি হয়েছে! লণ্ডনের প্রত্যেকটি এক্সচেঞ্জ চেষ্টা করে দেখলেই তো হয়। সারারাত ধরে তা করতে হলেও আপত্তি নেই। এজন্য টাকা খরচ

করতেও ম্যাক্স দ্বিধা বোধ করবে না, কি বল? যেভাবেই হোক সময় পাওয়া দিয়ে কথা, তাইনা?' তার অবান্তর কথায় কেউ কান দিচ্ছে না। কর্ণেল এবার বলে উঠলেন, 'নম্বরের পাশে এটা কি লেখা রয়েছে দেখুন তো মিসেস ডানভারস। মনে হচ্ছে 'ম', তাই না?' ডানভারস ভাল করে দেখে বললো, 'হাঁ, হতে পারে।' ম্যাক্সিম এতক্ষণ পর ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মেফেয়ার ০৪৮৮ চেষ্টা করে দেখ।'

আমি তেমনই পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। শুনলাম ম্যাক্সিম আবার বলছে, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন ফ্র্যাঙ্ক? যাও।' ফ্র্যাঙ্ক পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললো, 'ওখানে এক ভদ্রমহিলা থাকেন। বেকার নামে কাউকে তিনি চেনেন না।' ডানভারস যন্ত্রের মত বললো, 'এবার মিউজিয়াম ০৪৮৮ দেখুন।' একটু পরে পাশের ঘর থেকে ফ্র্যাঙ্কের গলা শুনতে পেলাম। 'হ্যালো, এটা কি মিউজিয়াম ০৪৮৮? আচ্ছা, এখানে বেকার নামে কেউ থাকতেন কিনা বলতে পারেন? কে কথা বলছে? ও, দারোয়ান? হাঁ, হাঁ, আমাকে তাঁর ঠিকানা দিতে পার? হাঁ, খুব জরুরী দরকার আছে।' সে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'মনে হচ্ছে খোঁজ পেয়েছি।'

না, না, এযেন সত্য না হয়। বেকারকে যেন খুঁজে না পাওয়া যায়। বেকার যেন মরে গিয়ে থাকেন। আমি যে জানি বেকার কে। প্রথম থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। রেবেকা কেন তাঁর কাছে গিয়েছিল তাও আমি জানি। এতক্ষণ ধরে মনে প্রাণে প্রার্থনা করছিলাম যেন তাঁর খোঁজ না পাওয়া যায়! কিন্তু একি হোল! এখন কি হবে···আবার ফ্র্যাঙ্কের গলা শুনতে পাচ্ছি, 'হাঁ, আমি লিখে নিচ্ছি ঠিকানা, কি বানান? ও হাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' সে এবার এক টুকরো কাগজ হাতে এঘরে ঢুকলো। ফ্র্যাঙ্ক তো জানে না সে

যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তারই মৃত্যুদণ্ড লেখা রয়েছে ঐ এক টুকরো কাগজে! সমস্ত সন্ধ্যা ধরে যে চেষ্টা চলেছে, ঐ কাগজে তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে ম্যাক্সিমকে ধ্বংস করবার জন্য। এ যেন অন্ধকারে ভুল করে পেছন দিক থেকে ম্যাক্সিমের বুকে কেউ ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে! উঃ! কি হবে এখন! আর যে আমি ভাবতে পারিনা! শুনছি ফ্র্যাঙ্ক বলছে, 'দারোয়ান বললো ওখানে কোন বসত বাড়ি নেই। বাড়িটা দিনের বেলায় ডাক্তারের 'কনসাল্টিং রুম' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ডাঃ বেকার এখন চিকিৎসা ছেড়ে দিয়েছেন। প্রায় ছ'মাস আগে তিনি ও জায়গা ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবো। দারোয়ান তাঁর ঠিকানা বলেছে। এই যে তাঁর ঠিকানা লিখে নিয়েছি।'

॥ ২৫ ॥

ফ্র্যাঙ্কের কথা শেষ হতেই ম্যাক্সিম আমার দিকে তাকালো। আজ সন্ধ্যায় এই প্রথম সে আমার দিকে তাকালো। তার সেই চাহনিতে চিরবিচ্ছেদের ইঙ্গিত! আমরা দু'জন দু'জনের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছি। আমাদের চারপাশের পরিবেশকে এই মুহূর্তে নিঃশেষে ভুলে গেলাম। অনন্তকালের এই একটি পল অনুপল যেন শুধুই আমাদের দু'জনের, জগত সংসার আর সব মিছে। এই একটি মুহূর্তই—তারপর ম্যাক্সিম ফ্র্যাঙ্কের দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে বললো, 'বেশ করেছ। ঠিকানাটা কি?'

'লণ্ডনের উত্তরে বারনেটের কাছে। কিন্তু ফোন নেই ওখানে।' কর্ণেল এবার ডান্‌ভারসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন এবিষয়ে কিছু

বলতে পারেন ?' সে মাথা নেড়ে বললো, 'মিসেস ডি উইন্টারের কখনও ডাক্তারের প্রয়োজন হোতনা। ডাক্তার বেকারের নাম আমি কখনও শুনিনি।' ফ্যাবেল বলে উঠলো, 'লোকটা সত্যি ডাক্তার কিনা তাই বা কে জানে। রেবেকার কোন অসুখ করলে ড্যানীকে সে নিশ্চয় বলতো।' ফ্র্যাঙ্ক বললো, 'বেকার সামান্য লোক নন। দারোয়ানটি বললো ডাক্তার বেকার একজন বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।' কর্ণেল চিন্তিতভাবে বললেন, 'হু। তাহলে তাঁর একটা কিছু অসুখ নিশ্চয়ই করেছিল। কিন্তু এটাও ভারি অদ্ভুত যে একথা তিনি কাউকে বলেননি।'

ফ্যাবেল বললো, 'সে অবশ্য দেখতে রোগাই ছিল। আমি তাকে একথা বললে সে হেসে উড়িয়ে দিত আর বলতো তাতেই নাকি তাকে বেশি মানায়। হয়তো ডাক্তার বেকারের কাছে খাওয়া দাওয়া বিষয়ে পরামর্শ নিতে গিয়েছিল।' বেকারের কথা জানার পর থেকে ডানভারস কেমন হতবাক, বিহ্বল হয়ে গেছে। একটু পরে সে বললো, 'তিনি তো আমার কাছে কোন কথা গোপন করতেন না।' কর্ণেল বললেন, 'হয়তো আপনাকে তিনি চিন্তিত করতে চাননি। হয়তো ভেবেছিলেন ফিরে এসে আপনাকে সব বলবেন।' ডানভারস হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, 'মিঃ জ্যাকের কাছে চিঠিতে তিনি লিখেছেন 'তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।' তাহলে তিনি কি তাকেও সেই কথা বলতে চেয়েছিলেন ?' কর্ণেল বলে উঠলেন, 'হাঁ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ডাক্তার বেকারের সাথে সাক্ষাতকারের ফলাফল তিনি মিঃ ফ্যাবেলকে বলতে চেয়েছিলেন।' ফ্যাবেল এবার উৎসাহভরে বলে উঠলো, 'হাঁ, আপনার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। চিঠি এবং ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাত, এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার কি অসুখ করেছিল সেটাই যে জানা দরকার।' তারা একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের দিকে তাকাতে সাহস করলাম না।

নড়তেও ভয় পাচ্ছি পাছে তারা আমার মুখের ভাব দেখে সত্যকে জেনে ফেলে! ম্যাক্সিমও কিছু বললো না। সে আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার, নিথর বাগানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে কি ভাবছে কে জানে! বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে মাটিতে ঝরে ঝরে পড়ছে।......

নীরবতা ভেঙ্গে ক্র্যাঙ্কই প্রথম কথা বললো, 'ডাক্তার বেকারকে চিঠি লিখে সব জানা যায়।' কর্ণেল বললেন, 'না। তাতে কোন ফল হবে না। ডাক্তাররা তাঁদের রোগীদের বিষয় অন্যদের কিছু জানান না, এটাই তাঁদের রীতি। তাঁর কাছ থেকে কিছু জানতে হলে একটি মাত্র উপায় আছে। তা হোল ডি উইণ্টার তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলে সেদিনকার কথা জানতে চাইবেন। আপনি কি বলেন ডি উইণ্টার?' ম্যাক্সিম জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললো, 'আপনি যা বলবেন তাই হবে।' ফ্যাবেল বলে উঠলো, 'যে ভাবেই হোক জীবনের আরও কটা দিন মেয়াদ বাড়াবার জন্য ম্যাক্স সব কিছুই করতে প্রস্তুত, তাই না? মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় হাতে পেলেও তো কত কিছু করে ফেলা যায়!' লক্ষ্য করলাম ডানভারস ফ্যাবেল আর ম্যাক্সিমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সহসা আমার মনে পড়লো ফ্যাবেলের অভিযোগের কথা ডানভারস জানে না। কিন্তু এখন সে একটু একটু করে বুঝতে আরম্ভ করেছে। তার মুখের কঠিন ভাব দেখেই বুঝতে পারলাম এখন তার বুঝতে কিছু বাকি নেই। প্রথম তার চোখে মুখে একটু সন্দেহের ছায়া পড়লো, তারপর ঘৃণা আর অবজ্ঞার ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। সে অপলক ম্যাক্সিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে আর নূতন করে আমাদের কি ক্ষতি করবে? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ম্যাক্সিম তার সেই সাপের মত ক্রুর দৃষ্টি লক্ষ্য করলো না। সে তখন কর্ণেল জুলিয়ানকে বলছে,

'কাল সকালেই আমি তাঁর খোঁজে রওনা হবো।' ফ্যাবেল একটু হেসে বললো, 'কিন্তু একা যেতে পারবেনা। ইন্সপেক্টার ওয়েলস সঙ্গে গেলে আমার আপত্তি নেই।' ডানভারস তখনও কেন ম্যাক্সিমের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে! ফ্র্যাঙ্কও এবার ডানভারসের এই অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে। বিস্ময়ের সাথে সাথে একটা দুর্ভাবনার ভাব তার চোখে মুখে প্রকাশ পেল। ডাক্তার বেকারের ঠিকানা লেখা কাগজটির দিকে আর একবার তাকিয়ে সে ম্যাক্সিমের দিকে তাকালো। তার বিবর্ণ মুখখানি দেখে আমি অনুভব করতে পারলাম তার মনেও একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মেরেছে। কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'ইন্সপেক্টার ওয়েলসকে এসব ব্যাপারের মধ্যে আনার মত পরিস্থিতি এখনও হয়নি।' তাঁর কথাগুলি কেমন কঠিন, কর্কশ শোনালো। তিনি আবার বললেন, 'আমি ডি উইণ্টারের সাথে গেলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন তো?' ফ্যাবেল ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে আবার কর্ণেলের দিকে তাকালো। সে যেন মনে মনে কি ভাবছে। তার চোখে মুখে একটা জয়ের হাসিও উপচে পড়ছে! তারপর সে বললো, 'হাঁ, তাহলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমিও আপনাদের সাথে যাব।'

'তাহলে আপনাকে গম্ভীর, ভদ্র হয়ে থাকতে হবে তা বলে দিচ্ছি।'

'ভয় নেই! আমি খুব গম্ভীর থাকবো দেখবেন, একেবারে জজ-সাহেবের মত গুরু গম্ভীর! এখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই ডাক্তার বেকারই আমার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন।' কর্ণেল ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল সকালে আমরা ন'টায় রওনা হবো, কেমন?'

'বেশ।'

ফ্যাবেল বললো, 'আজ রাত্রে ম্যাক্স যদি কোথাও পালিয়ে যায়? আশ্চর্য কি! গাড়ি করে রাতারাতি উধাও হলেই হোল।'

ম্যাক্সিম জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কথাই কি আপনার কাছে যথেষ্ট নয়?' এই প্রথম কর্ণেল যেন একটু দ্বিধায় পড়লেন। তিনি ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকালেন। ম্যাক্সিমের মুখ রাগে অপমানে লাল হয়ে উঠলো। তার কপালের শিরাগুলি এক মুহূর্তের জন্য দপদপ করে জেগে উঠলো। কিন্তু নিজেকে সংযত করে ডানভারসের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আজ রাতে আমরা শুতে গেলে তুমি নিজে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে যেও। কাল সকাল সাতটায় ডেকে দেবে।' কর্ণেল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সেই ভাল। আমি কাল এখানে আসবো। আপনার গাড়িতেই যাব, কেমন?'

'হাঁ।'

'মিঃ ফ্যাবেল, আপনি আপনার গাড়িতেই আসছেন তো?'

'হাঁ। আপনাদের পেছন পেছন যাব। কোন চিন্তা নেই।'

কর্ণেল এবার আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার জন্য সত্যি খুব দুঃখিত। এখন আপনার স্বামীকে তাড়াতাড়ি শুতে নিয়ে যান। কাল সারাদিন বড় পরিশ্রম হবে।' এক মুহূর্তের জন্য আমার হাত ধরে অভিবাদন জানিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার চোখের দিকে সোজা তাকালেন না। ফ্র্যাঙ্কও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ফ্যাবেল টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট নিয়ে তার কেসে ভরতে ভরতে বললো, 'আমাকে আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যেতে আমন্ত্রণ করা হবে না বলেই মনে হচ্ছে। হোটেলেই রাতটা কাটাতে হবে দেখছি। কি আর করবো, কালকের আশা নিয়ে রাতটা কোন মতে কাটাবো। আচ্ছা, এখন তাহলে চলি। ড্যানী, তুমি মিঃ ডি উন্টাররের ঘরের দরজায় তালা লাগাতে ভুলে যেও না যেন!' তারপর আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিতেই আমি ভয় পেয়ে হাত পেছনে সরিয়ে নিলাম। সে হেসে উঠে বললো, 'আমার মত একটা বাজে লোক এসে আপনার সব আনন্দ নষ্ট

করে দিল, তাই না ? ভাববেননা, যখন কাগজওয়ালারা কাগজে কাগজে আপনার জীবনী ছাপবে, বড় বড় শিরোনামা দিয়ে লিখবে, 'মন্টিকার্লো থেকে ম্যাণ্ডারলে,' 'হত্যাকারীর তরুণী স্ত্রীর অভিজ্ঞতা', ইত্যাদি, তখন কেমন রোমাঞ্চ জাগবে আপনার মনে ! তারপর ভাগ্যও রাতারাতি বদলে যাবে, কি বলেন ?' দরজার দিকে যেতে যেতে সে ম্যাক্সিমের দিকে হাত নেড়ে বললো, 'আচ্ছা, যাচ্ছি তাহলে। বন্ধ ঘরে যতটা সম্ভব আজ শেষ রাতটা উপভোগ করে নাও।' বিশ্রী হাসি হেসে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডানভারসও তাকে অনুসরণ করলো।

এখন শুধু আমি আর ম্যাক্সিম। সে জানালার সামনে তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন সে আমার কাছে আসছে না ? আমি এবার বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।' সেখান থেকেই সে আস্তে বললো, 'হা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।' ফ্র্যাঙ্ক ঘরে ঢুকে বললো, 'তারা সব চলে গেছে।'

'আচ্ছা।'

'আমাকে কি করতে হবে বল। আমি সারা রাত এখানে জেগে বসে থাকবো। তুমি যা বলবে তাই করবো।'

'তুমি এত ব্যস্ত হোয়ো না ফ্র্যাঙ্ক। তোমার কিছু করবার নেই। এখনও কিছু করবার মত সময় আসেনি। কালকের পর অনেক কিছু করবার থাকবে। আজ রাতে আমরা দু'জনে একলা থাকতে চাই। আজ রাতটা শুধু আমাদের দাও। আমার মনের কথা তুমি বুঝবে হয়তো।'

'হা, বুঝেছি।' দরজার কাছে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে আস্তে আস্তে চলে গেল। ফ্র্যাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্সিম আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। সে আমাকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইলো। এ ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে

রইলাম কোন কথা না বলে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে দু'জন দু'জনকে উপলব্ধি করছি। আমি তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আমার জীবন দিয়েও তার সমস্ত লজ্জা, অপমান, বেদনা আর অন্তর্জ্বালা জুড়িয়ে দিতে চাই। অনেকক্ষণ পর সে চুপি চুপি বললো, 'গাড়িতে তুমি আমার পাশে বসবে।'

'হাঁ, বসবো।'

'কালকের রাতটাও আমরা পাব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তারা কিছু করে ফেলতে পারবে না।'

'হাঁ।'

'আজকাল অত কড়াকড়ি নিয়ম নেই। সেখানেও দেখা করতে দেয় শুনেছি।'

'হাঁ।'

'আমি তাদের সব ঘটনা খুলে বলবো।' এমন সময় ফার্থ ঘরে ঢুকে বললো, 'খাবার দেওয়া হয়েছে।'

সেই সন্ধ্যার প্রতিটি খুটিনাটি ঘটনা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। খাওয়া শেষ হলে লাইব্রেরি ঘরে বসে কফি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। এবার আমিই ফোন ধরতে গেলাম। বিয়েট্রিস কথা বলছে। 'কে? তুমি? কতবার ফোন করবার চেষ্টা করেছি। শোন, দু'ঘণ্টা আগে সন্ধ্যাবেলাকার কাগজে তদন্তের রায় পড়ে আমরা খুব অবাক হয়ে গেছি। ম্যাক্সিম কি বলে!'

'কি আর বলবে!'

'কিন্তু এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! রেবেকা কেন আত্মহত্যা করবে? তার মত মেয়ে একাজ করতেই পারে না। কোথাও একটা সাংঘাতিক ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'কি জানি।'

'ম্যাক্সিম কি বলে ? সে কোথায় ?'

'এখানে এতক্ষণ অনেকে ছিলেন। কর্ণেল জুলিয়ান এবং আরও অনেকে। ম্যাক্সিম খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা কাল সকালে লণ্ডন যাচ্ছি।'

'কেন ? কি হোল ?'

'ঐ রায় সংক্রান্ত কি ব্যাপারে। আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না।'

'না, না, এরকম হতেই পারে না। ম্যাক্সিমের পক্ষেও এ খুব খারাপ হোল। এরকম বিরুদ্ধ প্রচারে তার সুনাম নষ্ট হবে।'

'উপায় কি !'

'কর্ণেল জুলিয়ান কিছু করতে পারেন না ? তিনি তো ম্যাজিস্ট্রেট। বুড়ো করোনারের মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। রেবেকার আত্মহত্যার কারণ কি ? জীবনে এমন অদ্ভুত অসম্ভব কথা আর শুনিনি। গাইলস বলছে পাহাড়ে ধাক্কা লেগেই ঐ গর্তগুলি হয়েছে।'

'কিন্তু তারা তা মনে করে না।'

'ওঃ ! আমি যদি আদালতে উপস্থিত থাকতে পারতাম তাহলে শেষ পর্যন্ত তাদের বুঝিয়ে ছাড়তাম ! ম্যাক্সিম কি খুব মুসড়ে পড়েছে ?'

'না। তবে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'আমি তোমাদের সঙ্গে লণ্ডনে যেতে পারলে ভাল হোত। কিন্তু রোজারের জর এখনও কমেনি।'

'না, না, তোমাকে আসতে হবে না। সে চেষ্টাও কোর না।'

'লণ্ডনে কোথায় থাকবে ?'

'জানি না। এখনও কিছু ঠিক হয়নি।'

'ম্যাক্সিমকে বলবে রায়টা বদলাবার জন্য যেন সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আমাদের পরিবারের পক্ষেও এটা মস্তবড় কলঙ্কের কথা। রেবেকা

আত্মহত্যা করতেই পারে না। আমি নিজে করোনারকে চিঠি লিখবো ভাবছি।'

'না, না, ওসব কোর না। এখন আর কোন লাভ নেই।' লাইব্রেরি থেকে ম্যাক্সিমের অধৈর্য স্বর শুনতে পেলাম, 'কি এত কথা বলছে বী? চলে এসো তুমি।' আমি এবার অনুপায় হয়ে বলে ফেললাম, 'আমি তোমাকে লণ্ডন থেকে আবার ফোন করে জানাবো। এখন যাচ্ছি।'

'না, না, শোন। তোমাদের ওদিককার পার্লামেণ্টের সদস্যকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ম্যাক্সিমকে জিজ্ঞেস কর এ বিষয়ে তাঁকে কিছু বলবো?'

'না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না লক্ষ্মীটি। তুমি এত ভেব না।' ফোন ছেড়ে দিলাম। সহসা আমার মনে হোল আমাদের এতবড় দুঃখের মধ্যেও এটা একটা মস্ত সৌভাগ্য যে বিয়েট্রিস আজ আমাদের সঙ্গে নেই! অবসন্ন দেহভার কোনও মতে টেনে নিয়ে চললাম লাইব্রেরির দিকে। কয়েক মিনিট পর আবার ফোন বেজে উঠলো। আমি আর যাবনা স্থির করলাম। ফোন যতক্ষণ পারে বাজুক। আমি তার পায়ের কাছে মেঝের ওপর বসে আছি। ফোন বেজেই চলেছে। তারপর এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো। সহসা ম্যাক্সিম আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে তুলে নিল। আমরা দু'জন দু'জনকে চুমু দিচ্ছি ব্যাকুলভাবে প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরে। গোপন ভালবাসার প্রথম উচ্ছ্বাসের মত নিবিড় করে দু'জন দু'জনকে অনুভব করছি······

॥ ২৬ ॥

পরদিন সকাল ছ'টায় আমার ঘুম ভাঙ্গলো। বিছানা থেকে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাগানে সবুজ ঘাসের বুকে বিন্দু বিন্দু শিশির জমে জমে পেঁজা তুলোর মত দেখাচ্ছে। কুয়াশার শুভ্র আচ্ছাদনে গা ঢেকে দূরের গাছগুলি অস্পষ্ট ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে মুখে সকালবেলাকার ঠাণ্ডা হাওয়া তার মৃদু পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। ম্যাণ্ডারলের আকাশে বাতাসে শরতের আগমনীর সুর বেজে উঠেছে!...গোলাপেরা লম্বা ডাঁটির মাথায় মুখ নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো, বিবর্ণ পাপড়ির দল এখনই বুঝি ঝরে ঝরে লুটিয়ে পড়বে ভিজে নরম মাটির বুকে। কালকের মুষলধারা বৃষ্টি বাগানটিকে ধুয়ে মুছে তকতকে করে দিয়েছে। সকালবেলাকার এই স্নিগ্ধ, শান্ত অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে কালকের অবাঞ্ছিত ঘটনাপ্রবাহকে আজ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অবাস্তব, অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। সে যেন শুধুই এক রাত্রির দুঃস্বপ্ন, জেগে উঠলেই যার বিভীষিকা নিমেষে মিলিয়ে যায়!......

আজ সূর্য ওঠার সাথে সাথে ম্যাণ্ডারলের একটি নূতন দিনের সুরু হোল। ম্যাণ্ডারলের আলো ঝলমল প্রকৃতি রোজকার মতই হেসে উঠলো। আমাদের দুঃখ দুর্ভাবনার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই তো! ঊষার আলো ফুটে ওঠবার সাথে সাথে পাখিরা সব জেগে উঠেছে। ঐ যে একটি কোকিল গান গাইতে গাইতে বাগানের ওপর দিয়ে আঙ্গিনার দিকে উড়ে চলে গেল। আরও কত নাম না জানা পাখি একে অন্যের পেছনে উড়ে চলেছে বোধহয় দিনের খাবার জোগাড় করতে। বাগানের কোথা থেকে একদল চড়ুইয়ের কিচির-মিচির শুনতে পাচ্ছি। নীল

আকাশের বুক চিড়ে ঐ যে একটি গাংচিল ভেসে চলেছে অরণ্য পার হয়ে হ্যাপিভ্যালির দিকে। আমাদের দুঃখ, বেদনা ওদের জীবনধারার সহজ আনন্দে এতটুকুও দাগ কাটতে পারে না! আর কিছুক্ষণ পরে ম্যাণ্ডারলের রোজকার জীবনধারাতেও স্পন্দন জাগবে! মালিরা জেগে উঠে বাগান, আঙ্গিনার ঝরা পাতা কুড়োবে। পরিচারিকারা ঘরের দরজা, জানালা খুলে দিয়ে পর্দাগুলি সরিয়ে দেবে। জেসপার আর তার মা ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙ্গে অলিন্দে গিয়ে দাঁড়াবে। রবার্ট রোজকার মত আমাদের চা, খাবার পরিবেশন করবে। রান্না-ঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠতে থাকবে। সকালবেলাকার কুয়াশা একটু একটু করে কোথায় যাবে মিলিয়ে! অরণ্যের গাছগুলি আর সাগর সৈকত আস্তে আস্তে চোখের সামনে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হবে। সাগরের নীল জলের কোলে শুভ্র ফেনার বুকে সূর্যের আলো ঝিকমিক করে উঠবে।

প্রকৃতির লীলানিকেতন ম্যাণ্ডারলের নিরালা এই শান্ত পরিবেশ, অপরূপ সৌন্দর্য, মাধুর্য আর ঐতিহ্য চিরকালের সম্পদ! আমরা দুঃখ পেতে পারি, কাঁদতে পারি, আমাদের জীবন লাঞ্ছনা আর অপমানে শেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ম্যাণ্ডারলের এই প্রশান্তি ও সৌন্দর্য কোন দিন এতটুকুও ম্লান হবে না! আপন মহিমায়, আপন গৌরবে ম্যাণ্ডারলে চিরকাল এমনি অতুলনীয় থাকবে! ম্যাণ্ডারলের বাগানে উপবনে কত ফুল ফুটে ঝরে যাবে, আবার কচি সবুজ পাতার কোলে কুঁড়ি জন্মাবে, পাখিরা চিরদিন ম্যাণ্ডারলের অরণ্যে নীড় বাঁধবে! গাছগুলি আজকের মতই ফুলে ফলে সজ্জিত হয়ে উঠবে! বনে বাগানে রঙীন প্রজাপতির দল এমনি আনন্দে নেচে বেড়াবে! ভ্রমরেরা ফুলের মধু খেয়ে গুন-গুনিয়ে যাবে! গভীর অরণ্যের লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র সুন্দর খরগোসেরা উঁকি মেরে এদিক ওদিক পালাবে, খেলা করবে! লিলাক,

ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রনেরা ফুটবে অজস্রভাবে, ঝরে পড়বে মাটির বুকে, আবার ফুটবে; ম্যাণ্ডারলের হাওয়ার সাথে মিতালী করে তাদের সৌরভ ছড়িয়ে দেবে দিকে দিকে!

ম্যাণ্ডারলে! চিরসুন্দর ম্যাণ্ডারলে, মায়াপুরী ম্যাণ্ডারলে! তার একদিকে নিবিড় অরণ্য-প্রহরী, আর একদিকে অনন্ত সাগরের নীলাম্বু জলরাশির দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর! ম্যাণ্ডারলে, আমার ম্যাণ্ডারলে, তোমায় আমি ভালবেসেছি! আমাদের দুঃখ বেদনায় তোমার কোন বিকার নেই, ক্ষতি নেই! তবুও আমাদের দু'জনের জীবন ভরে তুমি আছ।...

আমি কতক্ষণ এভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সহসা আমার চমক ভাঙ্গলো, চিন্তার সূত্র গেল ছিঁড়ে। ম্যাক্সিম তখনও ঘুমোচ্ছে। তাকে ডাকলাম না। আজ সমস্ত দিন না জানি কত পরিশ্রম হবে। ঘুমোক, যতক্ষণ পারে ঘুমিয়ে নিক। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তো আমাদের রওনা হতে হবে, ম্যাণ্ডারলে থেকে লণ্ডন! কম দূরের পাড়ি নয়। জানিনা যাত্রা শেষে আমাদের ভাগ্যে কি আছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। যাঁর কাছে চলেছি তাঁকে কোনদিন আমরা দেখিনি। তিনিও আমাদের দেখেননি। কিন্তু তাঁরই হাতের মুঠোয় রয়েছে আমাদের ভবিষ্যত, আমাদের জীবন-মরণ! আশ্চর্য!....

স্নান ঘরে ঢুকে স্নান করতে করতে সহসা আমার মনে হোল এখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন কত মূল্যবান! এই স্নানের ঘর, স্নানের সাজ সরঞ্জাম, সবই যেন আমি শেষবারের মত দেখে নিচ্ছি। শোবার ঘরে গিয়ে যখন পোশাক বদলাতে লাগলাম তখন দরজার কাছে পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। ডানভারস এসে তালা খুলে দিয়ে গেল। তাহলে সে ভুলে যায়নি! কাল রাতেও এরকম শব্দ শুনেছিলাম। আমি যেন কঠিন এক ধাক্কায় রূঢ় বাস্তবকে সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়াবহতার মুখোমুখি হলাম। একটু পরে ক্র্যারিস এসে

আমাদের চা দিয়ে গেল। এবার আর তাকে না জাগিয়ে পারলাম না। চোখ মেলে সে প্রথমে আমার দিকে অবোধ শিশুর মত অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।...

দু'জনে পাশাপাশি বসে নীরবে চা খেলাম। চা খাওয়ার পর সে স্নান করতে গেল। আমি যন্ত্রচালিতের মত স্যুটকেসে জিনিসপত্র ভরতে লাগলাম। লণ্ডনে হয়তো আমাদের দু'একদিন থাকতেও হতে পারে। রোজকার ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস, পোশাক পরিচ্ছদ স্যুটকেসে ভরে নিলাম। কেবলই মনে হচ্ছে আর বুঝি এঘরে আসবো না। আমাদের বিছানার দিকে তাকিয়ে আমার মন কেমন এক অব্যক্ত শূন্যতায় কেঁদে উঠলো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সহসা আমাদের শোবার ঘরটি আর একবার দেখে আসবার অদম্য একটা আকাঙ্ক্ষা হোল। আমি আবার ফিরে এলাম। ঘরের মাঝখানে কয়েকটি মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের শূন্য বিছানা, খোলা আলমারি, টেবিলের ওপর খালি চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনের মধ্যে গভীরভাবে এঁকে রাখবো বলে ঘরের প্রতিটি জিনিস শুধু দু'চোখ ভরেই দেখছি না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে নিচ্ছি। এদের সাথে আমার যেন চিরবিচ্ছেদ হচ্ছে! এখানকার প্রতিটি জিনিসের কি মোহ, কি আকর্ষণ জানি না। মনটা কেঁদে কেঁদে গুমড়ে মরছে। কিন্তু মন যেতে না চাইলেও যেতে হবে। আস্তে আস্তে নিচে নেমে খাবার ঘরে ঢুকলাম। ম্যাক্সিম এসে বসেছে। আমরা নীরবে খেয়ে চলেছি। সে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আমি অলিন্দে এসে দাঁড়ালাম। মৃদুল হাওয়ায় ভিজে ঘাস আর ফুলের সুবাস জড়িয়ে আছে। নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি বেলা বাড়ার

সঙ্গে সঙ্গে আজকের দিনটি আলো ঝলমল হয়ে উঠবে। এমন সুন্দর দিনে দুপুরে খাবার আগে দু'জনে কতদিন ভ্যালিতে বেড়াতে গেছি! খাবার পর বাদাম গাছের তলায় বই কাগজপত্র কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছি ম্যাণ্ডারলের সবুজ শোভার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে,. আজ এই মুহূর্তে নূতন করে আবার সব মনে পড়ছে কেন! এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে ম্যাণ্ডারলের জীবনে আমার যা কিছু মধুর স্মৃতি, আনন্দের অনুভূতিকে মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলাম। ম্যাক্সিমের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে চললাম। সেখানে গিয়ে দেখি ফ্র্যাঙ্ক তাকে বলছে, 'কর্ণেল জুলিয়ান ফটকের সামনে অপেক্ষা করছেন।' একটু চুপ করে থেকে আবার সে বললো, 'আমি সারাদিন অফিসে বসে তোমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করবো। ডাঃ বেকারের সাথে দেখা হবার পর লণ্ডনে আমাকে তোমার দরকার হতে পারে।' আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আপনার খুব কষ্ট হবে।'

'না। কোন কষ্ট হবেনা।' আমি জেসপারের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম। জেসপার করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ককে বললাম, 'ওকে আপনার কাছে নিয়ে যান। বাড়িতে একা থাকতে ওর কষ্ট হবে।

'হাঁ নিয়ে যাব।'

ম্যাক্সিম বললো, 'আমাদের আর দেরি করা উচিত হবেনা।'

আমি তার পাশে উঠে বসলাম। ফ্র্যাঙ্ক গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। ম্যাক্সিমের দিকে চেয়ে বললো, 'তুমি আমাকে ফোন করবে তো?'

'হাঁ, করবো।' আমি পেছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ফার্থ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, রবার্ট তার পেছনে। অকারণেই আমার দু'চোখ জলে ভরে এলো। গাড়ি চলতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়ে কর্ণেল

জুলিয়ানকে উঠিয়ে নেওয়া হোল। তিনি পেছনে বসলেন। আমাকে দেখে তিনি বেশ অবাক হয়েছেন মনে হোল।

'আপনি না এলেই ভাল করতেন।'

'আমি একা থাকতে পারবো না।'

তিনি এবিষয়ে আর কোন কথা বললেন না। গাড়ির এক কোণে আরাম করে বসে বললেন, 'ফ্যাবেল বলেছে চৌমাথায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। তাকে ওখানে না দেখলে আমরা এগিয়ে যাব। আমার তো মনে হয় এখন সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।' আমাদের গাড়ি চৌমাথায় এসে পড়লো। দূর থেকেই ফ্যাবেলের সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দমে গেলাম। আমিও ভেবেছিলাম সে হয়তো ঠিক সময় মত আসতে পারবে না। আমাদের দেখে সে হাত নেড়ে হেসে উঠলো। আমি ম্যাক্সিমের হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে আছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাইলের পর মাইল আমরা চলেছি! কর্ণেল মাঝে মাঝে বেশ ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। ফ্যাবেলের গাড়ি ঠিক আমাদের পেছন পেছন আসছে।

দুপুরবেলা বড় রাস্তার ওপর এক হোটেলে আমরা খেয়ে নিলাম। বেলা তিনটের পর লণ্ডনের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলাম। এখন বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বাইরের কোলাহলে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। শুকনো রাস্তাঘাট আর গাছগুলির রুক্ষ চেহারা দেখে বুঝলাম এখানে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। চারধারে দোকানপাট গিস্‌গিস্‌ করছে। রাস্তায় ফেরীওয়ালারা চীৎকার করছে। লরির পেছনে ছোট ছোট ছেলের দল ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। কত লোক, কত কোলাহল! কর্মব্যস্ত লণ্ডন নগরীর হাওয়াতেও যেন মানুষের বিষাক্ত ক্লান্ত নিঃশ্বাসের উত্তাপ!

আমাদের পথের কি শেষ নেই! চলেছি তো চলেছি। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হতে লাগলো আমার মাথায় কেউ যেন আঘাত করছে! আমার চোখ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে! ম্যাক্সিমের কথা ভেবে আমার কান্না

পাচ্ছে। তার বিবর্ণ চেহারায় রাজ্যের ক্লান্তি এসে জমাট বেঁধেছে। চোখের কোলে ঘন হয়ে কালি পড়েছে। সে কোন কথা বলছে না। কর্ণেল জুলিয়ান মাঝে মাঝে ঘড় ঘড় শব্দ করে নাক ডাকছেন। সেই বিশ্রী শব্দে কেমন এক অসোয়াস্তিতে আমার মন ভরে গেল। ইচ্ছে হোল ধাক্কা দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিই। হ্যাম্পস্টেড ছাড়িয়ে যাবার পর কর্ণেল তাঁর পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে ম্যাক্সিমকে বারনেটের পথের নির্দেশ দিতে লাগলেন। তারপর বারনেটে পৌঁছে কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামিয়ে পথচারীদের প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'গোলাপনিবাস কোন্ বাড়িটা বলতে পারেন? ডাক্তার বেকারকে চেনেন?' কেউ কিছু বলতে পারলো না। ম্যাক্সিমের দিকে তাকালাম। তাকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখখানি কঠিন, ভাবহীন। শেষ পর্যন্ত একজন ডাক পিয়ন আমাদের ডাক্তারের বাড়ি দেখিয়ে দিল। আইভি-লতায় ঘেরা মাঝারি আকারের একটি বাড়ি, তার পাশ দিয়ে কতবার ঘুরে গেছি। কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'এখন পাঁচটা বেজে বার মিনিট। তাঁরা নিশ্চয় চা খাচ্ছেন। বাইরে বরং একটু অপেক্ষা করা যাক।' ম্যাক্সিম গাড়ি থেকে নেমে পথের ওপর দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। আমিও নেমে তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। একটি ছেলে সাইকেল চড়ে শিস দিতে দিতে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কাছেই কোন গির্জার ঘড়িতে সোয়া পাঁচটার বাজনা বাজছে। একটু দূরে ফ্যাবেল তার গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কিছুক্ষণ পর কর্ণেল গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'আচ্ছা এবার চলুন।' আমরা এগিয়ে চললাম। বাড়ির দরজার সামনে এসে কর্ণেল ঘণ্টা বাজালেন। একটু পরে পরিচারিকা এসে দরজা খুলে আমাদের দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। কর্ণেল প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তার বেকার এখানে থাকেন?'

'হঁা। আসুন, ভেতরে অসুন।' আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ঘরখানি মাঝারি ধরনের বসবার ঘর। আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করছি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন অন্য কেউ। আমার দুর্ভাবনা, ভয়, বেদনাবোধ, সবই যেন লোপ পেয়েছে। নিষ্প্রাণ পুতুলের মত শূন্য মন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি শুধু। একটু পরে দরজা ঠেলে একজন সৌম্য, শান্ত চেহারার বুড়ো ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আমাদের দেখে তাঁর চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠলো। তিনি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল বলে কিছু মনে করবেন না। আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।' তিনি আমার দিকে তাকাতেই আমি একটি চেয়ারে বসে পড়লাম। কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। ইনি মিঃ ডি উইণ্টার, ইনি মিসেস ডি উইণ্টার আর উনি মিঃ ফ্যাবেল। আপনি নিশ্চয় কাগজে মিঃ ডি উইণ্টারের নাম পড়ে থাকবেন।'

'ও, হাঁ, মনে পড়ছে। একটা তদন্ত হচ্ছিল, তাইনা? আমার স্ত্রী একদিন কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলেন।' ফ্যাবেল এবার তাঁর কাছে গিয়ে বললো, 'জুরীরা আত্মহত্যা বলে দিয়েছে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। মিসেস ডি উইণ্টার সম্পর্কে আমার বোন। তাকে আমি খুব গভীরভাবে জানতাম। সে কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না। আমরা আপনার কাছে জানতে এসেছি তার মৃত্যুর দিন কেন সে আপনার কাছে এসেছিল।' ম্যাক্সিম ফ্যাবেলের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললো, 'তুমি চুপ কর। আমি ডাক্তার বেকারকে সব বুঝিয়ে বলছি।' তারপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে বলতে লাগলো, 'আমার স্বর্গগতা স্ত্রীর ভাই মিঃ ফ্যাবেল তদন্তের রায় শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আমার স্ত্রীর ডায়েরীতে আপনার নাম, ফোন নম্বর লেখা রয়েছে দেখে আমরা আপনার কাছে এসেছি। তাঁর জীবনের শেষ দিনে বেলা

দু'টোর সময় তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি কেন এসেছিলেন, আপনার কাছ থেকে আমরা তা-ই জানতে চাই।' ডাক্তার বেকার এতক্ষণ বেশ মন দিয়ে তার কথা শুনছিলেন। কিন্তু তার কথা শেষ হতেই তিনি মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় আপনারা ভুল করছেন। ডি উইন্টার নামে কোন রোগী কোনদিন আমার কাছে আসেননি।' কর্ণেল জুলিয়ান তাঁর ব্যাগ থেকে সেই কাগজের টুকরোটি বের করে ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই যে এখানে লেখা রয়েছে 'বেকার—বেলা দু'টো।' তার পাশে বড় করে একটা দাগও দেওয়া আছে। ফোন নম্বর লেখা রয়েছে 'মিউজিয়াম ০৪৮৮।' ডাক্তার বেকার কাগজের টুকরোটি দেখে বললেন, 'ভারি অদ্ভুত তো! হাঁ, নম্বর তো ঠিকই আছে।'

কর্ণেল আবার বললেন, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে তিনি ছদ্মনামে আপনার সাথে দেখা করেছিলেন।'

'হাঁ, তা অবশ্য অসম্ভব নয়। তবে সাধারণত এমন ব্যাপার বড় হয় না।'

'আপনি নিশ্চয় রোগীদের তালিকা রাখতেন? অবশ্য এবিষয়ে জানতে চাওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ, তা জানি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে আপনাকে এই প্রশ্ন না করেও উপায় নেই। আমাদের ধারণা আপনার সাথে তাঁর সাক্ষাতকারের বিবরণ জানতে পারলে আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হতে পারে।' ফ্যাবেল বলে উঠলো, 'আত্মহত্যা নয়। তাকে হত্যা করা হয়েছে।' ডাক্তার বেকার এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ম্যাক্সিমের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'এবিষয়ে আমি কিছুই তো জানি না। তবে আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি পুরানো কাগজপত্র নিয়ে আসছি।' তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে একটা মোটা বাঁধানো খাতা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'গত এক বছরের রোগীর তালিকা এ খাতায় লেখা আছে।' খাতাটি খুলে তিনি পাতা ওল্টাতে লাগলেন! মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি। তিনি বিড় বিড় করে বলছেন, '৭ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই, না পাচ্ছি না। কত তারিখ বললেন? ১২ই? দু'টোর সময়? হাঁ, হাঁ, পেয়েছি।' আমরা কেউ একটুও নড়ছি না। তাঁর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে আছি। তিনি আবার বললেন, 'সেদিন দু'টোর সময় মিসেস ডানভারস নামে রোগী দেখেছি, মিসেস ডি উইণ্টার তো নন!' ফ্যাবেল বলে উঠলো, 'ড্যানী? সে কেন—' ম্যাক্সিম তার কথায় বাধা দিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তিনি ভুল নাম বলেছেন তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সেদিনকার সাক্ষাতকারের কথা আপনার মনে আছে কি?' ডাক্তার বেকার তখনও খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। একটু পরে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'হাঁ, হাঁ, মিসেস ডানভারস! এখন আমার সব মনে পড়ছে।' কর্ণেল এবার প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি লম্বা, তন্বী এবং খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'হাঁ, হাঁ, খুব সুন্দর দেখতে।' তারপর খাতায় আরও কি পড়ে সেটা বন্ধ করে রেখে দিলেন। ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'রোগীর কথা অন্য কাউকে বলা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ। আমরা এসব ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন রাখি। কিন্তু আপনার স্ত্রী আর বেঁচে নেই। তাছাড়া যে কারণে আপনারা আমার কাছে এসেছেন সেই পরিস্থিতিটাও একটু স্বতন্ত্র। আপনি জানতে চাইছেন আপনার স্ত্রীর আত্মহত্যার কোন সঙ্গত কারণ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি কিনা। হাঁ, বলতে পারি। মিসেস ডানভারস নামে সেই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন।' তিনি একটু থেমে আমাদের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'এখন তাঁকে আমার স্পষ্ট মনে

পড়ছে। আপনারা যে তারিখটার কথা বললেন তার সাতদিন আগে তিনি প্রথম আমার কাছে এসে তাঁর অসুস্থতার কয়েকটি উপসর্গের কথা আমাকে জানালেন। আমি কয়েকটি এক্স-রে ফটো তুলে নিলাম। বাদ তারিখে তিনি এক্স-রের ফলাফল জানতে এসেছিলেন। পরিষ্কার মনে আছে তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকেই বলেছিলেন, 'যা সত্য তা-ই জানতে চাই। আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। যত কঠিন সত্যই হোক না কেন আমি সহ্য করতে পারবো।' ডাক্তার আবার থেমে খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। আমি যেন আমার মৃত্যুদণ্ড শোনবার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি কেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলছেন না? তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এভাবে মুহূর্তের পর মুহূর্ত অপেক্ষা করার মত বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে! তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'হাঁ, তিনি সত্য কথা শুনতে চাইলেন। আমিও তাঁকে কিছু লুকাইনি। অনেক রোগী মনের দিক দিয়ে খুব শক্ত থাকে। সত্য যত কঠিন আর ভীষণই হোক না কেন তারা তা সইতে পারে। উনিও সেই প্রকৃতির, আমি তাঁকে প্রথম দিন দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি সব কথা শুনে এতটুকুও মুসড়ে পড়েন নি। তিনি বললেন কিছুদিন যাবত তাঁরও সেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর আমার ফি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। আর তাঁকে দেখিনি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার তিনি বললেন, 'যন্ত্রণা খুব বেশি হোত না। কিন্তু রোগটা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তিন চার মাস পরে তাঁকে মরফিয়া দিয়ে রাখতে হোত। অপারেশন করেও কোন লাভ হোত না। আমি তাঁকে সবই খুলে বলেছিলাম। রোগটা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না।' কেউ কোন কথা বলছে না। শুধু ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ডাক্তার আবার বলছেন, 'বাইরের দিক থেকে তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই

মনে হোত। কিছু বুঝবার উপায় ছিল না। শেষবার তাঁকে শুধু আরও একটু রোগা আর বিবর্ণ দেখেছিলাম। আর তিন চার মাস পর তাঁকে মরফিয়া দিয়ে অজ্ঞান করে না রাখলে তিনি সেই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে পারতেন না। এক্স-রে করে আরও একটা জিনিস ধরা পড়েছিল। তাঁর জরায়ুর আকার একটু অস্বাভাবিক ছিল। তাই সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্য তাঁর রোগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'আমরা যা জানতে চেয়েছি সবই আপনি জানিয়েছেন। এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।' আমরা সবাই এবার উঠে দাঁড়ালাম। ডাক্তার বেকারকে অভিবাদন জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললাম। ডাক্তার বেকারও দরজা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসে বললেন, 'আপনাদের সাহায্য করতে পেরে সত্যি খুব খুশি হয়েছি।' আমরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। পেছনে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

একটি খোঁড়া ভিখারী তার ভাঙ্গা বাঁশিতে একটি গানের সুর বাজাতে বাজাতে পথের ওপর ভিক্ষা করছে।

॥ ২৭ ॥

আমরা কেউ কোন কথা না বলে গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ফ্যাবেলের মড়ার মত শাদা মুখ দেখে মনে হোল সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তার হাত দু'খানি থরথর করে কাঁপছে। সেই খোঁড়া ভিক্ষুকটি বাঁশি থামিয়ে আমাদের সামনে এসে পয়সার জন্য টুপি মেলে ধরলো। ম্যাক্সিম তাকে কয়েকটি পয়সা দিলে সে আবার বাঁশি বাজাতে বাজাতে অন্যদিকে চলে গেল। গির্জার ঘড়িতে ছ'টা বাজলো ঢং ঢং করে। আমাদের দিকে না তাকিয়ে ফ্যাবেল শংকিত, ক্ষীণস্বরে বললে, 'ক্যানসার! ওঃ! এটা কি সংক্রামক রোগ?' কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না। ফ্যাবেল আবার বললো, 'আমি একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সে সবার কাছ থেকে একথা লুকিয়েছে। উঃ! আগে জানলে তার সাথে কখনও মেলামেশা করতাম না! ক্যানসার! ওঃ ভগবান!' সে এবার তার গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। ম্যাক্সিম তার দিকে তাকিয়ে চিন্তিতস্বরে বললো, 'তুমি একা যেতে পারবে?' ফ্যাবেল বিড় বিড় করে বললো, 'আমাকে সামলে নিতে একটু সময় দাও। তোমরা আমার মনের অবস্থা বুঝবে না। আতঙ্কে আমার বুক শুকিয়ে উঠছে। আমারও যদি ক্যানসার হয়!' কর্ণেল বলে উঠলেন, 'একি হচ্ছে! এত মুসড়ে পড়ছেন কেন? দরকার মনে করলে বরং ডাক্তার বেকারের কাছেই একবার যান না! রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে নেকামি করবেন না, দোহাই আপনার।' ফ্যাবেল এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কর্ণেল আর ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাঁ, আপনাদের আর কি! আপনাদের তো খুব ভালই লাগবে। দুর্ভাবনার কোন কারণ রইলো না। ম্যাক্স, তুমি তো বেঁচে গেলে। এখন প্রাণ

ভরে আনন্দ উৎসব কর।' তার কথায় কান না দিয়ে কর্ণেল ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা তো এখন রওনা হতে পারি।' ম্যাক্সিম গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। জুলিয়ান ভেতরে গিয়ে বসলেন। আমি ম্যাক্সিমের পাশে গিয়ে বসলাম। ফ্যাবেল তখনও তেমনই গাড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ণেল তার দিকে চেয়ে বললেন, 'সোজা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আস্তে গাড়ি চালাবেন। না হয় আবার মানুষ চাপা দিয়ে খুনের দায়ে পড়বেন। আর সাবধান করে দিচ্ছি এ জেলার কোথাও যেন আপনাকে কোনদিন দেখতে না পাই। ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে আমার কতটুকু ক্ষমতা আছে তা নিশ্চয় জানেন। গুণ্ডামী করাটা জীবিকার পর্যায়ে পড়ে না আশাকরি তা বুঝবেন। আপনার মত লোককে কি করে সায়েস্তা করতে হয় আমরা তা জানি।' ফ্যাবেল ম্যাক্সিমকে লক্ষ্য করছিল। তার ঠোঁটের কোণে আগের মত সেই বিশ্রী কুটিল হাসি ফুটে উঠেছে। সে আস্তে আস্তে বলছে, 'হাঁ, তোমার ভাগ্য সত্যি খুব ভাল ম্যাক্স! তুমি ভাবছো তোমারই জয় হয়েছে। অবশ্য আইনের চোখে তা হয়েছে বটে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখে নেব। এর প্রতিশোধ আমি নেবই।' ম্যাক্সিম গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলো। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম ফ্যাবেল তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে মুখে ক্রূর দৃষ্টি, তেমনই ইঙ্গিতভরা কুটিল হাসির প্রলেপ!

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। কর্ণেল জুলিয়ান বললেন, 'সে আর কিছু করতে পারবে না। এধরণের লোকগুলো খুব কাপুরুষ।' ম্যাক্সিম কোন উত্তর করলো না। আমি তার দিকে তাকালাম। কিন্তু তার মুখের ভাব বুঝতে পারলাম না। কর্ণেল আবার বললেন, 'ক্যানসার! ওঃ কী সাংঘাতিক ব্যাপার! সবচেয়ে আশ্চর্য যে আপনাকেও তিনি রোগের কথা কিছু বলেন নি! তাঁর মত প্রাণবন্ত তরুণী মেয়ের পক্ষে এরপর আত্মহত্যা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়!'

আমাদের গাড়ি এখন বড় রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। একটু পর কর্ণেল আবার বললেন, 'আপনার কোনদিন এতটুকুও সন্দেহ হয় নি?'

'না।'

'আপনার স্ত্রীর অন্য সব বিষয়েই অদ্ভুত সাহস ছিল। কিন্তু এই একটি বিষয়ে বোধহয় তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রোগের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন না জেনেই তিনি অপঘাত মৃত্যুকেও বরণ করতে দ্বিধা করেন নি।'

'হাঁ।'

'আত্মহত্যার কারণ আমরা ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি একথা সকলকে জানিয়ে দেওয়াই সঙ্গত মনে করি। তাহলে আপনার পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটাই খুব সহজ হয়ে যাবে, তাইনা?'

'হাঁ।'

আমরা হ্যাম্পষ্টেডে পৌঁছলে কর্ণেল বললেন, 'এখানে আমার বোন থাকে। ভাবছি হঠাৎ দেখা দিয়ে তাকে অবাক করে দেব। আপনারাও আসুন না! সে খুব খুশি হবে।'

'না, আজ নয়। আর একদিন যাব।'

কর্ণেলকে তাঁর বোনের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলে তিনি তাঁর কোট, ন্যাপ নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, 'আপনারা কিছুদিন বাইরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসুন। আর এ সমস্ত ব্যাপার দুঃস্বপ্নের মত নিঃশেষে ভুলে যেতে চেষ্টা করুন। ফ্যাবেল আর কোন হাঙ্গামা করতে পারবে না। যদি করে তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি তাকে জীবনের মত উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। আবার দেখা হবে।'

আমাদের গাড়ি আবার ছুটে চলেছে। আমি পেছন দিকে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইলাম। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা আর নেই। মনটা একেবারে

হালকা হয়ে গেছে। এ যেন অপূর্ব এক অনুভূতি, ভাষায় যাকে প্রকাশ করা যায় না। ম্যাক্সিম কোন কথা বলছে না। আমার হাতের ওপর তার হাতখানি অনুভব করছি। লণ্ডনের কর্মচঞ্চল পথের কত রকম কলরব আমার কানে ঢুকছে কিন্তু মনকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমি যেন অন্য জগতে চলে গেছি। আমাদের আর কোন ভয় নেই। জীবন-মরণ সংকট কাটিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছি।

আমরা সোহোর রেস্তোরাঁয় রাত্রির খাওয়া সেরে নিতে ঢুকলাম। খেতে খেতে ম্যাক্সিম বললো, 'আমরা কোথাও অপেক্ষা করবো না। খুব ভোর বেলা ম্যাণ্ডারলে গিয়ে পৌঁছবো।' তার চোখের কোলে কালি পড়েছে, তাকে বড় রোগাও দেখাচ্ছে। একটু পরে সে বললো, 'এখন আমার মনে হচ্ছে রেবেকা ইচ্ছে করেই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিল। এইটিই তার জীবনের শেষ শ্রেষ্ঠ চাল। আমি তাকে হত্যা করি তাই সে চেয়েছিল। কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে ভবিষ্যতকে দেখেছিল! তাই শেষ সময়ে অমন অদ্ভুতভাবে হেসেছিল। এটাই হোল তার জীবনের শেষ নিখুঁত তামাসা, চরম অভিনয়! জানি না শেষ অবধি তারই জয় হবে কিনা।'

'একথা কেন বলছো? তার জয় হবে কেন? সব তো মিটে গেছে। আর এসব কথা ভেবোনা।'

'কি জানি। মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠছে।'

খাওয়া শেষ হলে সে ফ্র্যাঙ্ককে ফোন করতে গেল। আমি চুপচাপ বসে আছি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এখানে এই নিরালা পরিবেশে এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে বেশ লাগছে। আমাদের সব বিপদ কেটে গেছে। রেবেকা আর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো।

'ফ্র্যাঙ্ক কি বললো?'

'আমার ফোনের জন্য সে সারাদিন অফিসে বসে ছিল। আমি তাকে সব বললাম। সব শুনে সেও খুব নিশ্চিন্ত, খুশি হয়েছে।' একটু চুপ করে থেকে ম্যাক্সিম বললো, 'কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ফ্র্যাঙ্ক বললো ডানভারস কোথায় চলে গেছে। চারটের পর থেকে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।'

'ভালই তো হয়েছে। আমাদের অনেক হাঙ্গামা বাঁচলো। তাকে তো আমাদের ছাড়িয়ে দিতেই হোত। সেও তা বুঝতে পেরে নিজেই চলে গেল।'

'কিন্তু এসব আমার ভাল লাগছে না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে আর তো কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি এত ভেবোনা লক্ষীটি!' কোন উত্তর না দিয়ে আনমনে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। এতদিনকার লাঞ্ছনা, অপমান, বেদনার প্রতি-ক্রিয়া তাকে এখনও বুঝি কষ্ট দিচ্ছে। মনের দিক দিয়ে সে এখনও তার জীবনের সেই বিষাক্ত স্মৃতির কবল থেকে মুক্তি পায়নি। কিন্তু তাকে আবার সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। তার সকল দায়িত্ব এখন আমারই। ম্যাণ্ডারলে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সহসা আমার মন ম্যাণ্ডারলের ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনায় মেতে উঠলো। ম্যাণ্ডারলে, আমার ম্যাণ্ডারলে! আমিই হবো সেখানকার সর্বময়ী কর্ত্রী। সবাই আমাকে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা করবে। আমার মনের মত করে তাকে আমি সাজাবো। আমাদের ছেলে মেয়ে! ম্যাণ্ডারলের বনে বাগানে তারা খেলবে, নাচবে! ভবিষ্যতের মধুর রঙীন স্বপ্নের আবেশে কতক্ষণ বিভোর হয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ম্যাক্সিমের কথায় চমক ভাঙ্গলো।

'এখনই রওনা হবো।'

যাবার জন্ত সে এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? এই নিরালা শান্ত, পরিবেশ

ছেড়ে এত শিগ্‌গির চলে যেতে মন চায় না। এমনি করে চুপচাপ বসে বসে আমাদের ভবিষ্যত জীবনের কল্পনা করতে ভারি ভাল লাগছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। পথে এসে সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা, গাড়ির পেছনে তোমাকে কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিলে ঘুমোতে পারবে তো?'

'আমি ভেবেছিলাম আজ রাতটা এখানেই থাকবো।'

'তা হয় না। আমার মন বলছে আজ রাত্রির মধ্যেই আমাদের ম্যাণ্ডারলে পৌঁছতে হবে। তুমি গাড়িতে ঘুমোতে পারবে তো?'

'পারবো।'

'এখন রাত আটটা। এখনই রওনা হলে রাত আড়াইটার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব।'

'কিন্তু তোমার যে বড় পরিশ্রম হবে।'

'না। আমার কিছু হবে না। আমি বাড়ি যেতে চাই। মনের মধ্যে কেমন একটা অমঙ্গল আশঙ্কা অনুভব করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে যেতে হবে।' তার চোখে মুখে সত্যি দুশ্চিন্তার গভীর ছায়া দেখতে পেলাম। সে খুব তাড়াতাড়ি গাড়ির পেছনে কুশন ঠিক করে কম্বল দিয়ে আমার জন্য বিছানা পেতে দিচ্ছে। আমি গাড়িতে উঠে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম। সে আমাকে কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল। আঃ! সত্যি খুব আরাম বোধ করছি। সে আমার দিকে চেয়ে বললো, 'ঘুমোতে পারবে তো? কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'না। বেশ আরামে শুয়েছি।' আমি চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। গাড়ি ছুটে চললো। তার চলার তালে তালে আমার সমস্ত শরীর দুলছে। গাড়ির গতিতে যেন একটা সুরেলা ছন্দ বেজে উঠছে। আমার জীবনের গত কয়েক মাসের সব ঘটনা ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি চোখ বুজে বুজে আবার সমস্ত কিছু দেখছি,

অনুভব করছি। অতীতকে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন বুঝতে পারি রাত অনেক হয়েছে।

অন্ধকার, নির্জন পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। সামনে ম্যাক্সিমের মুখের একপাশ দেখতে পাচ্ছি। অপরিসর শয্যায় একটু এপাশ ওপাশ করে আবার তন্দ্রায় ঢলে পড়লাম।... ...সহসা ম্যাণ্ডারলের সিঁড়ির মাথায় কালো পোশাক পরা মিসেস ডানভারসকে দেখতে পেলাম। সে যেন আমারই জন্য ওখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি ওপরে উঠতেই সে পেছনে সরে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল! অনেক খুঁজেও তাকে আর দেখতে পেলাম না। হঠাৎ একটা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে উঁকি মারতে দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলাম। সে আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। উঃ! দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় আমার ঘুমও গেল ভেঙ্গে। ম্যাক্সিমকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন ক'টা বেজেছে? আর কত দেরি?'

'সাড়ে এগারটা। অর্দ্ধেক পথ এসে গেছি। আবার ঘুমোতে চেষ্টা কর।' তার বিবর্ণ মুখখানি গাড়ির অস্পষ্ট আলো-আঁধারে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

'জল তেষ্টা পেয়েছে।' ম্যাক্সিম পরের স্টেশনে গাড়ি থামালো। গ্যারেজের পাহারাওয়ালা আর তার স্ত্রী তখনও ঘুমোয়নি। আমরা গ্যারেজের ভেতরে গিয়ে বসলাম। পাহারাওয়ালার স্ত্রী আমাদের চা করে দেবে বললো। খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। গাড়িতে পেট্রল ভরতে ভরতে পাহারা ওয়ালা বলছে, 'এতদিন এখানে একফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। এখন ঝড়ো হাওয়া ছেড়েছে। কাল বিকেলে বোধহয় বৃষ্টি নামবে। এই শুকনো খটখটে আবহাওয়ায় আমরা সব সময় আগুন লাগবার আশঙ্কা করছি।' তার স্ত্রী আমাদের জন্য চা এনে দিল। গরম চা খেয়ে বেশ আরাম

পেলাম। ম্যাক্সিম ব্যস্তভাবে তার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। মন না চাইলেও আমাকে আবার গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসতে হোল।

আকাশে তারার দল ঝলমল করছে। এদিক ওদিকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘও ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি আবার কম্বলের নিচে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছি। সেই খোঁড়া ভিক্ষুকটির বাঁশির সুর আমার মনে গুনগুনিয়ে উঠলো।···ফার্থ আর রবার্ট আমাদের লাই-ব্রেরিতে চা, খাবার পরিবেশন করছে। ফটকের সেই মেয়েটি আমাকে দেখে একটু হেসে অভিবাদন জানিয়ে তার ছেলেকে ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। সাগরপারের সেই পরিত্যক্ত কুটিরের ধুলিমাখা সব জিনিস দেখতে পাচ্ছি। তার ছাদে বৃষ্টির একঘেয়ে পতপত শব্দ আমার কানে বাজছে।·········

উত্তাল সাগরের ঢেউয়ের মাতামাতি আমার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি হ্যাপিভ্যালিতে যেতে চাই, কিন্তু কোথায় হ্যাপি ভ্যালি? চারদিকে গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য, আর কিছু তো নেই! কোথায় ম্যাণ্ডারলের বাগান, উপবন! সেখানে যে অতিকায় কাঁটা গাছের ঘন জঙ্গল!···কোথায় পেঁচা ডেকে উঠলো। চাঁদ ঐ ডুবে যাচ্ছে······

আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কোথায়, কোথায় তুমি?'

'এই যে, এই যে আমি। এখানেই তো রয়েছি।' হাত বাড়িয়ে সে আমার গায়ে হাত দিল।

'উঃ! স্বপ্ন দেখছিলাম। কী বিশ্রী স্বপ্ন!'

'কি স্বপ্ন?'

'কি জানি। মনে পড়ছে না।' কথা বলতে বলতেই আবার কোন্ অতলে ডুবে গেলাম।······

বসবার ঘরে বসে আমি চিঠি লিখছি। ম্যাণ্ডারলের উৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাচ্ছি। লেখা শেষ হলে তাকিয়ে দেখি এ তো

আমার হাতের লেখা নয়! এ যে বাঁকা আখরের তির্যক ভঙ্গিমার সেই লেখা! কার্ডগুলি তাড়াতাড়ি কাগজের নিচে লুকিয়ে ফেললাম। চেয়ার থেকে উঠে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়নার মধ্যে কে একজন আমার দিকে চেয়ে আছে! ও কে? এ তো আমি নই! একরাশ কালো চুলের মাঝে অপরূপ, শুভ্র একখানি মুখচ্ছবি! আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তারপর দেখলাম শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে সে বসলো। ম্যাক্সিম তার সেই মেঘবরণ একরাশ চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। তার চুল দু'হাতে ধরে আঁচড়ে সে বিনুনী করে দিচ্ছে। সেটা সাপের মত দেখাচ্ছে। রেবেকার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ম্যাক্সিম সেই সাপের মত বিনুনীটা নিজের গলায় জড়িয়ে নিল। ....

আমি আকুল হয়ে কেঁদে উঠলাম, 'না, না, আমরা আর কোথাও অনেক দূরে চলে যাব। এখানে থাকবো না, থাকবো না।' আমার মুখের ওপর তার হাতের পরশ অনুভব করলাম। সে তখন ব্যাকুল স্বরে বলছে, 'কি হোল? এরকম করছো কেন?' আমি উঠে বসে আমার মুখের ওপর থেকে দু'হাত দিয়ে এলোমেলো চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিলাম।

'না, আমি ঘুমোতে পারছি না। আর শোব না।'

'তুমি এতক্ষণ বেশ ঘুমুচ্ছিলে। প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। এখন সোয়া দু'টো বেজেছে। আর মাত্র চার মাইল পথ বাকি আছে।'

আমার বেশ শীত করছে। গাড়ির অন্ধকারে আমি কেঁপে কেঁপে উঠছি।

'তোমার পাশে গিয়ে বসবো।' গাড়ি থামলে তার পাশে বসে তার হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে রইলাম।

পাহাড়ের অস্পষ্ট সারি চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা দিচ্ছে। আকাশে আর একটিও তারা নেই।

'ক'টা বেজেছে বললে ?'

'সোয়া দু'টো।'

'সে কি! ঐ পাহাড়ের ওদিকটায় চেয়ে দেখ, মনে হচ্ছে উষার আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে, তাই না ?'

'তুমি পশ্চিম দিকে তাকাচ্ছ।'

'ও। তাহলে ওদিকে অমন আলো দেখা যাচ্ছে কেন ?' সে কোন উত্তর দিল না। আমি অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যি অদ্ভুত রূপান্তর হচ্ছে! প্রথম সূর্যের লালচে রশ্মির মত ওদিকটায় আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। একটু একটু করে সারা আকাশে সেই আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়লো। আমি তার দিকে চেয়ে বললাম, 'শীত কালে আকাশে এরকম আলো দেখা যায়, তাই না ?'

'না, এ সেই আলো নয়। ম্যাণ্ডারলে, ওটা ম্যাণ্ডারলে!' চমকে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে তার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল দৃষ্টি দেখতে পেলাম। সহসা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম, 'ওগো এ কি হোল!'

সে আরও জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। জোরে, যত জোরে সম্ভব! গাড়ি পাহাড়ের ওপরে উঠলে দেখলাম আমাদের পায়ের নিচে লেলিয়ন দেখা যাচ্ছে, বাঁ দিকে কেরিথের ক্ষীণকায় নদী একটা রূপোলী সুতোর মত চিক চিক করছে। সামনে বিস্তৃত পথ, ম্যাণ্ডারলের পথ। চাঁদ আর দেখা যাচ্ছে না। আমার [illegible] ওপর আকাশ নিকষ কালো অন্ধকার। কিন্তু আমাদের [illegible] দেখা যাচ্ছে সেদিকটা আবীরের মত, রক্তের মত লাল, আলোর ছটা [illegible] হয়ে উঠেছে!

সহসা সাগরের নোনা হাওয়া একরাশ ছাই [illegible]ক করে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিল আমাদের [illegible] মুখে [illegible]